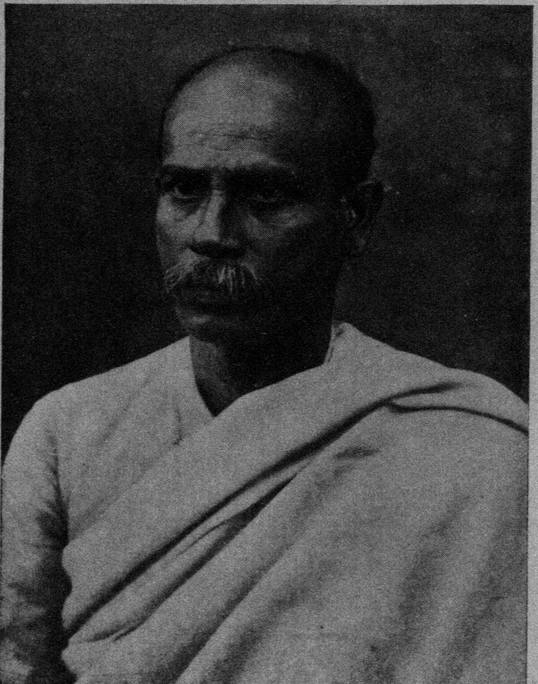


পি, মিত্র

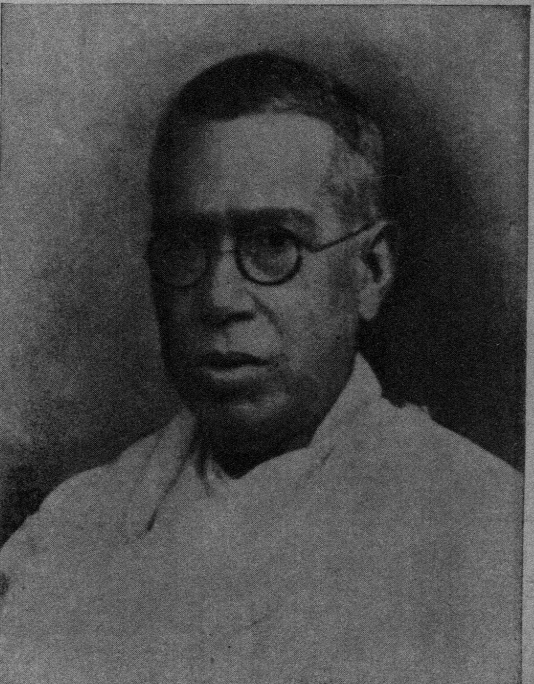
বিপ্লবী পুলিন দাস

সম্পাদক—

শ্রীভবতোষ রায়



পুলিন দাস

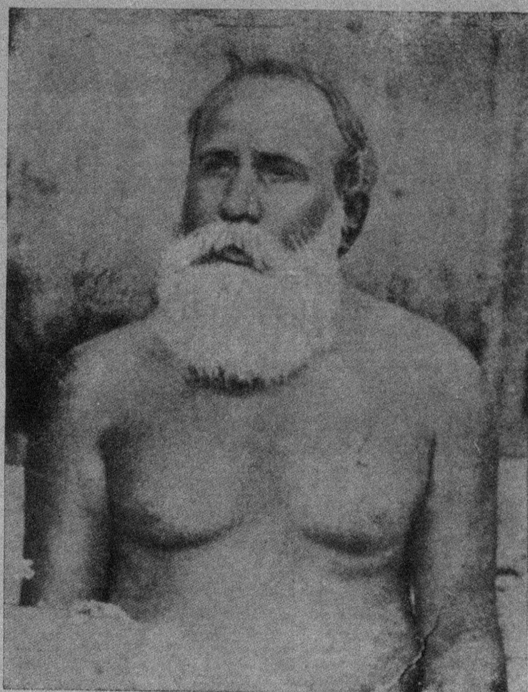


বিপিনচন্দ্র পাল

প্রথম সংস্করণ ঃ
১৯শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৯

প্রকাশক ঃ
চিত্ততোষ রায়
গীতা পাবলিশার্স
৪৭, কৈলাস বোস ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬

মুদ্রক ঃ
চিত্ততোষ রায়
নবকুমার প্রেস
৪৭, কৈলাস বসু ষ্ট্রীট
কলিকাতা—৬



ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী

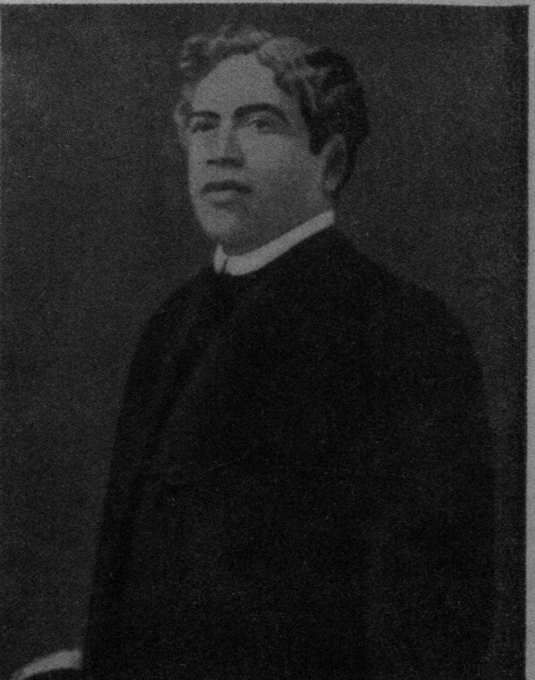
প্রকাশকের নিবেদন

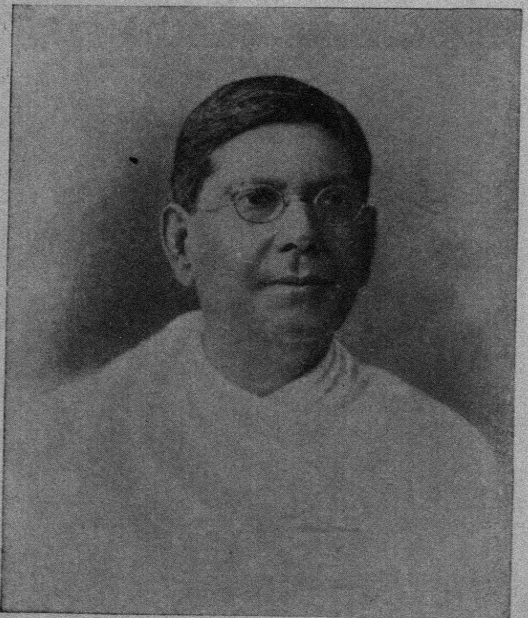
বিপ্লবী পুলিন দাসের আত্মকথা সম্পাদনা ও প্রকাশনার দায়িত্ব আমার পূজনীয় পিতৃদেব শ্রীযুক্ত ভবতোষ রায় স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সুসম্পাদনা ও সুষ্ঠু প্রকাশনাকে ত্বরান্বিত করার জন্য তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন ছিল অপরিসীম। সম্পাদনার পর নানা অপরিহার্য কারণে মুদ্রণে বিলম্ব ঘটায় তিনি মুদ্রিতাকারে পুস্তকখানি দেখিয়া যাইতে পারেন নাই।

আজ তাই এই পুস্তক প্রকাশের সময় যুগপৎ আনন্দ ও বেদনা অনুভব করিতেছি। পিতৃদেব এক মহৎ উদ্দেশ্যে আগ্রহশীল হইয়া এই পুস্তক প্রকাশে ব্রতী হইয়াছিলেন। বাংলা ও বাঙ্গালীর—বিশেষভাবে হিন্দু সমাজের নিকট ইহা যথাযথ আদরণীয় হইলে তাঁহার আরব্ধ কার্য কথঞ্চিৎ পরিমাণেও সমাধা করিতে পারিলাম বলিয়া মনে করিব।

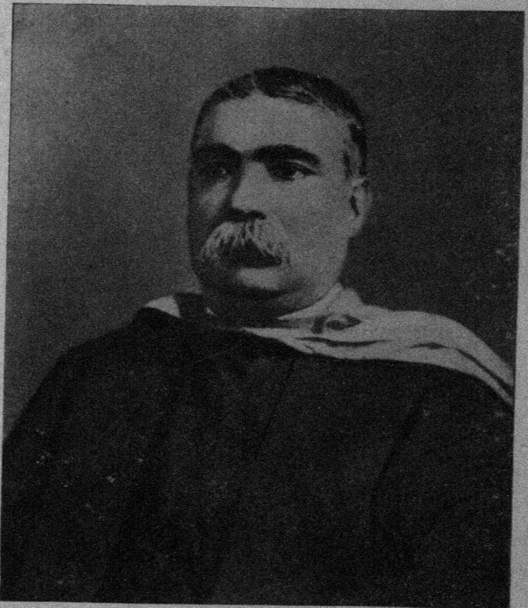
শ্রীচিত্ততোষ রায়


সুভাষচন্দ্র বসু


স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু



দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস



স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সূচীপত্র



পুলিন দাস

ভূমিকা

বহু বৎসর স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ভারত খণ্ডিত হইয়া বৈদেশিক শাসনমুক্ত হইয়াছে। এই স্বাধীনতা আন্দোলনে যে সকল মহাপ্রাণ ত্যাগের হোমানলে নিজের সব কিছু আহুতি দিয়া গিয়াছেন সেই সব বরেণ্য মানুষের অন্যতম পুলিন দাসের বৈপ্লবিক জীবন ও কর্ম্মধারার বিশদ বিবরণ এই পুস্তকে বিবৃত হইয়াছে।

অগ্নিযুগের প্রায় প্রথমদিকে পুলিন দাসের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। যখন বঙ্গভঙ্গ রোধ করিবার জন্য দেশের পরিস্থিতি বিপর্য্যস্ত সেই সময়ে এই তেজস্বী নিষ্ঠাবান নির্ভীক পুরুষ আগাইয়া আসেন প্রতিবাদ করিতে। ৺পি মিত্র মহাশয়ের নিকট বিপ্লব মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পুলিন দাস ঢাকায় অনুশীলন সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং দেশের যুবকদের মধ্যে বিপ্লবের উদ্দীপনা সঞ্চার করিয়া দেন। পুলিন দাস তাঁহার জীবনে ইংরাজ সরকারের বহু নির্য্যাতন সহ্য করিয়া ও বহু প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া বৈপ্লবিক পথে দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত কাজ করিয়া গিয়াছেন। শক্তি ও সংগঠনের পথে কোন স্তুতি বা নিন্দায় বিচলিত না হইয়া দেশের কল্যাণে আত্মত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।

আত্মকাহিনীর মধ্য দিয়া তিনি যে তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে বইটির প্রামাণ্য পরিলক্ষিত হইবে এবং স্বদেশী আন্দোলনের এই গুরুত্বপূর্ণ যুগের অন্যতম দলিল হিসাবে ইহার এক স্বতন্ত্র মর্য্যাদাও স্বীকৃত হইবে।

পুলিন দাসের বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবনের বহু সঙ্কটময় মুহূর্ত্তের সহিত আমার ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল এবং ঢাকা ষড়যন্ত্র মামলায় উকিল হিসাবে পুলিনের পক্ষ সমর্থন করিয়া আমি গর্ব্ব অনুভব করিয়াছি। আশা করি এই আত্মজীবনী দেশপ্রেমিক পাঠক সমাজে বরণীয় হইবে।

আমি পাঠকবর্গকে বিশেষতঃ যুবকসমাজকে ২৬৫ পৃষ্ঠায় গান্ধীজীর সহিত পুলিনের সাক্ষাৎকার মনোযোগ দিয়া পাঠ করিতে অনুরোধ করি। গান্ধীজীর অনুরোধেই পুলিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করেন। পুলিন দাস ছিলেন শক্তি-উপাসক। তিনি ইংরাজকে তাড়াইয়া দেশকে স্বাধীন করিতে চান। তিনি গান্ধীজীর অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার আপোষ মনোবৃত্তি ছিল না এবং ইংরাজের অনুগ্রহে স্বাধীনতা লাভ তাঁহার কাম্য ছিল না। সে স্বাধীনতা বেশিদিন টিকে না। 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্য,' তাই পরাজিত বলহীন ভারতবাসীদিগকে শক্তিমান করাই ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য এবং তাঁহার নীতি ছিল বল প্রয়োগে ভারতের দাসত্ব লোপ। ইংরাজ বিতাড়িত না হইলে বিলাতী বর্জন অসাধ্য ইহাই তাঁহার নীতি। পক্ষান্তরে গান্ধীজীর আদর্শ অহিংস অসহযোগ দ্বারা শুধু আত্মশুদ্ধি ও আত্মার স্বাধীনতা। এখানে আকাশ পাতাল ব্যবধান। তিনি স্বর্গ-রাজ্যে এবং পুলিন মাটিতে। পুলিন আত্মশুদ্ধির ধার ধারেন না। গান্ধীজীর স্বরাজ অর্থ ইংরাজকে গদীচ্যুত করা নহে শুধু, দেশকে সাধু বানান। শান্তিবাণী বহুকাল হইতে ভারতে চলিয়া আসিতেছে।

ভূমিকা

অশোক শান্তিবাণী প্রচার করিয়া দেশকে নির্ব্বীর্য্য করেন। তারপর হইতেই বিদেশী শত্রু ভারত আক্রমণ করিয়া দখল করে এবং ভারত-বাসী তাহাদের দাসত্ব করে। আমাদের বহুলোক শান্তিবাণী প্রচারের জন্য বিদেশে ঘোরাফেরা করেন। শান্তির বাণী শুনিতে খুবই শ্রুতিমধুর; কিন্তু যাহার জোর আছে সে মনে মনে ভাবে লোকটি ভীরু কাপুরুষ। গান্ধীজী ভারত বিভাগ লইয়া বোম্বাইতে ২১ দিন পাকিস্থানের জন্ম-দাতা মহম্মদালী জিন্নার সহিত যুক্তিতর্ক করেন। তাঁহাকে কায়েদে আজম উপাধি দেন, অখণ্ড ভারতের প্রেসিডেণ্ট করিবেন বলেন, কিন্তু তাঁহার মত বদলাইতে পারিয়াছিলেন কি? পুলিন ভারতের প্রকৃত স্বাধীনতাকামী, ইহা তাঁহার সাধনা, ইহার জন্য শক্তি প্রয়োগেও তাঁহার আপত্তি নাই এবং মরিতেও তাঁহার আপত্তি নাই। এমতাবস্থায় আত্মশুদ্ধির প্রস্তাব তাঁহার নিকট গ্রহণযোগ্যই হইতে পারে না, পুলিন এ উদ্দেশ্যে প্রকাণ্ড দল গঠন করিয়াছিলেন। রাউলাট রিপোর্টে ইহার আলোচনা আছে, এমনকি একথাও আছে যে, ৫০০০০ বলিষ্ঠ সন্তান কলিকাতা আক্রমণ করিয়া ফোর্ট উইলিয়াম দখল করিবে। তাঁহাকে তথাকথিত আত্মশুদ্ধির প্রলোভনে হাত করা একেবারেই অসম্ভব। গান্ধীজী বিরক্ত হইতে পারেন যে, এমন লোককে হাত করা গেল না; কিন্তু অনেক লোক আছে "কাজি সাহেবে ধরছে হাত, জাত কোন্ ছার"। আমি আমার দেশের কল্যাণকামী যুবকগণকে অনুরোধ করি এই কাহিনীটি পড়িয়া নিজেদের শক্তিমান করিতে এবং মনে রাখিতে "বীরভোগ্যা বসুন্ধরা।"

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সম্পাদকের নিবেদন

ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে অহিংসা ও আপোষের দ্বারা এই কথাই আমরা আজ জানি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণও হয়ত এই ইতিহাসই শিখিবে। স্বদেশভক্ত অগণিত ভারতবাসীর আজন্ম-লালিত অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ও সাধনা যখন নাটকীয় ভারত-ব্যবচ্ছেদে রূপ পরিগ্রহ করিল, তখন পশ্চাতের ইতিহাস আমরা স্বেচ্ছায় বিস্মৃত হইয়াছি। কিন্তু স্মৃতিশক্তির অভাব ঘটিলেই ঘটনার সমাধি ঘটে না। যাঁহারা দেখিতে চাহেন, জানিতে চাহেন, একটু পরিশ্রম স্বীকার করিলেই তাহা জানা যায়। কত রক্ত, কত অশ্রু, ফাঁসী, দ্বীপান্তর ও নির্যাতন-লাঞ্ছনা সহ্য করিয়া যে সকল দেশপ্রেমিক স্বাধীনতার অনির্বাণ দীপশিখা অন্তরে প্রজ্জ্বলিত রাখিয়াছিলেন এবং যাঁহারা দেশের জন্য যে-কোন ত্যাগ স্বীকারেও কুণ্ঠিত ছিলেন না তাঁহাদের ইতিহাস যদি আমরা না জানি ও অপরকে জানিবার সুযোগ না দেই তাহা হইলে যে আমাদের পক্ষে শুধু কৃতঘ্নতারই পরিচয় দেওয়া হইবে তাহা নহে, স্বাধীনতা নামক পবিত্র বস্তুটির মর্য্যাদাও আমরা সম্যক উপলব্ধি করিতে পারিব না এবং তাহার উপযুক্ত ধারক ও বাহকরূপে

নিজেদের যোগ্যতা পালন করিতেও সমর্থ হইব না।

পরাধীনতার নাগপাশ হইতে দেশকে মুক্ত করিবার যে দুর্জয় ও দুর্নিবার সংকল্প-নিষ্ঠা লইয়া বাংলাদেশের যুবশক্তি অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল ঢাকার অনুশীলন সমিতি সেই বৈপ্লবিক সপ্তর্ষিমণ্ডলের একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কস্বরূপ। আর ব্যারিষ্টার পি মিত্রের প্রেরণায় পূর্ববঙ্গে—বিশেষভাবে ঢাকায়—অনুশীলন সমিতির বীজ বপন ও শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া বিরাট মহীরূহে গড়িয়া তোলার মূলে যে কীর্তিধর পুরুষ ছিলেন তিনিই খ্যাতনামা লাঠিয়াল, বিপ্লবী পুলিন দাস। ঢাকার অনুশীলন সমিতির বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতার ফলে বৃটিশ সরকার স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন যে, মুষ্টিমেয় পূর্ববঙ্গের ছাত্র ভারতে বৃটিশ রাজত্ব প্রায় অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছিল। ···**a few handful of East Bengal students made the British Government almost impossible in India.** —[Rowlat Report]

উল্লিখিত উক্তি হইতেই ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইবে যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতির আসল স্বরূপ এবং এই সমিতির সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বৈপ্লবিক জীবনের একটি নাতিদীর্ঘ অথচ বস্তুগর্ভ কাহিনী পুলিন দাসের জীবনীর সহিত একই বৃন্তে গ্রথিত হইয়া আছে। পুলিন দাসের জীবন একদিকে রহস্য-রোমাঞ্চের মতই উত্থান-পতন সমন্বিত ঘটনাবহুল ও আকর্ষণীয় এবং অপরদিকে ইস্পাত-কঠোর অনমনীয় ও শৃঙ্খলাপরায়ণ। গান্ধীজীর অসহযোগ আন্দোলনের যে জোয়ার সমগ্র দেশে বিস্তার লাভ করিতেছিল এবং গান্ধীজীর প্রভাবে দেশবন্ধু সি আর দাশ মহাশয়ও যাহা মানিয়া লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন, তাহার বিরুদ্ধে অর্থাৎ অসহযোগের অসারতা সম্পর্কে পুলিন দাস মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। গান্ধীজীকে তৎকালে নররূপী

নারায়ণ বা অবতার বলিয়াই লোকে ভাবিত এবং এই কর্তাভজার দেশে প্রতিবাদকারী উন্নতশির পুলিন দাস সহজেই গান্ধীজীর দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন। সি আর দাশের বাড়ীতে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলোচনা করিয়া পুলিন দাসকে স্বমতে আনিতে পারিবেন গান্ধীজীর এইরূপ বিশ্বাস ছিল। তিনি তাই প্রথমে আত্মপ্রত্যয়ের সুরে বলিয়াছিলেন, "I shall either convert you, or shall be converted by you."

এই কথা বলিবার সময় পণ্ডিত মতিলাল নেহরু তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলিলেন যে সি আর দাশকে যখন তোমার স্বমতে আনিতে পারিয়াছ, তখন পুলিন দাসকে সহজেই উহা গ্রহণ করাইতে পারিবে। উত্তরে গান্ধীজী বলিলেন, "No, no, I shall have to crack a harder nut."

পুলিন দাসের আত্মকথার মধ্যে এই ধরণের অনেক ঘটনা আছে, যাহা বিস্ময়কর এবং আপাতদৃষ্টিতে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হইতে পারে কিন্তু সময়ের কষ্টি পাথরে তাহার সত্যতা পরীক্ষিত হইয়াছে। এই পুস্তকে বাংলার বিপ্লব-ইতিহাসের সম্পূর্ণ চিত্র হয়ত অনুপস্থিত, কিন্তু বাংলা তথা ভারতবর্ষের বিপ্লব-ইতিহাসের স্বর্ণ অধ্যায় ও যুবশক্তির এক গুরুত্বপূর্ণ উদ্বোধনের বিবরণী বিধৃত হইয়া আছে। অনুশীলন সমিতি কোন সৌখীন বা পেশাদার রাজনীতির আসর ছিল না, সেখানে যদিও বৃটিশ রাজত্ব অবসানের কঠিন পরিকল্পনা ছিল, তথাপি শুধু ধ্বংসের বীজ নয়, সংগঠনেরও পরিচয় তাহাতে যথেষ্ট ছিল। যুবকদের দেহ, মন ও চরিত্র গঠন এবং ধর্মবোধ ও পবিত্র জীবনের পরিবেশ রচনা—ভাল কাজের পুরস্কার এবং শৃঙ্খলাভঙ্গ বা ত্রুটি-বিচ্যুতির কঠোর শাস্তিবিধানেরও ব্যবস্থা ছিল। সেই নিখাদ দেশ-

বিপ্লবী পুলিন দাস

প্রেমের কথা আজ প্রচারের প্রয়োজন ও প্রাণে প্রাণে সেই সঞ্জীবন-পরশেরও প্রয়োজন—যাহা দ্বারা লোহার প্রাণগুলি সোনার স্বপ্নে বর্ণাঢ্য ও সম্পদশালী হইয়া উঠিবে।

পুলিন দাসের সহিত আমার অতীত দিনের সৌহার্দ্যের সুবাদে তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণ তাঁহার আত্মজীবনী সম্পাদনার ভার দিয়া আমাকে এক বিরাট দায়িত্বের ভাগী করিয়াছেন। বাংলার দুর্দিনে এই বীর বাঙ্গালীর মহৎ জীবনের কাহিনী প্রকাশ করিতে পারায় আমি গর্বিত। আশ্চর্য ও বিস্ময়ের কথা যে, আত্মজীবনের কথা বলিতে বসিয়া তিনি কোথাও নিজেকে অনাবশ্যকভাবে প্রকাশ করিবার চেষ্টা করেন নাই, প্রাসঙ্গিক সীমা লঙ্ঘন করেন নাই। সংযম ও সৌজন্যবোধের ইহা এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত। বর্তমানে যাঁহারা স্বাধীনতার সৌধে আরোহণ করিয়াছেন, সেই সৌধের ভিত্তি ও সোপান রচনায় কি অধ্যবসায়, ঐকান্তিকতা এবং আত্মত্যাগের মূল্য দিতে হইয়াছে পুলিন দাসের এই আত্মজীবনীর প্রতিটি পৃষ্ঠা তাহার সাক্ষ্য বহন করিতেছে। তাই আত্মবিস্মৃত বাঙ্গালীর হাতে তাহাদের অতীত গৌরব তুলিয়া দিলাম, ভবিষ্যতের নূতন সূর্যোদয়ের আশায়। বাঙ্গালী আত্মস্থ হউক, জাগ্রত হউক, তাহার হৃদয়ের দৌর্বল্য ও মনের অন্ধকার দূর হউক। তবেই এই পুস্তক প্রকাশ সার্থক হইবে।

এই পুস্তকের ভূমিকা লিখিয়া দিয়া প্রবীণ বিপ্লবী ও পুলিন দাসের ঘনিষ্ঠ বন্ধু এবং খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী শ্রীযুক্ত শ্রীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় আমাকে কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

নিবেদক—

ভবতোষ রায়

জন্ম ও বংশ পরিচয়

আমার পূর্বপুরুষগণ বর্ধমানের অন্তর্গত হরিপুর গ্রাম হইতে আসিয়া বিক্রমপুরের সিংহলমুরীতে বাস করিতে থাকেন। নদীর ভাঙ্গন এবং অপরাপর কারণে আমার পিতামহ গৌরচন্দ্র দাস অন্যান্য জ্ঞাতিবর্গের সহিত লোনসিংহ গ্রামে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। পিতামহ গৌরচন্দ্র দাস ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন এবং আমাদের বংশের আরও অনেকেই ডেপুটি ছিলেন বলিয়া লোনসিংহের বাড়ীর এক নাম ছিল ডেপুটিবাড়ী এবং সুবৃহৎ ও সুদৃশ্য ছিল বলিয়া উহাকে 'বড়-বাড়ী' বলিয়াও অনেকে অভিহিত করিত।

আমার পিতা নবকুমার দাস তৎকালে খুব ভাল ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। সেইজন্য তিনি অনায়াসেই সরকারী কাজ পাইলেন, কিন্তু অবশেষে ওকালতী পাশ করিয়া মাদারীপুর (ফরিদপুর জিলা) বারের সর্বশ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া গণ্য হইলেন। অতঃপর তিনি ওকালতী ত্যাগ করিয়া লোনসিংহে আসিয়া জমিদারী দেখাশুনা করিতে থাকেন। আমার পিতামহের মৃত্যুর পরে তিনি ম্যাজিষ্ট্রেটের হেড ক্লার্কের পদ পাইয়া বরিশাল চলিয়া যান। সেই

বৎসর ১২৮৩ সালের ১৬ই মাঘ, ইং ১৮৭৭ খৃঃ ২৮শে জানুয়ারী রবিবার সূর্য্যোদয়কালে লোনসিংহ গ্রামে আমার জন্ম হয়। আমার জন্মকালে ঐ গ্রাম ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত ছিল, বর্ত্তমানে উহা ঢাকা জিলার অন্তর্ভুক্ত।

আমার মা স্বর্ণসুন্দরী দেবী বরিশালের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠ কুলিন বসু বংশের মেয়ে ছিলেন। আমার মাতামহ জয়চন্দ্র বসু ইদিলপুর পরগণার ধীপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। আমার মা একাধারে উচ্চশ্রেণীর রন্ধনাদি, সূচীকাজ, চিত্রাঙ্কন ও সঙ্গীতেও বিশেষ পারদর্শিনী ছিলেন। মা শিশুবেলায় আমাকে রামায়ণ, মহাভারত, সম্ভাবশতক প্রভৃতি পুস্তক হইতে হিতোপদেশমূলক গল্প শুনাইতেন এবং ধর্ম ও নীতি শিক্ষা দিতেন। গৃহশিক্ষক পড়াইয়া গেলে সময় সময় মা নিজেও আমার পড়াশুনা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেন। মা অত্যন্ত স্নেহপরায়ণা ছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে রাগিয়া গেলে নির্মমভাবে প্রহার করিতেও বিরত হইতেন না। শাসন করার ব্যাপারে বাবাও কম কঠোর ছিলেন না। ছয় ফুট দুই ইঞ্চি দীর্ঘ, বিশাল বক্ষ, শক্তিমান পুরুষটি শিশুকালে আমার আতঙ্কের কারণ ছিলেন বলিলেই চলে।

বাল্যকাল

পাঁচ বৎসর বয়সে মায়ের সঙ্গে বরিশাল গিয়াছিলাম। বাবা তখন বরিশালে ছিলেন। প্রথমে আমি বরিশালের সরকারী বঙ্গ বিদ্যালয়ে ভর্তি হইয়াছিলাম। পরে যে দিন শ্রদ্ধেয় অশ্বিনী দত্ত মহাশয়ের ব্রজমোহন ইনষ্টিটিউশন স্থাপিত হয়, সেই দিনই আমি বঙ্গ বিদ্যালয় হইতে নাম কাটাইয়া ছয় বৎসর বয়সে ঐ স্কুলে ভর্তি হই। দুইবৎসর পরে তথা হইতে বরিশাল জিলা স্কুলে ৭ম শ্রেণীতে ভর্তি হইলাম। তাহার পর বাবা বরিশাল হইতে ফরিদপুর চলিয়া আসিলে আমিও ফরিদপুর আসিয়া জিলা স্কুলে ভর্তি হই।

আমার যতদূর স্মরণ আছে, তাহাতে মনে হয় বরিশাল থাকা কালেই আমার মানসিক বিকাশ ঘটিতে থাকে। সেখানে আমি ভাল ছেলেরূপেই গণ্য হইতাম, পরীক্ষায় নীচের ক্লাসে ইংরাজী বিষয়ে ১ম কিম্বা ২য় স্থান অধিকার করিতাম, কিন্তু বয়সে বড় যে সমস্ত ছাত্র ছাত্রবৃত্তি কিম্বা মাইনর পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া আমাদের সহপাঠী হইত তাহাদের সঙ্গে অঙ্ক ও বাংলা বিষয়ে আঁটিয়া উঠিতে পারিতাম না। বিশেষতঃ প্রশ্নের অঙ্কে আমি নিতান্তই কাঁচা ছিলাম।

এদিকে ইংরাজীতে এত ভাল ফল করিয়াও বাবার তাড়না হইতে রেহাই পাইতাম না। কারণ বাবার ইচ্ছা ছিল আমি যেন শিশু বয়স হইতেই সাহেবদের সঙ্গে ইংরাজীতে কথোপকথন করিতে পারি। কিন্তু সত্য বলিতে কি, বাবার তাড়নার ফলে ক্রমে ক্রমে ইংরাজী বিষয়ের উপর আমার কেমন যেন আতঙ্ক ও বিদ্বেষ জন্মিতে লাগিল।

আমাদের বাসায় তিন চার জন নিকট ও দূর আত্মীয় আশ্রিত ভাবে থাকিয়া পড়িত। তাহা ছাড়া আমার গৃহশিক্ষকও থাকিতেন। তাহাদের মধ্যে সময় সময় বিভিন্নরূপ রাজনৈতিক ও ধর্মসংক্রান্ত আলোচনাও হইত। কোন কোন সময় গৃহশিক্ষক এবং ঐ সমস্ত ছাত্রদের বন্ধু-বান্ধব, এমন কি পাড়ার উৎসাহী যুবকগণও আলোচনায় যোগদান করিত। কখনও কখনও আমার বাবাও ঐ আলোচনা-চক্রে যোগ দিতেন এবং সিপাহী বিদ্রোহের ইতিহাস বলিতেন। বালক বয়সেও আমি ঐ সমস্ত আলোচনা আগ্রহভরেই শুনিতাম। আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের সম্পূর্ণ মর্মোদ্ধার করিতে না পারিলেও, ইহার ফলে আমার মনে ধর্মের প্রতি ভক্তি জন্মিতে থাকে এবং আমার কোন কোন গৃহশিক্ষক প্রবল ব্রাহ্মভাবাপন্ন থাকা সত্বেও হিন্দু ধর্মের প্রতিই আমার অনুরাগ বাড়িতে থাকে। এতদ্ব্যতীত দেশের বাড়ীতে দুর্গাপূজা, কালীপূজা প্রভৃতি বার মাসে তের পার্বণ উপলক্ষে সেই আকর্ষণ আরও বহুগুণ বর্ধিত হইল। এমন কি ধূপের গন্ধে, কাঁসর-ঘণ্টা শঙ্খের মাঙ্গল্য ধ্বনি ও হুলুধ্বনিতে আমার প্রাণে বড়ই আনন্দ হইত। বরিশালে পড়িবার সময় বিদ্যালয়ে যাইবার পথে পাষাণময়ী কালীবাড়ী, মদনমোহনের আখড়া, জগন্নাথের আখড়া, তালতলার কালীবাড়ী প্রভৃতি দেব-দেবীর স্থানে যাইয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া ও চরণামৃত গ্রহণ করিয়া

বিদ্যালয়ে যাইতাম। সেজন্য কিছু রাস্তা ঘুরিয়া যাইতে হইত এবং ইহার ফলে বিলম্ব হইত বলিয়া বিদ্যালয়ে শিক্ষক মহাশয়গণ তিরস্কার করিতেন। তথাপি এই অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে পারি নাই।

তৎকালে বরিশালের স্বনামখ্যাত অশ্বিনী দত্ত মহাশয় দুর্গাপূজার সময় 'দুর্গাপূজা মাহাত্ম্য' (Durga Puja Gift) প্রভৃতি নাম দিয়া পুস্তক ছাপাইতেন এবং বরিশালের প্রায় প্রত্যেক স্কুলের ছোট-বড় নির্বিশেষে সকল ছাত্রকেই উহা উপহার দিতেন। তাহার মধ্যে পূজার প্রকৃত তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করিয়া দেখাইয়া দিতেন যে, কি ভাবে লোকে পূজার মাহাত্ম্য ও যাথার্থ্য না বুঝিয়া ধর্মের নামে অধর্ম করিয়া থাকে। শিশু বয়সে ঐ সকল তত্ত্বকথার প্রকৃত মর্ম উপলব্ধি না করিলেও হিন্দু ধর্মের প্রতি আমার আকর্ষণ বাড়িতে থাকে এবং আরও জানিবার ও বুঝিবার আকাঙ্খা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যে বৎসর জেলা স্কুলে প্রথম ভর্তি হই সেই বৎসরই 'গোল্ডেন জুবিলী' অনুষ্ঠিত হয়। রাজভক্তিতে বরিশাল উন্মত্ত হইয়া ওঠে, সঙ্গে সঙ্গে আমিও কুইন ভিক্টোরিয়ার প্রতি এবং রাজার জাতি হিসাবে সমগ্র ইংরাজের প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধা পোষণ করিতে আরম্ভ করি। যে বৎসর চতুর্থ শ্রেণীতে (বর্তমান ৭ম মান) পড়ি, সে বৎসর বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর স্যার ষ্টুয়ার্ট বেলী কার্য্য পরিদর্শন হেতু বরিশালে আগমন করেন। সমগ্র শহরবাসী তাঁহাকে বিপুলভাবে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন। ঐ উপলক্ষে আমরা এক সপ্তাহের ছুটী পাই এবং যেহেতু লাট সাহেবের আগমন উপলক্ষে স্কুলের ছুটী মিলিল, সেই হেতু তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা আরও বাড়িয়া গেল।

কিন্তু শীঘ্রই অবস্থার পরিবর্তন ঘটিল। তৎকালে অশ্বিনী দত্ত কংগ্রেসের একজন প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন; তিনি কংগ্রেসের আয়োজিত বিভিন্ন সভা-সমিতিতে বক্তৃতা প্রসঙ্গে গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে বহুপ্রকার দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিতেন এবং 'কংগ্রেসের মাধ্যমে আন্দোলন করিয়া আমরা আমাদের অধিকার লাভ করিব' —এই মতও প্রচার করিতেন।

তখনকার দিনে সামান্য দুই চারিজন ব্যতিক্রম ছাড়া মুসলমান সম্প্রদায়ের বৃহৎ অংশই কংগ্রেসকে বিদ্বেষ এবং সন্দেহের চোখে দেখিত। বেলী সাহেবের পর বাংলার লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর হইয়া আসিলেন ইলিয়ট সাহেব। বঙ্গবাসী প্রভৃতি পত্রিকায় ইলিয়ট সাহেবের বিরুদ্ধে নানারূপ অভিযোগ প্রকাশ পাইতে থাকে। চাকুরিতে নিয়োগ এবং অন্যান্য বিষয়েও মুসলমানদের প্রতি সরকারী তরফের পক্ষপাতিত্বমূলক মনোভাব প্রকাশ পাইতে লাগিল। সাধারণ লোকেদের মধ্যেও এই সব বিষয়ে আলাপ-আলোচনা শুনিতে পাইতাম যে, স্বাধীনতা না পাইলে এইরূপ অবিচার ও পক্ষপাতিত্ব দূর হইবে না। আবার কেহ কেহ বলিত যে, ইংরাজের ন্যায় কেহই এইরূপ সুশৃঙ্খলায় রাজ্য চালাইতে পারিবে না, সুতরাং ইংরাজ রাজত্ব নষ্ট হইবে না।

যাহাই হউক, স্বপক্ষে বিপক্ষে এইসব তর্ক-বিতর্ক শুনিয়া এবং সিপাহী বিদ্রোহের কাহিনী শুনিয়া আমার শিশু মর্ন উতলা হইয়া উঠিত। একদিন শুনিলাম সন্ন্যাসী বিদ্রোহ ব্যর্থ হইল, সিপাহী বিদ্রোহও ব্যর্থ হইল, কিন্তু একদল সন্ন্যাসী গুপ্তভাবে শিষ্য সংগ্রহ করিয়া দেশের নানাস্থানে গুপ্ত সমিতি গঠন করিতেছেন। তান্ত্রিক মতে যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে এক হস্তে অসি ও অপর হস্তে মড়ার মাথার

খুলির মধ্যে মন্ত্রধারণ করাইয়া শিষ্যদের স্বদেশের মুক্তিসাধন ব্রতে দীক্ষা দেওয়া হইত। প্রতিজ্ঞায় বলা হইত, দেশের স্বাধীনতা অর্জন ও হিন্দু রাজত্ব স্থাপনহেতু সর্বরূপে প্রাণ উৎসর্গ করিব। শুনিয়াছি, অসি বীরত্বের প্রতীক, মড়ার মাথা জীবন উৎসর্গের প্রতীক এবং মন্ত্র উন্মাদনাপূর্ণ প্রেরণার প্রতীক।

বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট এই সকল গুপ্ত সমিতিগুলির অস্তিত্ব অনুভব করিতে পারিয়া হিউম সাহেব নামে একজন উচ্চশ্রেণীর রাজকর্মচারীকে এই বিষয়ে অনুসন্ধানের ভার অর্পণ করেন। তিনি এতৎসম্পর্কে প্রায় সকল সংবাদ সাফল্যের সহিত সংগ্রহ করিয়া এইরূপ মন্তব্য করেন যে, এই গুপ্ত আন্দোলন দমননীতি দ্বারা প্রতিরোধ করা সম্ভব বা সহজ হইবে না, কিন্তু যদি দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে তাহাদের অভাব অভিযোগ আলোচনার জন্য প্রকাশ্য অধিকার দেওয়া যায় এবং গভর্ণমেণ্টের নিকট আবেদন করিলে অভাব-অভিযোগের প্রতিকার হয়—এইরূপ বিশ্বাস যদি ভারতবাসীর মনে জন্মান যায়, তবেই লোকে গভর্ণমেণ্টের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারিবে ও তাহার ফলে গুপ্ত আন্দোলনাদি ধীরে ধীরে বিলুপ্ত হইবে। এই সুপারিশের ফলে আসামের কটন সাহেব, হিউম সাহেব, ব্যারিষ্টার ডব্লিউ সি, ব্যানার্জি, ম্যাজিষ্ট্রেট (পরে কমিশনার) রমেশ দত্ত, দাক্ষিণাত্যের জাষ্টিস রাণাডে প্রমুখ ব্যক্তিগণের প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষে কংগ্রেসের পত্তন হয়। ক্রমে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও অন্যান্য নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং দেশের অভ্যন্তরে কংগ্রেসের ক্রিয়া-কলাপ ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পাইতে থাকে। আমার গৃহশিক্ষকের নিকট' শুনিতে পাইলাম যে, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি এবং অপরাপর নেতাদের বাণী, উপদেশ ও প্রচারের প্রভাবে দেশের

গুপ্ত আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হইয়া আসে এবং গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য ইহাতে সিদ্ধ হয়। সুরেন্দ্রনাথ দেশের লোককে আশ্বাস দিয়াছিলেন যে, কংগ্রেসের ভিতর দিয়াই আমরা দেশের সর্ব্বরূপ অভীষ্ট সাধন করিয়া লইব। কিন্তু অদৃষ্টের কি পরিহাস, শেষ জীবনে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত এবং দেশের লোকের নিকটও অবজ্ঞাত হন।

আমার গৃহশিক্ষক ঘোরতর হিন্দু-বিদ্বেষী এবং ব্রাহ্মভাবাপন্ন ছিলেন, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। সুযোগ পাইলেই তিনি হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুর রীতি-নীতি, শাস্ত্রীয় আচারাদি সম্পর্কে নিন্দাবাদ করিতেন। কিন্তু ঐ সকল নিন্দাবাদ শুনিলে আমার মনে আঘাত লাগিত। একদিন ঘরে বসিয়া পাড়ার কয়েকজন লোকের সহিত মাষ্টার মহাশয় যখন হিন্দুধর্মের মুণ্ডপাত করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ আমি বলিয়া ফেলিলাম, 'আচ্ছা মাষ্টার মহাশয়, নিজে হিন্দুকুলে জন্মিয়া গর্বের সহিত হিন্দু জাতির, হিন্দুধর্ম ও পিতৃ-পুরুষের নিন্দা করায় কোন গৌরব আছে কি ?'

আমার মুখে এহেন অপ্রত্যাশিত কথা শুনিয়া মাষ্টার মহাশয় স্তম্ভিত হইয়া গেলেন, মনে হইল যেন একটু লজ্জিতও হইয়াছেন। সেখানে যাহারা হিন্দুধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, তাহারা প্রথমতঃ হাসিয়া উঠিলেন এবং পরে আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'হাঁ, হাঁ, তুমিই পারিবে।'

এই ঘটনাটি নানাদিক দিয়াই আমার মনে গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছিল।

চাকুরী উপলক্ষে বাবা বরিশাল হইতে ফরিদপুর বদলী হইলে আমিও ফরিদপুর যাইয়া তৃতীয় শ্রেণীতে ভর্তি হইয়াছিলাম, এ কথা পূর্বেই বলিয়াছি। এই সময়ে মণিপুর-যুদ্ধ আরম্ভ হইল। 'বঙ্গবাসী', মাসিক 'জন্মভূমি' প্রভৃতি পত্রিকায় মণিপুর-যুদ্ধ এবং টিকেন্দ্রজিতের ফাঁসী প্রদান সম্বন্ধে, মণিপুরের রাজাকে সাধারণ বন্দীভাবে আন্দামানে প্রেরণ ইত্যাদি সংবাদ, প্রবন্ধ ও ছবি ছাপা ও প্রকাশিত হইতে থাকিলে সরকার 'জন্মভূমি' পত্রিকার পরিচালকগণের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অভিযোগ আনেন। এই সকল সংবাদ জানিতে পারিয়া মণিপুরের প্রতি আমার একটা অজ্ঞাত মমতা এবং ইংরাজের ছলনা ও নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে আপনা হইতেই মনের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়া উঠিল। মনে হইল অর্জুনের পুত্র বভ্রুবাহনের বংশধরগণই বর্তমানে মণিপুরের রাজা। এই সময়েই একদিন বাবার মুখে শুনিলাম ইংরাজগণ কিরূপ ছলনা করিয়া পাঞ্জাব প্রভৃতি রাজ্য হস্তগত করিয়া ভারতের উপর পূর্ণ প্রভুত্ব করিতেছে—কিরূপ ছলনা করিয়া রণজিৎ সিংহের পুত্র বালক দিলীপ সিংহকে বন্দী করিয়া বিলাতে লইয়া

যাইয়া খৃষ্টান করিয়া রাখিয়াছে। স্কুলে হাণ্টার সাহেবের এবং রমেশ দত্তের ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়ান হইত এবং সে-কালের ইতিহাস পুস্তকে বর্তমান সময় অপেক্ষা অনেক অধিক সত্য কথা লিখিত হইত। সেই সব ইতিহাস পাঠ করিয়া ক্রমে ইংরাজ রাজত্ব ও মুসলমান রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ভাব জাগিয়া উঠিতে লাগিল। মুসলমান রাজত্বকালে হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচারের কাহিনী পড়িয়া মনে দুঃখ পাইতাম। সহপাঠী কিম্বা বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে যাহাকেই সিপাহীযুদ্ধ অথবা কোন যুদ্ধ বা সৈন্য সংক্রান্ত কথা বলিতে শুনিতাম তাহাদেরই ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করিতাম, "বলত ভাই, কি করিয়া ইংরাজ তাড়াইয়া এই দেশকে স্বাধীন করা যায়?" বন্ধুরা কেহ বা ছোটমুখে বড় কথা শুনিয়া উপহাস করিত, কেহ বা পাগল বলিত, আবার কেহ কেহ বা সহানুভূতিসূচক কথাও বলিত। কিন্তু কেহই কোন উপায় বলিয়া দিতে পারিত না। তৃতীয় শ্রেণীতে পাঠ্যাবস্থায়-ই বঙ্কিমচন্দ্রের বইগুলি পড়িতে আরম্ভ করি, বিশেষ করিয়া তাঁহার যে-যে গ্রন্থে যুদ্ধের কাহিনী থাকিত, সেইগুলি পড়িতেই অধিক আনন্দ পাইতাম। তাঁহার "দেবী চৌধুরাণী" এবং "আনন্দমঠ" পড়িয়া আমার মনে স্বাধীনতার আকাঙ্খা তীব্রতর হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু আনন্দমঠের প্রথম পৃষ্ঠায় বঙ্কিমবাবু সামান্য একটু বর্ণনা যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহার প্রকৃত মর্ম তখন কিছুই বুঝিতে পারি নাই। অথচ বুঝিবার ও জানিবার আগ্রহ ক্রমশঃ বর্ধিত হইতে থাকে। এই সকল বিষয় অনবরত ভাবনার ফলে মনের মধ্যে বঙ্কিমের কথার প্রতিধ্বনি শুনিতে পাইতাম। "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কিত বিষয়-ব্যাপার কর্মাদি গভীর অরণ্যের ন্যায়ই বিপদ-সঙ্কুল, কোন্ পথে কিভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপেই অজ্ঞাত ও সন্দেহাকীর্ণ,—তাই গভীর

অন্ধকারে পূর্ণ, কারণ কোনদিক হইতেই কোনরূপ আশার আলোক পাইবার সম্ভাবনা নাই,—কোনদিক হইতেই কোনরূপ আশার বাণী কিম্বা কোন প্রশ্নের উত্তর পাইবারও সম্ভাবনা নাই—তাই সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ ;—তথাপি প্রাণের আকুলতা শান্ত হইতে চায় না,—তাই প্রাণ হতাশে কাঁদিয়া চীৎকার করিয়া প্রশ্ন করিল 'আমার মনস্কামনা কি সিদ্ধ হইবে না?' আশা! যদিবা কোথাও হইতে কোনরূপ আশার বাণী শুনিতে পাওয়া যায় ; প্রাণের আকুলতা হেতু বারংবার একই প্রশ্নের উদয় হইতে লাগিল ; পরিশেষে আকাঙ্খার তীব্রতা ও মানসিক সাধনার ফলে প্রাণ হইতেই প্রতিপ্রশ্ন আসিল—"তোমার পণ কি? অর্থাৎ সিদ্ধিলাভ হেতু কি মূল্য দিতে পার? পৃথিবীতে বিনা মূল্যে, কিম্বা বিনিময় ব্যতিরেকে কোন কিছুই পাওয়া যায় না।" —প্রাণ হইতেই প্রতি প্রশ্নের উত্তর জাগিল, "পণ আমার জীবন সর্বস্ব" অর্থাৎ "ইষ্টসিদ্ধি হেতু জীবন বিসর্জন দিতেও কুণ্ঠিত হইব না।" কিন্তু উচ্চ সাধনাপূর্ণ প্রাণ উপলব্ধি প্রভাবে বলিয়া উঠিল "প্রাণ তুচ্ছ, প্রাণ সকলেরই আছে, প্রাণ সকলেই দিতে পারে।" ভাবার্থ এই যে, "উচ্ছ্বাস ও আবেগ ভরে কেবলমাত্র প্রাণ বিসর্জন করিলেই ইষ্টলাভ হয় না।" আকুল প্রাণ পুনরায় প্রশ্ন করিল, "তবে আর কি আছে, আর কি দিব?"—উচ্চ সাধনাপূর্ণ প্রাণ হইতে উত্তর আসিল—ভক্তি। কিন্তু ভক্তি কি, তাহা বুঝিতেই আমার অনেক বিলম্ব হইয়াছিল। পরিশেষে ভক্তি সম্বন্ধে আমার মনে ধারণা জন্মিল—মান, অপমান, ভয়, বাধা-বিঘ্ন, বিপদ, লাঞ্ছনা, স্বার্থ, ভোগ-বিলাস, গর্ব, অহঙ্কার, অভিমান, ঘৃণা, লজ্জা, যশ, মায়া-মমতা এই সকলই প্রয়োজন মত পূর্ণরূপে তুচ্ছ করিয়া কেবলমাত্র ইষ্টসিদ্ধি লাভ হেতু ঐকান্তিকতা সহ কর্তব্য পথে অগ্রসর হওয়ার নামই ভক্তি। হইতে পারে আমার

এই ধারণা সঠিক নয় কিন্তু আমার প্রথম জীবনের এই ধারণাই আমার যৌবনকালের কর্মজীবনে বিশেষভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

একদিন শিবাজী সম্পর্কে রমেশ দত্তের ইতিহাসে পড়িলাম, "তাঁহার মহাভারত পাঠ এবং মুসলমানগণের প্রতি তীব্র বিদ্বেষই শিবাজীকে তাঁহার ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য প্রস্তুত করিয়াছিল।"

শিবাজীর ইতিহাস এবং "দেবী চৌধুরাণী" পড়িয়া ঐ বয়সেই আমার মনে দৃঢ় সংস্কার জন্মিয়াছিল যে, স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলনের প্রস্তুতি করিতে যে বিপুল অর্থের প্রয়োজন হইবে, তাহা ডাকাতি ব্যতীত লাভ করা অসম্ভব। ক্রমে লেখা-পড়া উপেক্ষা করিয়াও ঐ সমস্ত বিষয়ে গবেষণা করিতাম। বাবাকে না জানাইয়া রাত্রি বারটা, একটা পর্যন্তও জাগিয়া জাগিয়া মহাভারত পড়িতাম।

পূর্বেই বলিয়াছি বাবার অতিরিক্ত তাড়নার ফলে ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাল শিখিতে পারি নাই। কিন্তু অঙ্কে আমার প্রখরতা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বিশেষতঃ জ্যামিতির Extra কষিতে এইরূপ সিদ্ধহস্ত হইয়াছিলাম যে, উপরের ক্লাসের ছাত্রগণও কখনও কখনও ঐ বিষয়ে আমার সাহায্য গ্রহণ করিত। জ্যামিতির Extra কষিতে আমার মাথা পরিষ্কার ছিল বলিয়া ফরিদপুরে আমার আর একটি উপ-নাম জুটিয়া গেল, সমবয়সী বা সহপাঠীরা সকলেই আমাকে 'clear head' বলিয়া ডাকিত। কাহারও সহিত কলহ বা বাগ্‌বিতণ্ডা হইলে তাহারা ব্যঙ্গ করিয়া বলিত, 'clear head' কিনা, তাই এরূপ বুদ্ধি বা এরূপ চাল!

মোট কথা, আমি বিশেষ ভাল ছাত্র না হইলেও অঙ্ক বিষয়ে দক্ষতা হেতু প্রায় সমস্ত ভাল ছেলেদের সহিতই আমার বন্ধুত্ব ও

ভালবাসা জন্মে। তাই যাহারা লেখাপড়ায় কিম্বা অন্যরূপে ভাল হইত না, অনেকক্ষেত্রেই তাহাদিগকে অবজ্ঞার চোখে দেখিতাম।

এই সময়ে মাকে প্রায়ই বঙ্কিমচন্দ্রের "কৃষ্ণ চরিত্র" পড়িতে দেখিতাম এবং সময় সময় ঐ বিষয়ে মা ও বাবার আলোচনাও শুনিতাম। তাহাতে হিন্দুধর্মের স্থূল মর্ম সম্বন্ধে আমার সবিশেষ আগ্রহ জন্মিল। তাই হিন্দুধর্মের মর্ম ও তত্ত্ব জানিবার আগ্রহবোধে একদিন বাবা-মা কাহাকেও কিছু না জানাইয়া ফরিদপুর 'বাল্যাশ্রম'-এ ভর্তি হইলাম। নিয়ম অনুসারে তথায় সময় সময় আমাকে ধর্ম সম্বন্ধে রচনা লিখিয়াও পাঠ করিতে হইত এবং এই কারণে বিভিন্ন ধর্ম পুস্তক পাঠ করিতে হইত। শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, বনমালী সেন এবং কলিকাতা ও নবদ্বীপ হইতে আগত কিম্বা আহুত শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের আলোচনা ও বক্তৃতাদি শুনিতে পাইতাম। এই বাল্যাশ্রম হইতেই আমার মন ও চরিত্রের বল গঠিত হইতে থাকে এবং ধর্মনিষ্ঠাও ক্রমেই বাড়িতে থাকে।

ফরিদপুর ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন হাউসে কয়েকজন মেয়ে পাদ্রি থাকিতেন; তাঁহারা দ্বিপ্রহরে বাড়ী বাড়ী যাইয়া মেয়েদের নিকট হিন্দু ধর্মের নিন্দা করিয়া খৃষ্টধর্মের ব্যাখ্যা শুনাইতেন। আমাদের বাসায়ও তাঁহাদের যাতায়াত ছিল এবং যে-দিন মাকে শিবপূজা করিতে দেখিতেন, সে-দিন তাঁহারা নানারূপ বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করিতেন। যে-বৎসর আমি প্রথম শ্রেণীতে (দশম শ্রেণী) পড়ি, সে-বৎসর একদিন ব্যাপ্‌টিষ্ট মিশন হাউস হইতে তাহাদের রবিবাসরীয় প্রাতঃ-কালীন বিদ্যালয়ে ভর্তি করাইবার অভিপ্রায়বশতঃ পাড়ার কয়েকজন মেয়ের সহিত আমার ভগ্নীকেও লইয়া যাইবার জন্য ঝি পাঠাইয়া দিল। আমার ভগ্নী সঙ্গীদের সহিত যাইবার জন্য খুবই উৎসুক

দেখিলাম, এবং মা-বাবাকেও কোনরূপ আপত্তি করিতে না দেখিয়া অবশেষে আমি নিজেই রুখিয়া দাঁড়াইলাম। আমি যুক্তি দেখাইলাম যে, পাদ্রিগণ তথায় হিন্দুর অখাদ্য খাইতে উপদেশ দিবে, হিন্দু-ধর্মের বিরুদ্ধে কুশিক্ষা দিবে আর খৃষ্ট-ধর্মের ব্যাখ্যা শুনাইতে শুনাইতে তাহাদের খৃষ্টান করিয়া ফেলিবে। মা আমাকে ধমক দিয়া বলিলেন, "তুমি বলিবার কে? তোমার এত আধিপত্যই বা কেন? আমার মেয়েকে আমি যেখানে খুসী পাঠাইব, তুমি তোমার কাজ কর।"

এই কথা শুনিয়া আমি সঙ্গে সঙ্গেই ক্রোধবশতঃ ঘর হইতে লাফাইয়া বাহিরে চলিয়া আসিয়া বলিলাম, "তবে তোমরাই খৃষ্টানী ভাত খাও, আমি চলিলাম।" এই কথা বলিয়াই বাড়ীর পিছনের দিকের পথ দিয়া বাহির হইয়া গেলাম।

আমার ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া মা ভয় পাইলেন ও সঙ্গে সঙ্গেই বাড়ীর এক ভৃত্যকে আমাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য পাঠাইলেন। কিন্তু ততক্ষণে আমি বাড়ী ছাড়িয়া বহুদূরে চলিয়া গিয়াছি। মানচিত্রে দেখিয়াছিলাম ফরিদপুর হইতে কলিকাতা পর্যন্ত একটি রাস্তা শেরশাহ্ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই রাস্তা ধরিয়া কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলাম। তখন হাঁটিতে হাঁটিতে খেয়াল ছিল না, সহসা একটি প্রশস্ত খাল দেখিতে পাইলাম। জোয়ারের জলে খাল পরিপূর্ণ, পার হওয়া এক সমস্যা মনে হইল। খালের অপর পারে ভীষণ জঙ্গল এবং রাস্তা কোন্ দিক দিয়া তাহাও সঠিক বুঝিতে পারিতেছিলাম না। এমন সময় কয়েকটি মুসলমান সেখানে উপস্থিত হইল। তাহারা কেহ বা আমাকে নানারূপ প্রশ্ন করিতে লাগিল, আবার কেহ বা বিদ্রূপ করিতেও সুরু করিল। অবশেষে দুই-তিনটি বালক ভিন্‌দেশী বালকের প্রতি সহানুভূতিবশতঃ একখণ্ড আখ ও

একটি বেল দিয়া খাইতে বলিল এবং খাল পার হওয়ার রাস্তাও দেখাইয়া দিল। সন্ধ্যার সময় ফরিদপুর হইতে প্রায় ২২ মাইল দূরবর্তী মধুমতী নদীর তীরে সৌদপুর গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। কিন্তু গ্রামের ভিতর না গিয়া কিছুক্ষণ নদীর তীরে বসিয়া থাকিলাম এবং পরে রাত্রিতে নিকটস্থ এক বাজার দেখিতে পাইয়া সেই বাজারের এক ছাউনীর মধ্যে কিছু খড় বিছাইয়া ক্লান্তিবশতঃ শুইয়া পড়িলাম, ক্ষুধার জ্বালাও ছিল, শীঘ্রই ঘুমাইয়া পড়িলাম।

পরের দিন ঘুম হইতে উঠিয়া আমার চলিবার শক্তি যেন আর ছিল না। তথাপি হাঁটিতে হাঁটিতে একটি খালের নিকট আসিয়া দাঁড়াইলাম এবং কি ভাবে পার হইব তাহাই একমনে চিন্তা করিতেছিলাম। খেয়া নৌকায় লোক পারাপার হইতেছে—কিন্তু আমার যে খেয়ার ভাড়াও সঙ্গে নাই। আমার মলিন চেহারা ও অপেক্ষমাণ অবস্থা দেখিয়া খেয়ার মালিক আমাকে ডাকিয়া আমার নাম, ধাম, কোথায় যাইব প্রভৃতি জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি কোন কিছু গোপন না করিয়া তাঁহার নিকট সবই বলিয়া ফেলিলাম। তিনি আমাকে সস্নেহে তাঁহার খালের পারের ঘরটিতে নিয়া গেলেন এবং বাজার হইতে দধি, চিঁড়া, চিনি, আম প্রভৃতি লইয়া আসিয়া আহার করিতে দিলেন। আমি ভদ্রলোকের দয়ায় খুবই অভিভূত হইয়া পড়িলাম। কিন্তু আহারাদি করিয়া বিশ্রাম করিতে করিতে ঘুমাইয়া পড়িলাম। পরে ঘুম হইতে উঠিয়া আমার মনে হইল যে, আমার আহারের উচ্ছিষ্ট বাসন-পত্র আমার নিজেরই পরিষ্কার করা উচিত ছিল। পরে সত্যই আমি লজ্জা অনুভব করিতে লাগিলাম।

যাহা হউক লোকটি আমাকে স্নেহ ও শাসনের ভঙ্গীতে বলিলেন যে, আর মা-বাবাকে না কাঁদাইয়া আমি যেন বাড়ী ফিরিয়া যাই।

আমারও সত্য সত্যই তখন বাড়ীর জন্য মন কেমন করিতেছিল, মা-বাবা ও ভগ্নীদের কথা মনে হইতেছিল। চলিয়া আসিবার সময় দূর হইতে ভৃত্যের ডাক শুনিয়াও তখন বাড়ী ফিরিয়া গেলাম না কেন, তাহা ভাবিয়া দুঃখ হইতেছিল।

অবশেষে বাড়ীর দিকেই ফিরিয়া চলিলাম। ফরিদপুর হইতে ৪।৫ মাইল দূরে যখন গিয়া পৌঁছিয়াছি, তখন পথে আমার স্কুলের এক সহপাঠির সহিত দেখা হয়, তাহার নাম পূর্ণ চক্রবর্ত্তী। আমি গৃহত্যাগ করিবার পরে ফরিদপুরে আমার বিষয়ে জনরব রটিয়া গিয়াছিল। সহপাঠী বন্ধুটিও সেই খবর জানিত। কাজেই সে আমাকে একা ছাড়িয়া না দিয়া তাহাদের বাড়ী লইয়া গেল। তাহার মুখেই শুনিতে পাইলাম যে, ফরিদপুরে একদল লোক বলিতেছে, হিন্দু-জাতি ও হিন্দু-ধর্মের গৌরব রক্ষা হেতু অভিভাবকগণকে সচেতন করিয়া দিয়া পুলিন ভাল কাজই করিয়াছে। আবার কেহ কেহ বলিতেছে যে, বাল্যাশ্রমই গোড়ামী বাড়াইয়া দিয়া বালকগণকে পিতা-মাতার অবাধ্য হইতে অনুপ্রাণিত করিতেছে।

সেই রাত্রিতে সহপাঠী বন্ধুটির বাড়ীতেই থাকিলাম এবং পরের দিন বন্ধুর সহিত আহারে বসিয়াছি এমন সময় তাহার বড় ভাই একখানি চিঠি হাতে করিয়া আসিয়া হঠাৎ আমার নাম ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে তিরস্কারের সুরে বলিলেন, "তোমরা লেখাপড়া শিখেছ, পিতা-মাতার অবাধ্য হতে তোমাদের লজ্জা বোধ হয় না?" পরে আমার সহপাঠীকে উদ্দেশ্য করিয়া তিনি বলিলেন, "দেখিস, ও যেন আবার পালিয়ে না যায়!"

আমার বাবার সহিত বন্ধুটির দাদার পরিচয় ছিল। তিনিও ম্যাজিষ্ট্রেটের অফিসেই চাকুরী করিতেন। বহির্বাটিতে আসিয়া

দেখিতে পাইলাম, অফিসের এক পেয়াদা বসিয়া আছে, তাহার মুখে শুনিতে পাইলাম যে বাবা আমার খোঁজেই তাহাকে পাঠাইয়াছেন এবং ঐরূপ আরও কয়েকজন লোককে বিভিন্ন স্থানে অনুসন্ধানের জন্য পাঠান হইয়াছে। যাহা হউক পেয়াদার সহিত বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। মা কাঁদিয়া বলিলেন, "আমার এই সামান্য কথার জন্য আমাকে এত শাস্তি দিলি?" সেই ছোট বয়সে মায়ের চিন্তা ও ভাবনার কথা উপলব্ধি করিবার শক্তিই কি আমার ছিল!

সেই বৎসরই ইং ১৮৯৪ খৃঃ (বাং ১৩০০ সাল) প্রবেশিকা পরীক্ষা দিয়া ঢাকা হইতে বাড়ী ফিরিলাম। তখন ফরিদপুরে পরীক্ষার কেন্দ্র ছিল না। আমার পরীক্ষার বৎসরই বাবা পেন্সন লইয়া বাড়ী আসিলেন। এই বৎসরেই সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র ও ভূদেব মুখোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন।

পারিবারিক জীবন

প্রবেশিকা পরীক্ষার পর বাড়ী আসিয়া দিন কয়েক বেশ ভাল ভাবেই কাটিয়া গেল। অবসর সময়গুলিতে বাড়ীর সুবৃহৎ লাইব্রেরী হইতে বিভিন্ন পুস্তক লইয়া পড়াশুনা করিতাম। কিন্তু ক্রমে অশান্তি দেখা দিল। একান্নবর্তী পরিবারের বিভিন্নরূপ হিংসা-বিদ্বেষ, কলহ, নীচতা প্রভৃতিতে মন-প্রাণ অতিমাত্রায় উত্যক্ত হইয়া উঠিতে লাগিল। জ্ঞাতি ও অংশিদারগণের হিংসা-বিদ্বেষের ঘাত-প্রতিঘাতে এবং তৎসঞ্জাত প্রতিক্রিয়ার ফলে মা ও বাবার মধ্যে কলহের তীব্রতা এতদূর বৃদ্ধি পাইল যে, আমার মন অশান্তিতে একেবারে জর্জরিত হইয়া গেল। সময়ে সংসারে বীতস্পৃহা জন্মিত, সময়ে মার উপরে, আবার সময়ে সময়ে বাবার উপরেও ভীষণ রাগ হইত। কিন্তু একদিকে বাধ্য হইয়াই সে ক্রোধ মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিতে হইত, অপর পক্ষে কিছু বলিতে না পারিয়া আমার অন্তর যেন জ্বলিয়া-পুড়িয়া ছার-খার হইয়া যাইত। স্পষ্টতঃই বুঝিতে পারিলাম যে, পূর্বে একান্নবর্তী পারিবারিক পদ্ধতি অবশ্য সুখেরই ছিল; 'দায়ভাগ' ও 'মিতাক্ষরা'র বিভিন্ন নির্দেশগুলির মূলসূত্র ছিল 'যাহার যেরূপ শক্তি

সে সে-রূপই উপার্জন করিবে বটে, কিন্তু উপার্জিত অর্থ-সমষ্টি পরিবারান্তর্গত সকলেই প্রয়োজনমত সমানভাবে ভোগ করিবে।' কিন্তু বর্তমানে দেশের লোকের মনোবৃত্তি ঘুরিয়া গিয়াছে ; স্নেহ, মমতা, ভালবাসার পরিবর্তে হিংসা-বিদ্বেষ দেশের লোকের মন পূর্ণভাবে অধিকার করিয়া বসিয়াছে। তাই বর্তমানে একান্নবর্তী পরিবার অশান্তির আধার মাত্র এবং ধনীর নিকট নির্ধনের নানারূপ নির্য্যাতন ও লাঞ্ছনাও ভোগ করিতে হয়। আমাদের পরিবারে বাবাই ছিলেন অপেক্ষাকৃত নির্ধন, তাই মা-বাবাকে এবং আমরা তাঁহাদের সন্তান বলিয়া আমাদিগকেও জ্ঞাতিবর্গের নিকট প্রায় সর্বদাই অপমানিত ও লাঞ্ছিত হইতে হইত। এমনকি ধনী জ্ঞাতিবর্গের ভৃত্য ও বাড়ীর কর্মচারিগণও আমাদিগকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিতে তিলমাত্র কুণ্ঠা বোধ করিত না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, গ্রামের সাধারণ অধিবাসিগণ যাহারা বাবার তুলনায় ধনী নহে, তাহারাও সময়ে সময়ে সুযোগ বুঝিয়া ধনী জ্ঞাতিগণের মনস্তুষ্টি ও অনুকম্পালাভের জন্য আমাদিগের বিরুদ্ধাচরণ করিতেও কুণ্ঠিত হইত না। জ্ঞাতি-কলহ হইতে সময়ে সময়ে নিতান্ত অবাঞ্ছিত দলাদলিরও সৃষ্টি হইত। কখনও বা ঐ সমস্ত দলাদলির সূত্র ধরিয়া বিভিন্ন আত্মঘাতী মামলা-মোকদ্দমার সৃষ্টি হইত এবং গ্রামবাসিগণ কখনও এ-পক্ষ, কখনও ও-পক্ষ অবলম্বন করিয়া আর্থিকভাবে লাভবান হইত অথবা নানারূপ হেয়পন্থা অবলম্বন করিয়া নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করিয়া লইত। এইসব দেখিয়া শুনিয়া ক্রমেই আমার মন বিরূপ হইয়া উঠিতেছিল। তাই কখনও স্ব-ইচ্ছায় ধনীব্যক্তিগণের দ্বারস্থ হই নাই। অধিকন্তু ধনীগণের কৃপা-ভিখারী দাসমনোবৃত্তি সম্পন্ন সাধারণ গ্রামবাসিগণের প্রতিও যেন ছোটবেলার প্রীতি ও ভালবাসা লুপ্ত হইতে লাগিল।

কলেজ জীবন

প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান এবং রসায়ন শাস্ত্র লইয়া পড়াশুনা আরম্ভ করিলাম। গণিত শিক্ষাদাতা খ্যাতনামা কে, পি, বসু এবং রাজকুমার সেন আমাকে খুব স্নেহ করিতেন। জ্যামিতি ও কনিক্-সেকশনের extra কষিতে আমার দক্ষতা প্রকাশ পাইল। আমার মনে আছে অধ্যক্ষ কে, পি, বসু প্রথম দিন ক্লাশে আসিয়াই লাইন, পয়েণ্ট, সার্কেল লিখিতে দিলেন এবং একমাত্র আমিই বিশুদ্ধভাবে লিখিয়া ঘণ্টা বাজিবার পূর্বেই দিতে পারিয়াছিলাম।

শারীরিক অসুস্থতা এবং বয়সের দরুণ আলস্যহেতু বাবা সংসার ও বৈষয়িক ব্যাপার পরিচালনার ভার তাঁহার বৈ-মাত্রেয় ভাইয়ের নিকট দিয়াছিলেন। আমার সেই কাকা আমাকে কলেজে খরচের টাকা পাঠাইতেন; কিন্তু তিনি টাকা পাঠাইতে কার্পণ্য করিতেন। ফলে আমাকে বিদেশে প্রায়ই অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইত। তাহা ছাড়া পারিবারিক কলহ ও বাবা-মার কথা ভাবিয়া ভাবিয়া অনেক সময়েই লেখা-পড়ায় মন দিতে পারিতাম না।

কলেজে আমাদের লজিকের প্রফেসর ছিলেন মোহিনী দত্ত মহাশয়। তিনি যদিও বিলাতফেরত বাঙ্গালী খৃষ্টান ছিলেন, তথাপি পড়াইবার ফাঁকে ফাঁকে সুযোগ পাইলেই হিন্দুধর্মের ও হিন্দুর পৌরাণিক বিষয়াদির প্রশংসা করিতেন। একদিন আমাদের ক্লাশে তিনি বলিলেন যে, কলেজের নিকটেই এমন একজন যোগী পুরুষ আসিয়াছেন যিনি কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা না করিয়াই অপরের মনের কথা ব্যক্ত করিতে পারেন! আমাদের মনে কৌতূহলের সৃষ্টি হইল, তাই জিজ্ঞাসা করিলাম, তিনি কোথায় থাকেন, ঠিকানা কি?

অধ্যাপক মহাশয় বলিলেন যে তিনিও তাঁহার ঠিকানা জানিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি ঠিকানা না বলিয়া শুধু বলিয়াছেন, 'আগ্রহ থাকিলে খুঁজিয়া লইও।'

কলেজ ছুটীর পর আমরা কয়েকজন মিলিয়া সেই যোগীপুরুষের খোঁজে বাহির হইলাম। অবশেষে রাধা-গোবিন্দের মন্দিরে তাঁহার দর্শন পাইলাম। জানিতে পারিলাম তাঁহার নাম যোগানন্দস্বামী। আরও শুনিলাম যে, তিনি ঔষধ দিয়া অনেক জটিল রোগীকেও রোগমুক্ত করিয়াছেন। সংস্কৃতে ও হিন্দু-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও তাঁহার দখল ছিল। সুতরাং লোক জানাজানি হইতে বিলম্ব হইল না এবং ক্রমে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বহুলোক সমাগত হইতে লাগিল। এমনকি কে, পি, বসু, রাজকুমার সেন ও কলেজের অন্যান্য অধ্যাপকগণও স্বামীজীর নিকট যাতায়াত করিতেন। আমরা ছাত্ররাও তাঁহার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হইয়াছিলাম এবং গুরুর আজ্ঞাকারী থাকিব এই মর্মে প্রতিজ্ঞাপত্র লিখিয়া আমরা জনকয়েক ছাত্র স্বামীজীর শিষ্য হইলাম।

স্বামীজী আমাদিগকে চরিত্রবান হইতে উপদেশ দিতেন এবং ধর্ম,

অধর্ম, হিত-অহিত ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা করিয়া আমাদিগকে সত্যপথ অনুসরণ করিতে সাহায্য করিতেন। যাহাতে স্মৃতি, মেধা, বুদ্ধি ও প্রতিভা বৃদ্ধি পায় এইরূপ কতকগুলি প্রক্রিয়াও তিনি আমাদিগকে শিখাইয়া দিলেন এবং সেইসঙ্গে দুই একটি আসন ও সহজসাধ্য যোগের প্রক্রিয়াও শিখাইলেন।

যোগানন্দস্বামী ঘোরতর ইংরাজ বিদ্বেষী ছিলেন এবং কথায় কথায় প্রায়ই বলিতেন যে, ইংরাজগণ শঠতা দ্বারাই আমাদের দেশ দখল করিয়াছে।

কিছুদিন পর স্বামীজী রাধাগোবিন্দের মন্দির হইতে ঢাকার জমিদার সুবিখ্যাত গায়ক, বাদক ও ব্যায়ামবিদ রাধিকা শীল মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া বসবাস করিতে থাকেন। তখন শীল মহাশয় স্বামীজীর একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু একদিন স্বামীজীর সম্মুখে রাধিকাবাবু ইংরাজের প্রশংসা করায় তিনি রাগিয়া উঠেন এবং ক্রমে তর্ক-বিতর্কের পর উভয়ের মধ্যে মনান্তর ঘটে। এই বিবাদ উপলক্ষ্য করিয়া ক্রমে প্রকাশ পায় যে, স্বামীজী জাতিতে বৈদ্য, আসল নাম কেদার নাথ সেন, বাড়ী বর্ধমান জেলায়; গভর্ণমেন্টের চাকুরী করিতেন, কোন পুলিশ কেসে পড়িয়াছিলেন, পরে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, দেশে তাঁহার সন্তানাদিও আছে।

রাধিকাবাবুর সহিত কলহের পরে নিজের অন্নসংস্থানের প্রয়োজনে স্বামীজী ঔষধ প্রদানের বিনিময়ে অর্থগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে লোকের ভক্তি ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে। অবশেষে কিছুদিন পর স্বামীজী ঢাকা পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান।

বিবাহ

এদিকে দেশে বাবা-মা সংবাদ পাইলেন যে, আমি লেখাপড়া ছাড়িয়া এক সন্ন্যাসীর মোহে পড়িয়া তাহার চেলা হইয়াছি এবং সংসার ছাড়িয়া তাঁহার সঙ্গে চলিয়া যাইতে মনস্থ করিয়াছি। সংবাদটি আমার আত্মীয়দের মধ্যে কেহ বা বোধ করি বেশ একটু অতিরঞ্জিত করিয়াই বাবা-মার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। তাই বাবার এক টেলিগ্রাম পাইলাম, তোমার মা মৃত্যুশয্যায়, দেখিতে চাও ত শীঘ্র আসিও।

বাড়ী যাইয়া অভিভাবকগণের কৌশল বুঝিতে পরিলাম। জানিতে পারিলাম যে, তাঁহারা আমাকে 'কিছুদিন বাড়ীতে আবদ্ধ রাখিয়া মনের পরিবর্তন আনিতে চাহেন এবং বিবাহ করাইয়া সন্নাসী হওয়ার পথ বন্ধ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। আমার কিন্তু এই ব্যবস্থা ভাল লাগিল না। তাই অনেক সাধ্য সাধনা করিয়া বাবা-মাকে বুঝাইয়া ঢাকা চলিয়া আসিলাম। কিন্তু পড়াশুনায় আর মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিলাম না। যোগানন্দস্বামীর উপদেশ অনুযায়ী অধ্যাত্ম চিন্তা ও ইংরাজ তাড়াইয়া ভারতবর্ষকে স্বাধীন করার অনুপ্রেরণা একদিকে,

এবং অপরদিকে পারিবারিক নানারূপ চিন্তা-ভাবনায় মন প্রায়ই উতলা হইয়া উঠিত। সর্বদাই ক্লাশের শেষের দিকের বেঞ্চে বসিয়া যুদ্ধ সংক্রান্ত যন্ত্রপাতির ছবি আঁকিতাম। একদিন কে, পি, বসু তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, নূতন আসিয়া তুমি প্রথম বেঞ্চের উজ্জ্বল নক্ষত্র ছিলে, আজ-কাল পিছনের বেঞ্চে অন্ধকারে ডুবিয়া আছ কেন?

এদিকে উপর্যুপরি তিন বার এফ, এ, পরীক্ষায় অকৃতকার্য হইলাম এবং ঐ তিনবারই শুধু ইংরেজীতে অল্প নম্বরের ব্যবধানে ফেল হইলাম। তৃতীয় বারের পরীক্ষার ফল বাহির হইবার পূর্বেই আমার বিবাহ হয়। আমার বয়স ছিল তখন ২০।২১, আর পত্নীর ১০।১১ বৎসর। ১০ বৎসরের বালিকার উপযোগী লেখাপড়া সে শিখিয়াছিল এবং তাহার হাতের লেখাগুলি বড়ই সুন্দর ছিল। পড়াশুনার প্রতিও তাহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল। মোট কথা পত্নী আমার মনের মতই হইয়াছিল। বিবাহের দশদিন পরে পত্নী তাহার পিতা-মাতার নিকট চলিয়া গেল। আমার শ্বশুর মহাশয় শরৎচন্দ্র ঘোষ তখন দিনাজপুরের অন্তর্গত ঠাকুর গাঁ-এ নাজির ছিলেন। পত্নী পিত্রালয়ে চলিয়া গেলে একেই নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়িলাম, ইহার উপর সংবাদ আসিল যে, আমি তৃতীয়বারের এফ, এ, পরীক্ষায়ও অকৃতকার্য হইয়াছি। শুনিয়া মন খুবই কাতর হইয়া পড়িল। বাড়ীতে কাহারও সঙ্গে কথাবার্তা বলিতে ভাল লাগিত না, এক বস্ত্রে একা একা গ্রামের চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিতে লাগিলাম। আমার এইরূপ ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া বাবা প্রমাদ গণিলেন। তিনি আশঙ্কা করিলেন যে, মনের এই অবস্থায় আমি হয়ত বা আত্মহত্যাও করিতে পারি। তাই তিনি বাড়ীর এক বিশ্বস্ত, বৃদ্ধ মুসলমান চাকরকে আমার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি

রাখিতে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলেন। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, বাবা গ্রামের লোকজনকেও নাকি আমার গতি-বিধির উপর নজর রাখিতে বলিয়াছিলেন। আমার অভিভাবকগণ আরও স্থির করিলেন যে, আমাকে আর কলেজে পড়াইবেন না। আমিও প্রায় হাল ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এমন সময় প্রায় অতর্কিতেই কুচবিহার হইতে আমার ডাক আসিল। আমার বন্ধু কুঞ্জবিহারী হোড়ের এক পত্র পাইলাম। তখন সে কুচবিহার বোর্ডিং-এ থাকিয়া বি, এ, পড়িতেছিল। কুচবিহার বোর্ডিং-এ শীতকালে মাসিক ৫৲ টাকা এবং গ্রীষ্মকালে মাসিক ৬৲ টাকা দিতে হইত। তাহাতেই দুই-বেলার আহার ও শয়নের স্থান পাওয়া যাইত। বোর্ডিং-এর প্রতিটি ঘরে দুইজনের থাকিবার স্থান হইত। অতিরিক্ত ব্যয় কুচবিহার রাজষ্টেট হইতে দেওয়া হইত, তদুপরি কলেজে পড়াশুনার জন্য বেতনও লাগিত না। কুঞ্জবিহারী অত্যন্ত মেধাবী ছেলে ছিল; এনট্রান্স পরীক্ষায় ১৫৲ টাকা বৃত্তিও পাইয়াছিল। পূর্বে আমরা একসঙ্গে ঢাকা কলেজে পড়িতাম এবং একই হিন্দু হোষ্টেলে থাকিতাম। কাজেই তাহার নিকট হইতে চিঠি পাইয়া ও কুচবিহার কলেজে পড়াশুনার সুযোগ-সুবিধার বিষয় জানিতে পারিয়া আমিও সেখানে যাইয়াই পড়াশুনা করিব স্থির করিয়া ফেলিলাম। অভিভাবকগণ অর্থ সাহায্য করিবেন না এবং পড়িবার অনুমতিও দিবেন না, ইহা জানিতাম। তাই অপর কাহাকেও কিছু না বলিয়া কৌশলে অনেক বুঝাইয়া মাকে সম্মত করাইলাম। সম্প্রতি-অনুষ্ঠিত বিবাহের আশীর্বাদ উপলক্ষে যে কয়টি টাকা পাইয়াছিলাম, উহাই সম্বল করিয়া কুচবিহারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলাম।

আচার্য ব্রজেন্দ্র শীল প্রসঙ্গ

কুচবিহারে আমাদের বোর্ডিং-এর ঠিক পিছনেই কুচবিহার রাজ-সৈন্যগণের প্যারেড ভূমি ছিল। বোর্ডিং হইতেই তাহা দেখা যাইত এবং এই সব দেখিতে ও শিখিতে আমার আগ্রহও ছিল। তাই কিছুদিন দেখিয়া দেখিয়া প্যারেড সম্বন্ধে প্রায় অনেক তথ্য শিখিয়া ফেলিয়াছিলাম।

যখনকার কথা বলিতেছি, সেই সময়ে কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন স্বনামখ্যাত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয়। আমি যে বৎসর কুচবিহার যাই, সেই বৎসরেই ইটালীতে ইউরোপ ও আমেরিকার সর্বশ্রেণীর দার্শনিকগণের এক সমাবেশ হইয়াছিল এবং বেদান্ত প্রভৃতি হিন্দু-দর্শন সংক্রান্ত কতকগুলি জটিল সমস্যার সমাধানের নিমিত্ত ব্রজেন্দ্রনাথ শীল মহাশয় আহূত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি ব্রজেন্দ্রনাথের প্রভাবে ইউরোপীয় দার্শনিকগণ হিন্দু-দর্শনের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন এবং ফ্রান্সের সুবিখ্যাত দার্শনিক হেনরী বার্গসন্ ব্রজেন্দ্রনাথের সহিত আলোচনায় হিন্দু-দর্শন, বিশেষতঃ যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণকে ভিত্তি করিয়াই তাঁহার "পরিবর্তনাত্মক সূত্র" (Theory of changes)

প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ হিন্দু-দর্শন ও ইউরোপীয়-দর্শন এই উভয়বিধ দর্শন সম্বন্ধেই বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু হিন্দু-দার্শনিক পণ্ডিতগণ তাঁহার কিছু কিছু ত্রুটিরও উল্লেখ করিয়া থাকেন। ব্রজেন্দ্রনাথ পণ্ডিত শশধর তর্কচূড়ামণি মহাশয়ের নিকট হিন্দু-দর্শন সম্বন্ধে পাঠ লইতে যাইতেন। তর্কচূড়ামণি মহাশয় মাঝে মাঝে তাঁহাকে তিরস্কার করিয়া বলিতেন, তোমার প্রধান দোষ তুমি হিন্দু দর্শনকে ইউরোপীয় দর্শনের ছাঁচে ঢালিয়া বুঝিতে চাও, কিন্তু তাহা যে একেবারেই অসম্ভব! হিন্দুদর্শন অতি বিশাল, এই বিশাল বস্তু অপর কোন ক্ষুদ্র বস্তুর ছাঁচে ধরিবে কেন? অধিকন্তু উপলব্ধি ব্যতীত হিন্দু-দর্শন আয়ত্ব করা অসম্ভব এবং উপলব্ধির জন্য বিশেষ সাধনারও প্রয়োজন।

তর্কচূড়ামণি মহাশয় বলিতেন, সময়ে সময়ে বিভিন্ন দর্শনের মধ্যে আপাতঃদৃষ্টিতে যে কিছু কিছু বিরোধিতা দেখা যায়, তাহার প্রধান কারণ বিভিন্ন দর্শনগুলির উপপাদ্য বিষয়গুলিই বিভিন্ন ধরণের। সুতরাং উহাদের প্রমাণ প্রয়োগগুলিও বিভিন্ন হইতে বাধ্য। কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের কোনটাই মিথ্যা অথবা ভ্রান্ত নহে। যেমন—হস্তীর বিভিন্ন পদ, শুণ্ড, উদর, পৃষ্ঠ, দন্ত, মস্তক ইত্যাদির আকৃতি-প্রকৃতি ও প্রয়োজন সম্পূর্ণই ভিন্নরূপ, তদ্রূপ অসীম, অনন্ত, অখণ্ড ব্রহ্মসত্তার অনন্তরূপ বিকাশ বিভিন্ন ও বৈচিত্রময়; তাই হিন্দু-দর্শনশাস্ত্র-গুলিও যথাসম্ভব বিভিন্ন সূত্র অবলম্বনে বিভিন্ন বিষয় প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইয়াছে। যেমন হস্তীর বিভিন্ন অবয়বের সমষ্টিগত জ্ঞান হইতেই হস্তী সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা সম্ভব হয়, সেইরূপ বিভিন্নরূপ বৈচিত্রময় ব্রহ্মসত্তার অর্জিত উপলব্ধির যোগফলের দ্বারাই পূর্ণব্রহ্মের ধারণা করা সম্ভব হয়।

ব্রজেন্দ্রনাথ শীল যখন ইউরোপে ছিলেন, সেই সময়ে বিজ্ঞানাচার্য স্যার জগদীশ বসুও ইউরোপে ছিলেন। ইউরোপীয় মনীষীবৃন্দ তাঁহাদিগকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন যে, যে-ভারতে ঋক্‌বেদাদি রচিত হইয়াছিল, আর্য-সভ্যতার বিকাশ হইয়াছিল, উপনিষদ্‌, বেদান্তাদি শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রথম প্রচারিত হইয়াছিল, যেখানে রামায়ণ, মহাভারতের মত শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হইয়াছে, বুদ্ধদেব যে দেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যে দেশে কালিদাস, ভবভূতির মত মহাকবির উদয় এবং যে ভারতের প্রাচীন রাজনীতি, ধর্মনীতি, চিকিৎসাবিদ্যা প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞানের পরিচয় বহন করে, সে ভারত প্রথমে মুসলমানের অধীন হইয়া এখন ইংরাজের অধীন কেন? অধিকন্তু যে দেশে এখনও তোমাদের ন্যায় প্রতিভাশালী, জ্ঞানীগুণীর জন্ম হয়, সে দেশ কি করিয়া পরাধীন হইয়া আছে?

উত্তরে ব্রজেন্দ্রনাথ বলিয়াছিলেন, বর্তমান ভারতীয়গণ অত্যন্ত চরিত্রহীন এবং এই চরিত্রহীনতাই তাহাদের সকল দুর্ভাগ্যের কারণ।

কুচবিহার আসিয়া আমার পড়াশুনা একরূপ ভালভাবেই চলিতেছিল। পরীক্ষার প্রায় দুই মাস আগে বাবা পরলোকগমন করেন। তথাপি সেইবার পরীক্ষা দিতে নিরস্ত হইলাম না এবং ভাগ্যক্রমে কৃতকার্যও হইলাম। কিন্তু ভাগ্য একদিকে সুপ্রসন্ন হইলে কি হইবে! কুচবিহার হইতে পরীক্ষার পর বাড়ী গিয়া ভীষণভাবে অসুস্থ হইয়া পড়ি। এমনকি চিকিৎসক পর্যন্ত আমার বাঁচিবার আশা ত্যাগ করিয়াছিলেন। অবশেষে বাঁচিয়া উঠিলাম বটে কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারে পারিবারিক অশান্তির জালে জড়াইয়া পড়িলাম; বিশেষ করিয়া কাকার সহিত ঘোরতর বিরোধের সৃষ্টি হইল। এদিকে এফ, এ, পাশ করিবার পর আমি অনার্স লইয়া ঢাকা কলেজে বি, এ,

ক্লাশে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। কাকার সহিত বিরোধ সৃষ্টি হওয়ায় তিনি এজমালী বিষয় হইতে আমার পড়াশুনার খরচ পাঠান বন্ধ করিয়া দেন। আমাকে নিতান্ত অর্থকষ্টের মধ্যে পড়িতে হইল। আমি বাধ্য হইয়া টিউশনী করিতে লাগিলাম। বর্তমান জে, সি, গুপ্ত ও তাঁহার ছোট দুই ভাই পরেশ ও নরেশ গুপ্ত আমার এই সময়কার ছাত্র ছিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও জুবিলী স্কুলে কিছুদিন শিক্ষকতাও করিয়াছিলাম।

বিপদ কখনও একা আসে না। এই সময়ে আমার শ্বশ্রূমাতা ও আমার পত্নী উভয়েই কালাজ্বরে শয্যাগত বলিয়া সংবাদ পাইলাম। পত্নী তখন তাঁহার মায়ের নিকটেই ছিলেন। ক্রমান্বয়ে মাত্র ২৬ দিনের ব্যবধানে আমার শাশুড়ী ঠাকুরাণী ও পত্নী উভয়েই ইহলোক ত্যাগ করেন।

এই সব গোলযোগের মধ্যেও একবার বি, এ, পরীক্ষা দিয়া অকৃতকার্য হইয়াছি এবং পুনরায় ঢাকা কলেজেই ভর্ত্তি হইয়াছি। এই সময়ে কে, পি, বসু মহাশয় শিশুরঞ্জন পাটীগণিত প্রকাশ করিবার পরিকল্পনা করেন এবং উহাতে সাহায্য করিবার জন্য আমাকে নিযুক্ত করেন। শিশুরঞ্জন পাটীগণিত মুদ্রিত হইয়া গেলে পরে কে, পি, বসু মহাশয় তাঁহার এনট্রান্স ক্লাশের বীজগণিত ও এফ, এ, ক্লাশের বীজগণিত পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত আকারে বাহির করিবার সময়ও আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

লাঠিখেলার সূচনা

দেশের বাড়ীর বিষয় সংক্রান্ত পারিবারিক গোলযোগ এবং পত্নীর অকাল বিয়োগ ব্যথার মাঝেও সকল কাজই করিয়া যাইতে লাগিলাম। কলেজের পর সহপাঠী ছাত্রদের সহিত মাঠে খেলিতেও যাইতাম। ফুটবল আমি বিশেষ ভাল খেলিতাম না বটে, তথাপি ফুটবল গ্রাউণ্ডে আমার নাম ছিল "the terror of the field" অর্থাৎ ক্রীড়াভূমির আতঙ্ক স্বরূপ। কারণ আমি তীব্র বেগে আক্রমণ করিয়া ও ধাক্কা দিয়া খেলিতাম। সে সময়ে অবশ্য ধাক্কা দিয়া খেলা নীতিবিরুদ্ধ ছিল না। যাহা হউক, এই সময়ে একদিন খেলার মাঠে আমাদের সহপাঠী বারদীর নাগবংশীয় সুরেশ নাগ জানাইল যে, সাহেবরা পথে-ঘাটে বাঙ্গালীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া থাকে, ইহা প্রতিরোধের উদ্দেশ্যে কলিকাতায় সরলা দেবী একটি সমিতি গঠন করিয়াছেন এবং তিনি লোক পাঠাইয়া জানাইয়াছেন যেন ঢাকা সহরেও ঐরূপ সমিতি গঠিত হয়। এই সংবাদ পাইয়া আমরা প্রায় কুড়ি-পঁচিশ জন বন্ধু এক সঙ্গে আলোচনা ও পরামর্শ করিয়া ঢাকা সহরের অপেক্ষাকৃত নির্জন ও জঙ্গলাকীর্ণ স্থান টিকাটুলিতে আখড়া

স্থাপন করিলাম এবং লাঠিখেলা শিখিবার জন্য মুসলমান লাঠিয়াল আব্বাস সর্দারকে নিযুক্ত করিলাম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে আমিই ছিলাম অধম, কিন্তু একে একে সবাই শেষ পর্যন্ত সরিয়া পড়িল, একমাত্র আমিই রহিলাম। থাকিলে কি হইবে, আব্বাস মাত্র একজনকে শিখাইতে রাজী হইল না, কিন্তু ইতিমধ্যে আমার লাঠিখেলা শিক্ষার আগ্রহ খুবই বাড়িয়া গিয়াছে। জানিতে পারিলাম আব্বাস সর্দার গাঁজা খায়। তাই প্রায়ই গাঁজা কিনিয়া তাহার বাড়ীতে যাইতাম। কিছুদিন আব্বাস সর্দারের শিক্ষাধীনে থাকিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, আসলে লোকটি কতকগুলি লম্ফ-ঝম্ফ ও মৌখিক আস্ফালনের দ্বারা বিক্রম প্রকাশ করিয়া থাকে। যাহারা লাঠির চর্চা করে না তাহারা নিজেদের অজ্ঞতা ও অক্ষমতার সংস্কারবশতঃই মাত্র এ জাতীয় দেশীয় সর্দারগণকে লাঠিয়াল জ্ঞানে ভয় করে।

বৃহত্তর জীবনের সূত্রপাত

১৯০৫ সালে বঙ্গ-ভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হয়। এই আন্দোলন উপলক্ষে দেশের অধিকাংশ লোকই খুব উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই সময়ে ভাইস্‌রয় লর্ড কার্জন ঢাকা আসেন এবং ঢাকার নবাব তাঁহার "আসানমঞ্জিল" প্রাসাদে পরম সমাদরে লর্ড কার্জনের থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। সেখানেই ঢাকার বিশিষ্ট নাগরিকদের তিনি আমন্ত্রণ জানান এবং সেই দরবারে দৃঢ়তার সহিত ঘোষণা করেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গ হইবেই হইবে।

লর্ড কার্জনকে বিভিন্নরূপ আমোদ-আহ্লাদে আপ্যায়িত করিবার নিমিত্ত ঢাকার নবাব কোন কিছুই বাকী রাখেন নাই। সেই উপলক্ষে শ্রীরামপুরের প্রফেসর মার্তাজা লর্ড কার্জনের সম্মুখে দুই দিবস অসি-ক্রীড়া, ইন্দ্রজাল ইত্যাদি দেখাইয়াছিলেন। চুক্তি ছিল যে-কয়দিন মার্তাজা ক্রীড়া-প্রদর্শন করিবেন প্রতিদিনের জন্য তাহাকে তিনশত টাকা দিতে হইবে। কিন্তু নবাব সরকার যাতায়াত খরচ সহ সর্বসাকুল্যে মার্তাজাকে মাত্র তিনশত টাকা দিলে তিনি ক্রোধভরে তাহা প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে মোকদ্দমা করিয়া মোকদ্দমার

ব্যয় সহ তাঁহার সম্পূর্ণ প্রাপ্য আদায় করিয়াছিলেন। এই মোকদ্দমা উপলক্ষে মার্তাজাকে কিছুদিন ঢাকাতেই থাকিতে হইয়াছিল। সে সময়ে ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন পি, কে, রায়। তিনি মার্তাজাকে চিনিতেন এবং লাঠি ও অসি ক্রীড়া সমর্থনও করিতেন। তাই একদিন কলেজের নিকটবর্ত্তী মাঠে লাঠি, অসি, ছুরি প্রভৃতির ক্রীড়াকৌশল প্রদর্শনের জন্য তিনি মার্তাজাকে আমন্ত্রণ করিলেন। প্রদর্শনীর শেষে মার্তাজা ইংরেজীতে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়া এই সব ক্রীড়াকৌশল শিখিবার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন। প্রিন্সিপাল পি, কে, রায় মহাশয়ও মার্তাজাকে সমর্থন করিয়া কিছু বলেন। এই সময়ে আমার বন্ধু ভূপেশ নাগ ও আমি মার্তাজার নিকট যাইয়া লাঠি প্রভৃতি খেলা শিখিবার আগ্রহ প্রকাশ করা মাত্র তিনি আমাদের দুইজনকেই তাঁহার গাড়ীতে তুলিয়া তাঁহার বাসস্থানে লইয়া গেলেন। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি সপ্তাহে দুইদিন কলিকাতায় সরলা দেবীর সমিতিতে লাঠি, ছুরি প্রভৃতি খেলা শিক্ষা দেন। তিনি আরও বলেন যে, হিন্দু, মুসলমান একত্র হইয়া ইংরাজ বিতাড়ন কার্য করিতে হইবে।

লাঠিখেলা শিখিবার উদ্দেশ্যে আমরা শেষ পর্যন্ত মার্তাজার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলাম। মার্তাজা আমাদিগকে প্রতিজ্ঞা করাইলেন, খৃষ্টানদের এই বিদ্যা শিখাইতে পারিব না; যাহাদিগকে ইহা শিখাইব তাহাদিগকেও পূর্বে এইরূপ প্রতিজ্ঞা করাইয়া লইয়া শিক্ষা দিব এবং প্রত্যেক শিক্ষার্থীর নিকট হইতে পাঁচ পয়সা আদায় করিয়া হয় মার্তাজাকে পাঠাইয়া দিব, নতুবা কোন দরিদ্রকে দিব অথবা ব্যক্তিগত ধর্ম অনুসারে ভগবানের পূজায় ব্যয় করিব।

মার্তাজা বলিয়াছিলেন যে, এশিয়াখণ্ডকে ইউরোপ ও খৃষ্টের প্রভাব মুক্ত করাই হইবে আমাদের প্রধান লক্ষ্য।

মার্তাজার পাঠ অনুসারে আমরা লাঠিখেলার সূত্রগুলি আমাদের নোটবইয়ে লিখিয়া লইতাম। ক্রমে ঢাকার কতিপয় নবীন উকীলও আমাদের সহিত যোগদান করেন এবং তাঁহারা প্রত্যহ বৈকালে যাইয়া মার্তাজার নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করিতেন। একদিন সন্ধ্যার সময় লাঠিখেলা চর্চার পর একে একে সমস্ত হিন্দু ছাত্র ও উকীলগণ চলিয়া গেলে আমি তথায় রহিয়া গেলাম। আমাকে কেহই লক্ষ্য করে নাই। শুনিলাম মার্তাজা মুসলমান ছাত্রদিগকে বলিতেছেন যে, বাবুরা যখন আসিবে তাহাদিগকে ভুল শিখাইয়া দিব, তাহারা চলিয়া গেলে আমি তোমাদিগকে ঠিকভাবে শিখাইব। বুঝিলাম যে, মার্তাজা ও তাঁহার ছাত্রগণ আমাদের সঙ্গে কপটতা করিতেছেন। কিছুদিন পরে আপনা হইতে হিন্দু ছাত্রগণ চলিয়া গেল। কিন্তু আগ্রহ-বশতঃ আমি প্রায় রোজই যাইতাম। আমি যাইতাম বটে কিন্তু খেলায় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিতাম না। আমি যেন অন্যমনস্ক আছি এই প্রকার ভাণ করিয়া তাহাদের খেলাগুলি মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করিতাম। ক্রমে দুই একজন মুসলমান ছাত্র আমি অঙ্ক ভাল জানি এই কথা জানিতে পারিয়া আমার নিকট অঙ্ক শিখিতে আসিত। ধীরে ধীরে তাহাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব জন্মিল এবং তাহারা নিজেদের মধ্যে লাঠিখেলা চর্চা করিবার সময় আমি উপস্থিত থাকিলেও কিছু মনে করিত না। এমন কি আমিও সময় সময় তাহাদের সহিত খেলায় যোগ দিতাম। ইতিমধ্যে মার্তাজা ঢাকা ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন। মাস দুই কাল লাঠিখেলার চর্চা নিয়মিত থাকিলেও ক্রমে ক্রমে প্রায় সমস্ত মুসলমান ছাত্রদেরই যেন উৎসাহ কমিয়া আসিতে লাগিল এবং অবশেষে তাহারা লাঠিখেলা ছাড়িয়াও দিল।

এই সময় কলিকাতা হইতে দুইজন যুবক লাঠিয়াল ঢাকার

খ্যাতনামা উকীল আনন্দ রায় মহাশয়ের বাড়ীতে আসিয়া অতিথি হইল। তাহারা প্রফেসর মার্তাজার ছাত্র ; লাঠি, ছুরি খেলা প্রচার এবং প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করিয়া অর্থ সংগ্রহও তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল। একদল নবীন উকীল যাহারা মার্তাজার নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে গিয়াছিল তাহারা একটি সমিতি গঠন করিয়া ও চাঁদা তুলিয়া এই যুবক দুইজনকে রাখিয়া দিল শিক্ষাদানের জন্য। এই যুবক দুইজনের নিকট হইতে যতদূর সম্ভব খেলার কৌশলগুলি শিখিয়া রাখিবার জন্য আমার উপর ভার অর্পণ করা হইল। যুবক দুইজনের জ্ঞানও খুব বিশেষ ছিল না এবং তাহাদের নিকট অল্পই শিখিতে পারিলাম। কিন্তু লাঠি, অসি প্রভৃতি চালনার কৌশল ভালভাবে শিখিবার এক অদম্য স্পৃহা আমাকে পাইয়া বসিল। তাই অনেক অনুসন্ধানের পর মার্তাজার ঠিকানা জানিয়া তাঁহার নিকট আমার অভিপ্রায় জানাইলাম। তিন চারিখানা চিঠি লিখিবার পর শ্রীরামপুর হইতে মার্তাজার জবাব পাইলাম যে, লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে হইলে আমাকে তাঁহার বাড়ীতে যাইতে হইবে। তাহাই হইল। আমি শ্রীরামপুরে মার্তাজার বাড়ী গেলাম এবং কতকগুলি নূতন পাঠ শিখিতে সমর্থ হইলাম। কিছু কিছু ভুল-ভ্রান্তি যাহা ছিল তাহাও সংশোধন করিয়া লইলাম। বিভিন্ন সময়ে মোট পাঁচবার আমি মার্তাজার শ্রীরামপুরের বাড়ীতে গিয়াছিলাম। এক একবার নূতন কিছু শিখিয়া ঢাকা যাইতাম এবং তথায় অন্যান্য শিক্ষার্থীদের সহিত খেলিয়া নূতন কৌশলগুলির কার্যকারিতা পরীক্ষা করিয়া লইতাম।

প্রফেসর মার্তাজা প্রসঙ্গ

শ্রীরামপুরে কয়েকবার যাতায়াতের ফলে মার্তাজার পরিচয় সম্পর্কে কিছু কিছু সংবাদও জানিতে পারিয়াছি। ক্যাপ্টেন পফেম নামীয় একজন ইংরাজ সেনাপতি ওয়ারেন হেষ্টিংসের অধীনে কাশী-যুদ্ধে এবং অন্যান্য যুদ্ধে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পরিশেষে তিনি ব্যারাকপুর কোর্টের সর্বময় কর্তারূপে নিযুক্ত হন। সেকালে ভারতবর্ষে ইংরাজ পুরুষের অনুপাতে ইংরাজ রমণীর সংখ্যা নিতান্তই নগণ্য ছিল। তাই বহু উচ্চ-পদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী বিভিন্ন শ্রেণীর ভারতীয় রমণীদের রক্ষিতা রাখিত। তাহারই ফলে ভারতে টেস্ বা ফিরিঙ্গীদের উদ্ভব হইয়াছে। ক্যাপ্টেন পফেমেরও একজন মুসলমান রমণী রক্ষিতা স্বরূপ ছিল। ঐ রমণীর গর্ভে ক্যাপ্টেন পফেমের একটি কন্যা জন্মিয়াছিল। ভারতবর্ষ ছাড়িয়া যাইবার সময় তিনি ঐ কন্যাটিকে শ্রীরামপুরে কিছু জমি ক্রয় করিয়া দিয়া যান এবং তাঁহার অনেক অস্থাবর সম্পত্তিও দিয়া যান। ক্যাপ্টেন পফেমের ঐ কন্যাটি শ্রীরাম-পুরের মীর মাওন নামীয় এক মুসলমানকে বিবাহ করে। তাহারই গর্ভে মীর মাওনের এক পুত্র জন্মে, পুত্রটি ছিল হাবা। মার্তাজা

এই হাবার পুত্র। দীর্ঘাকৃতি না হইলেও মার্তাজার চেহারা বেশ সুন্দর ও চাল-চলনও খুবই কর্মতৎপরতাপূর্ণ ছিল।

অল্প বয়সেই মার্তাজা কলিকাতার গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান সার্কাসে যোগদান করেন এবং সার্কাসের দলের সঙ্গেই ভারতের বিভিন্ন স্থান ও তাহার পরে আমেরিকা, চীন, জাপান প্রভৃতি স্থান ঘুরিয়া আসেন। সার্কাসের দলের সঙ্গে আমেরিকা থাকা কালেই মার্তাজা সেখানে নানারূপ ইন্দ্রজাল শিক্ষা করেন, কথ্য ইংরাজী বলিতে শিখেন। মার্তাজার আসল নাম কি তাহা জানা যায় নাই, সার্কাস পার্টিতে আসিয়া তিনি 'মার্তাজা' নাম গ্রহণ করেন।

আমেরিকা হইতে বোম্বাই সহরে ফিরিয়া আসিবার পর সার্কাস পার্টি ভাঙ্গিয়া যায় এবং মার্তাজা হায়দারাবাদ যাইয়া নিজাম ষ্টেটে বাজার সরকারের পদ লাভ করেন এবং তথায় একটি বিবাহও করেন। এক স্বর্ণকারের দোকান হইতে রাজবাটীর নাম বলিয়া বহু টাকার অলঙ্কার আত্মসাৎ করিবার অপরাধে তাঁহাকে ১৪ মাসের কারাদণ্ড ভোগ করিতে হয়। ক্রমে পুনা জেলে স্থানান্তরিত হইবার পর মার্তাজার সহিত কারাগারের অভ্যন্তরেই কতিপয় ঠগী সম্প্রদায়ের কয়েদীর সহিত পরিচয় ও ক্রমে বন্ধুত্ব হয় এবং তাহাদের নিকট হইতেই মার্তাজা লাঠি, অসি, ছুরি প্রভৃতি শিক্ষা করেন। পরে জেল হইতে বাহির হইয়া ঐ সমস্ত ঠগী কয়েদী বন্ধুগণের নিকট হইতে প্রাপ্ত ঠিকানার সন্ধান করিতে করিতে রাজপুতানার অন্তর্গত আরাভেলী পর্বতের মধ্যস্থ ঠগীদের কোন এক গুপ্ত কেন্দ্রে যাইয়া তাহাদের নিকট আরও অনেক ক্রীড়া-কলা-কৌশল শিখিয়া আসেন। অবশেষে শ্রীরামপুরে আসিয়া বসবাস করিতে থাকেন। মার্তাজা বিভিন্ন স্থানে কয়েকটি 'নিকা' করিয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যায়।

লাঠিখেলা শিক্ষা দান

যাহা হউক, বারংবার শ্রীরামপুর যাতায়াত এবং ঢাকায় আসিয়া অনুশীলনের ফলে লাঠিখেলা শিক্ষা সম্পর্কে আমার আত্মবিশ্বাস জন্মিল। ক্রমেই আমার মনে এইরূপ ধারণা জন্মিতে লাগিল যে, আমি অপরকে শিক্ষাদানের মত যোগ্যতা অর্জন করিতে সমর্থ হইয়াছি। এই সময়ে আমি ঢাকা কলেজের লেবরেটরী এসিস্‌টেণ্ট ও ডিমন্‌ষ্ট্রেটারের পদে নিযুক্ত ছিলাম। তখন আমি ইলিসিয়ান মেসে থাকিতাম। আমার বন্ধু সুরেশ নাগ ও তাহার ভাই ভূপেশ নাগকে সম্মত করাইয়া সেই মেসের একটি কক্ষে তাহাদিগকে লাঠি, অসি প্রভৃতি খেলার কৌশল শিখাইতে লাগিলাম।

ইতিমধ্যে আমার প্রথমা পত্নীর পরলোকগমনের পর আমি দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিয়াছিলাম। এই সময়ে মা ও পত্নীকে আমি ঢাকা লইয়া আসিয়া আমার ছোট মামার বাসায় ছিলাম। আমার ছোটমামা ঢাকায় সাব্‌ইন্‌স্‌পেক্টর ছিলেন। মেস ছাড়িয়া ঐ বাসায় থাকিবার সময়ও লাঠিখেলা শিক্ষাদান ব্যাহত হয় নাই। ঐ বাসারই এক কোণে লাঠিখেলা শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলাম।

আমার এক পুরাতন বন্ধু গগন দাসকেও এই সময় পাইলাম এবং সেও আগ্রহভরে শিক্ষাগ্রহণে ব্রতী হইল। গগন দাস ক্রমে আশুতোষ দাশগুপ্ত, ক্ষীরোদ চক্রবর্ত্তী প্রমুখ কয়েকজন কলেজের ছাত্রকেও লাঠিখেলার আসরে লইয়া আসিল। ক্রমে আরও ছাত্র আসিয়া জুটিল। তখন মামার বাসা ছাড়িয়া উয়ারীতে নিজেই এক বাসা ভাড়া লইলাম এবং বাড়ীর প্রশস্ত আঙ্গিনায় ছাত্রগণকে শিক্ষা দিতে লাগিলাম।

পি, কে, রায় মহাশয় ঢাকা কলেজ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার সময় তাঁহার বিদায় সম্বর্ধনা সভায় তাঁহারই আদেশ মত ক্ষীরোদ চক্রবর্ত্তীকে সঙ্গে করিয়া লাঠিখেলা দেখাইয়াছিলাম। আমাদের খেলার কৌশল দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং আমাদিগকে আরও দক্ষতা অর্জনের নিমিত্ত অনুপ্রেরণা দিয়াছিলেন।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন

এই সময় বঙ্গ-ভঙ্গ-প্রতিবাদ আন্দোলন, বিলাতী বর্জন, পিকেটিং প্রভৃতি তীব্রভাবে আরম্ভ হইল এবং পিকেটিং ও সভা-সমিতিগুলিতে সুশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছাত্রগণের উপরই ন্যস্ত হইল। ছাত্রদের দ্বারা গঠিত স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর পরিচালক নিযুক্ত হইল আমার বন্ধু ভূপেশ নাগ ও শীতল বন্দ্যোপাধ্যায় নামে অপর একজন ছাত্র।

এই ঘটনার কিছুদিন আগে আমি ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদের জন্য এক আবেদন করিয়াছিলাম। সে সময় পদ প্রার্থীদের প্রতিযোগিতা-মূলক পরীক্ষা ব্যবস্থা রদ করিয়া গভর্ণমেণ্ট এইরূপ নিয়ম করিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্টের প্রতি অনুগত, উচ্চ রাজ-কর্মচারীদের পরিবার হইতেই প্রার্থী মনোনয়ন করা হইবে। পদ-প্রার্থী আণ্ডার-গ্রাজুয়েট হইলেও চলিবে।

আমাদের বাড়ীর নাম ছিল ডেপুটী বাড়ী এবং পরিবারও রাজভক্ত পরিবার বলিয়াই পরিচিত ছিল—এতদ্ব্যতীত আমাদের বংশে ডেপুটী ও উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীও ছিলেন। তাহা ছাড়া পারিবারিক সম্বন্ধ বা বন্ধুত্বসূত্রে আমাদের বাড়ীর সহিত প্রায় অনেক উচ্চপদস্থ

রাজকর্মচারীর পরিচয় ছিল। তদুপরি ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যাপক রাজকুমার সেন ও কালীপদ বসু, বিজ্ঞানের অধ্যাপক বি, এন, দাস, ইংরাজীর খ্যাতনামা অধ্যাপক হরিনাথ দে এবং কলেজের ইংরাজ প্রিন্সিপাল মহাশয়ও আমাকে প্রশংসাপত্র সহ অনুমোদন করেন। বাবার বন্ধু ও সহপাঠী জাষ্টিস চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ও ঐ পদের অনুকূলে আমাকে প্রশংসাপত্র দিয়াছিলেন। কিন্তু যেদিন আমি আমার আবেদন পত্র কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করি, তাহার প্রায় দুই সপ্তাহ পরে আমার বন্ধু ভূপেশ নাগ আমাকে জানাইল যে, পিকেটিং-এর সময় ছাত্রগণের মধ্যে সুশৃঙ্খলা রক্ষার প্রয়োজনে এবং ঢাকার নবাবের প্ররোচনায় বিরুদ্ধবাদী মুসলমানগণ যাহাতে কোনরূপ গোলযোগ সৃষ্টি করিতে না পারে সেজন্য আমাকেও সঙ্গে থাকিতে হইবে। আমিও এক কথায়ই সম্মত হইলাম। কিন্তু এদিকে আমার সরকারী চাকুরী প্রার্থীরূপে যোগ্যতা সম্পর্কে গভর্ণমেণ্টের লোক তদন্ত করিতে আসিয়া জানিয়া গেল যে, আমি ঘোরতর 'স্বদেশী'। আমিও স্বদেশী আন্দোলনে এমনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম যে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ লাভ আমার আর হইল না।

কিছুকালব্যাপী ছাত্র ও স্বেচ্ছাসেবকগণের সঙ্গে কাজ করিবার ফলে তাহাদের মধ্যে আমার প্রভাব ক্রমেই বর্ধিত হইতে লাগিল। কোনও বিষয়ে সমস্যার উদ্ভব হইলেই ভূপেশ নাগ আমার উপদেশ অনুসারে কাজ করিত।

প্রথমে স্বদেশী আন্দোলনের সহিত কিছু কিছু মুসলমান ছাত্রও সংযুক্ত ছিল। তাহাদের সঙ্গে তর্ক-বিতর্ক হইত কিন্তু বিদেশী পণ্য বর্জন সম্বন্ধে শেষে আমাদের যুক্তি তাহারা মানিয়া লইত। ক্রমে নবাব বাড়ীর প্ররোচনায় ও ভীতি প্রদর্শনে মুসলমান ছাত্রগণ সরিয়া

পড়িল এবং সাধারণ মুসলমানগণ হিন্দু-বিরোধী মনোভাব পোষণ করিতে লাগিল। মুসলমানদের সহযোগিতার আশা আমরা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছিলাম, কিন্তু হেদায়েৎ মাষ্টার প্রমুখ কয়েকজন মহাপ্রাণ মুসলমান নবাব বাড়ীর ভয়ে ভীত না হইয়া এবং বিরুদ্ধবাদী মুসলমানগণের লাঞ্ছনা, গঞ্জনা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া বিভিন্ন সভা-সমিতিতে উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা দিয়া মুসলমানগণকে তাহাদের ভুল বুঝাইতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন এবং স্বদেশীব্রত গ্রহণ করিতে আহ্বান জানাইতে লাগিলেন।

এদিকে ঢাকার ব্যবসায়িগণও স্বদেশী আন্দোলনে গুরুতর বাধা জন্মাইল। কারণ তাহাদের বিপণিগুলি সমস্তই প্রায় বিদেশী-পণ্যে পূর্ণ ছিল এবং বিদেশীদ্রব্য বিক্রয় না হইলে তাহাদিগকেও বিশেষ আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে। কিন্তু সকলেই যখন শুনিল যে, ঢাকার বিখ্যাত কুটবুদ্ধিসম্পন্ন আইনজ্ঞ, ধনী আনন্দ রায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছেন, তখন ঢাকা সহরের প্রতাপশালী ব্যবসায়িগণও কিঞ্চিৎ বিহ্বল হইয়া পড়িল এবং সংকল্প ঘোষণা করিল যে, তাহারা আর বিদেশী-পণ্য আমদানী করিবে না। কিন্তু নিজেরা মতলব আঁটিল যে, যে-সব পণ্য দ্রব্য তাহাদের দোকানে বিক্রয়ার্থ মজুত আছে তাহা জাপানী মাল বলিয়া চালাইয়া দেওয়া হইবে।

আনন্দ রায় স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করায় অনেকেই বিস্মিত হইয়াছিল। কারণ তিনি এই সব আন্দোলনকে নিতান্ত ছেলেমানুষী বলিয়াই মনে করিতেন। আনন্দ রায় শুধু উকীলই ছিলেন না, তিনি একজন জমিদারও ছিলেন। বঙ্গ ভঙ্গ হইলে জমিদারী প্রথা তথা চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বিলুপ্ত হইবে এই আশঙ্কায় জমিদারগণ স্বদেশীতে যোগদান করেন। যাহা হউক, আনন্দ রায়ের মত একজন প্রভাবশালী

আইনজ্ঞকে নেতৃপদে পাইয়া স্বদেশী আন্দোলনের উদ্যোক্তাগণ আরও উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং আন্দোলনও ক্রমশঃ দানা বাধিতে লাগিল।

ঢাকা সহর তখন উত্তাল তরঙ্গ বিক্ষুব্ধ। কলিকাতা হইতে সুরেন্দ্র ব্যানার্জি, হেরম্ব মৈত্র, সুরেন্দ্র ব্যানার্জির জামাতা যোগেশ চৌধুরী, গজনবি প্রমুখ নেতাগণ ঢাকায় পদার্পণ করেন। বিপুলভাবে তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা জানান হয়; বহু জনতাপূর্ণ সমাবেশে তাঁহারাও উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা দিয়া জনতার করতালি ধ্বনি দ্বারা সম্বর্ধিত হন। সকল বক্তার মুখে একই কথা—"বঙ্গ-ভঙ্গ চাই না", "হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই", "ভাই ভাইকে ভিন্ন হইতে দিব না", "বিলাতী দ্রব্য ব্যবহার করিব না" ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সভা শেষে ছাত্রেরা গাড়ীর ঘোড়া খুলিয়া দিয়া সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নেতাদের গাড়ী জগন্নাথ কলেজ প্রাঙ্গন হইতে আনন্দ রায়ের বাড়ী পর্যন্ত নিজেরা টানিয়া লইয়া আসিল। উদ্দীপনা, উৎসাহ ও উদ্যমের বন্যা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল।

বীরাষ্টমী উৎসব

এদিকে পূজার ছুটী আসিয়া পড়িল। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রগণ স্থির করিল চাঁদা তুলিয়া তাহারা কলেজে পূজা করিবে এবং এবিষয়ে আমার উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পিত হইল। যথাসময়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের অনুমতি লইয়া কলেজ প্রাঙ্গনে পূজামণ্ডপ স্থাপিত হইল। ঢাকার সুবিখ্যাত কুস্তিগীর পরেশবাবু, সুরেশ ও ভুপেশ নাগকে সঙ্গে লইয়া আমি পূজার সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজন করিতে লাগিলাম। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পূজার পূর্বের দিন এক অপ্রত্যাশিত বিপদ দেখা দিল। কলেজের প্রিন্সিপাল তখন যিনি ছিলেন, তিনি নববিধানী ব্রাহ্ম এবং লর্ড সিংহের জামাতা। তিনি প্রচণ্ড আপত্তি তুলিলেন যে, কলেজ প্রাঙ্গনে যদি পূজা হয়, তাহা হইলে সেই মুহূর্তেই তিনি কলেজের সহিত সমস্ত সংশ্রব ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। কলেজের সত্বাধিকারী ভয় পাইয়া আমাদিগকে জানাইলেন যে, কলেজের প্রাঙ্গনে পূজা হইতে পারিবে না। আমাদের মাথায় যেন বজ্রাঘাত হইল। নিজেদের আয়োজিত পূজার উৎসাহে সকলেই প্রায় মাতোয়ারা, এমন সময় এহেন অবস্থার সৃষ্টি হইবে, কেহই তাহা ভাবিতে

পারে নাই। তাহা ছাড়া বোধন হইয়াছে ও ঘট বসান হইয়াছে, হিন্দুর রীতি ও সংস্কার মতে এই অবস্থায় স্থান পরিবর্তন অসম্ভব। অবশেষে আমরা যখন কলেজ প্রাঙ্গনে পূজার অনুকূলে আনন্দ রায় মহাশয়ের নিকট হইতে সুপারিশপত্র আনিলাম এবং স্থানীয় লোকজনও এই ঘটনায় বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল তখন প্রিন্সিপাল মহাশয় জানাইলেন যে, এবারের পূজা হউক, কিন্তু ভবিষ্যতে যেন জগন্নাথ কলেজের প্রাঙ্গনে কোনরূপ পূজা করিয়া পৌত্তলিকতার প্রশ্রয় না দেওয়া হয়।

আমাদের বুকের পাথর নামিয়া গেল। ছাত্রগণ বিপুল উৎসাহ ও আনন্দের মধ্য দিয়া পূজায় মাতিয়া উঠিল। অষ্টমীর দিন 'বীরাষ্টমী উৎসব' অনুষ্ঠিত হইল। আনন্দ রায়, অধ্যক্ষ কে, পি, বসু, হেদায়েৎ মাষ্টার প্রমুখ গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ আমাদের পূজা মণ্ডপে আসিয়া ছাত্রদের আনন্দ বর্ধন করেন। 'বীরাষ্টমী উৎসবে'র সভাপতিরূপে আমরা হেদায়েৎ মাষ্টারের নাম প্রস্তাব করিয়াছিলাম কিন্তু তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ডাক্তার পি, সি, সেনের নাম করাতে তাঁহাকেই সভাপতি করা হইল। ডাক্তার পি, সি, সেন ম্যাজিষ্ট্রেট বীরেন সেনের পিতা। বীরাষ্টমী উৎসবে কতিপয় স্বদেশী সঙ্গীত পরিবেষণ করা হইল; কবি হেমচন্দ্রের বিখ্যাত 'ভারত সঙ্গীত' কবিতাটি আবৃত্তি করা হইল; 'হাসিখুসী' পুস্তক হইতে সিংহ ও বীর শিশুর অভিনয় হইল; ভোজবাজী ও ভানুমতির খেলা কিছুই বাদ গেল না। অবশেষে বিভিন্ন কুস্তি ক্রীড়াও দেখান হইল। সুরেন্দ্র নাগ ও আমি লাঠি ও ছুরি খেলা দেখাইলাম। হেদায়েৎ মাষ্টার, আনন্দ রায়, পি, সি, সেন শক্তি উপাসনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করিয়া ভাষণ দিলেন। সকলের সহযোগিতায় উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইল। ঢাকায় বীরাষ্টমী উৎসব এই প্রথম।

অনুশীলন সমিতির সূত্রপাত

স্বদেশী আন্দোলনের ঢেউ এবং বীরাষ্টমী উৎসবের অনুপ্রেরণায় ঢাকার ছাত্রগণের মধ্যে বিশেষ জাগরণের ভাব দেখা দিল। বীরাষ্টমী উৎসব সম্পন্ন হইবার কিছুদিন পর ছাত্রগণের আহ্বানে প্রসিদ্ধ বক্তা বিপিন পাল মহাশয় ঢাকায় আগমন করেন। তৎকালে কলিকাতা হইতে ময়মনসিংহ যাইতে হইলে ঢাকা হইয়া যাইতে হইত। বিপিন পাল মহাশয় যে ট্রেনে ঢাকা আসিয়াছিলেন, দৈবক্রমে ব্যারিষ্টার পি, মিত্রও সেই একই ট্রেনে ঢাকা হইয়া ময়মনসিংহ যাইতেছিলেন। ছাত্রগণ কেহই পি, মিত্রকে চিনিত না ও তাহার সম্বন্ধে কিছুই জানিত না। কিন্তু বিপিন পালের নির্দেশে ছাত্রগণ পি, মিত্রকেও ঢাকায় নামিতে অনুরোধ জানাইল এবং বিপিন পাল নিজেও অনুরোধ করায় পি, মিত্র অবশেষে স্বীকৃত হইলেন।

মিটফোর্ড হাসপাতালের সম্মুখে একটি দোতলা বাড়ীতে তাহাদের জন্য বাসস্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। ঐ বাড়ীর নীচেই একটি পুলিশ ব্যারাক ছিল। সন্ধ্যার পরে বিপিন পাল এবং পি, মিত্রকে সঙ্গে লইয়া ছাত্রগণ 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি ও স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে গাহিতে

উক্ত নির্দিষ্ট বাসস্থানে যাইয়া উপস্থিত হইল। সেইখানে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করা হইল। সেই আলোচনার সময় কয়েকজন উকীল, যুবক ও ছাত্র উপস্থিত ছিল। আলোচনার মধ্যে হঠাৎ পি, মিত্র বলিয়া উঠিলেন, "এ সমস্ত স্বদেশী-ফদেশী, বিলাতী বর্জনে-ফর্জনে কিচ্ছুই হবে না, ক্ষমতা থাকে ত ইংরাজ তাড়াও, আর নয় ত মর।"

কয়েকজন উকীল দাঁড়াইয়া প্রতিবাদ করিয়া বলিল, "এ যে অসম্ভব।"

পি, মিত্রও উত্তেজিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন, আমরা এখন আর পিছু হটিতে পারি না। আমাদের তরবারী কোষমুক্ত হইয়াছে, এখন হয় শত্রুর অথবা নিজের বক্ষরক্তে ইহার পিপাসা মিটাইতে হইবে। আবেগ কম্পিত কণ্ঠে এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সময় পি, মিত্র বারকয়েক নিজের বক্ষেও করাঘাত করিলেন। উপস্থিত শ্রোতাদের মধ্যে কেহ কেহ ভয় পাইয়া 'আমরা ভাই এই সবের মধ্যে নাই' বলিয়া প্রস্থান করিল; আবার কেহ কেহ বা সভায় থাকিয়াই অনুচ্চকণ্ঠে একে অন্যের নিকট বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু কতিপয় যুবক ও ছাত্র পি, মিত্রের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হইল। পি, মিত্র অবশ্য সেই রাত্রিতেই ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন; তথায় সুহৃদ সমিতির আহ্বানে তাঁহার কর্মসূচী ছিল। কিন্তু তিনি যাত্রা করিবার পূর্বে কতিপয় ছাত্র ও যুবক তাঁহার সহিত গোপন আলোচনা সভায় মিলিত হয়। সেই সময়ে পি, মিত্রের আত্মীয় তারক দাস প্রমুখ কয়েকজন যুবক পূর্ববঙ্গে গোপনে বিপ্লববাদ প্রচার করিতেছিল। তাহারাও সেই গোপন আলোচনা সভায় যোগদান করিয়াছিল। অবশেষে স্থির হইল যে, ঢাকায় এমন একটি বিপ্লবী

দলের সৃষ্টি করিতে হইবে যেখানে সমস্ত যুবক বিনা বাক্যব্যয়ে এক নেতার অধীনে সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিতে পারে।

পি, মিত্র যে-রাত্রে ময়মনসিংহ চলিয়া যান, তাহার পরের দিন অপরাহ্নে সুবক্তা বিপিন পাল মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া ঢাকাবাসীগণ মুগ্ধ হইল। কতিপয় মুসলমান যুবকও বক্তৃতায় আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার সহিত ব্যক্তিগতভাবে সাক্ষাৎ করিতে আসে। ইতিমধ্যে পি, মিত্র ঢাকায় ফিরিয়া আসিয়াছিলেন এবং মুসলমান যুবকগণের সহিত বিপিন পাল মহাশয়ের সাক্ষাৎকারের সময় তিনিও তথায় উপস্থিত ছিলেন।

মুসলমান যুবকগণের বক্তব্য ছিল যে, হিন্দুগণ মুসলমানগণকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা করে—এই কারণে তাহারা হিন্দুদের সহিত একসঙ্গে কোন আন্দোলন করিতে পারিতেছে না। কিন্তু বিপিন পাল মহাশয়ের বক্তৃতা শুনিয়া তাহারা খুবই আশান্বিত হইয়াছে এবং মুসলমানগণের দাবী মিটিলেই তাহারা হিন্দুদের সহিত যোগ দিতে পারে।

পি, মিত্র বলিয়া উঠিলেন, 'ওসব দাবী-দাওয়ার কথা ছাড়িয়া দাও, তোমরা দেশের জন্য কি করিয়াছ? তোমরা হিন্দুগণের প্রতি অত্যাচার করিয়াছ, তাই হিন্দুগণও তোমাদিগকে উপেক্ষা ও অবজ্ঞা হয়ত দেখাইতেছে। তোমরা ভাবিয়া দেখিও, হিন্দুগণের যোগ্যতা আছে, কালে তাহারা স্বাধীন হইবেই—তোমরা যদি হিন্দুগণের বিরুদ্ধাচরণ কর, তাহা হইলে পরিণামে তোমরাই ঠকিবে।'

মুসলমান যুবকগণ কিঞ্চিৎ উষ্মা সহকারেই বলিল, 'বঙ্কিম সাহিত্যই বাংলাদেশে মুসলমান বিদ্বেষ প্রচার করিয়াছে।'

পি, মিত্র জবাব দিলেন, 'বঙ্কিম মুসলমান অত্যাচার সম্বন্ধে ও মুসলমানের বিরুদ্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা সমস্তই ঐতিহাসিক ঘটনা।

হিন্দুর প্রতি অত্যাচারের স্মৃতি বঙ্কিমচন্দ্রের প্রাণে বেদনার সঞ্চার করিয়াছিল তাই তিনি সত্য ঘটনা ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আর তোমরা তোমাদের স্বার্থের জন্যই তাঁহার সত্যভাষণের প্রতিবাদ জানাইতেছ।'

বলা বাহুল্য, পি, মিত্রের সহিত কথায় আঁটিয়া উঠিতে না পারিয়া মুসলমান যুবকগণ ক্রোধভরে স্থান ত্যাগ করিল।

সমিতি গঠন করিয়া এক নেতার অধীনে থাকিয়া বিনা প্রতিবাদে কর্তব্য পালনের যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে গ্রহণ করা হয়, সেই সম্পর্কে কর্মসূচী স্থির করিবার উদ্দেশ্যে ছাত্র ও যুবকগণ পি, মিত্র ও বিপিন পাল মহাশয়ের নিকট সমবেত হইয়াছিল। সেই সভায় নামজাদা উকীল আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সহ আরও কয়েকজন উকীল উপস্থিত ছিলেন। 'এক নেতার অধীনে থাকিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে তাঁহার আদেশ প্রতিপালন করিব'—এইরূপ প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হইতে প্রস্তুত প্রায় ৭১ জন ছাত্র ও যুবক সেই সভায় তাহাদের নাম ও ঠিকানা লিখিয়া দিল। ছাত্র ও যুবকগণের প্রস্তাবমতে আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় এই সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের মত ও আদর্শ প্রায় পি, মিত্রের অনুরূপ ছিল এবং এই কারণেই তরুণগণ আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের নাম প্রস্তাব করিয়াছিল। কিন্তু আনন্দ চক্রবর্ত্তী সভাপতি নির্বাচিত হওয়ায় অন্যান্য উকীলগণ রুষ্ট হইলেন। তাহাদের ক্ষোভ হইল যে, আনন্দ রায় প্রমুখ বড় বড় নেতা থাকিতে এইরূপ অপেক্ষাকৃত স্বল্পখ্যাত এক ব্যক্তিকে নির্বাচন করা হইল কেন?

বিপিন পাল মহাশয় ছাত্র ও যুবকগণকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিলেন, 'আনন্দ চক্রবর্ত্তী যদি কোন অন্যায় আদেশ দেন, তাহাও তোমরা পালন করিবে ত?'

উৎসাহ ও আবেগভরে ছাত্র ও যুবকগণ জবাব দিল, 'হ্যাঁ, করিব'।

পি, মিত্র ব্যাখ্যা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, 'অন্যায় আদেশ' অর্থ আপাতঃ দৃষ্টিতে যাহা অন্যায় মনে হইবে কিন্তু পরিণামে তাহাই শুভ হইবে, এমন আদেশই বুঝাইবে। তোমাদের নেতা কখনও তোমাদের কিম্বা তোমাদের দেশের অনিষ্ট কামনা করিতে পারেন না, এইরূপ বিশ্বাস তোমাদিগকে পোষণ করিতে হইবে।

আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ও ছাত্র ও যুবকগণকে তাহাদের কর্ত্তব্য সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল যে, সমিতির পরিচালক কে হইবে! যোগেন্দ্র নাগ ও নিশি চৌধুরী নামে দুইজন বলিষ্ঠ ও দীর্ঘাকৃতি যুবক আমার নাম প্রস্তাব করিল। এতক্ষণ আমি সেই সভায় একজন নির্বাক শ্রোতা হিসাবেই বসিয়াছিলাম এবং আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সহিতও আমার কোন পূর্বপরিচয় ছিল না। আমার দীন বেশ ও ক্ষীণ-দেহ দেখিয়া পি, মিত্র আমার নাম প্রস্তাব-কারী যুবকদ্বয়কে উদ্দেশ্য করিয়া নৈরাশ্যব্যঞ্জক কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, 'না, না এর মত লোক আমি চাই না; আমি চাই তোমাদের মত যুবক যে এক কথায় সকলকে বশীভূত করিতে পারিবে।'

নিশি ও যোগেন্দ্র উভয়েই জোরের সহিত বলিল, 'ইনি ভিন্ন আর কেহই তাহা পারিবেন না।'

পি, মিত্র তখন উপস্থিত অন্যান্য যুবকদের জিজ্ঞাসা করিয়া একই-রূপ জবাব পাইলেন। কিন্তু তথাপি তিনি দমিলেন না। নিশি ও যোগেন্দ্রকে তিনি বলিলেন, 'তোমাদের মধ্যে একজন পরিচালক হও।' পি, মিত্র যতবারই বলেন, ততবারই তাহারা আমার নাম প্রস্তাব করিতে লাগিল। অবশেষে পি, মিত্র নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও আমাকে সমিতির পরিচালক করিতে স্বীকৃত হইলেন।

আমি অসি ও ছোট লাঠির কৌশল শিক্ষা দেই এই কথা জানিতে পারিয়া পি, মিত্র মহাশয় একটু অবজ্ঞাভরেই বলিলেন যে, বড়লাঠি দ্বারা আক্রমণ করিলে ছোটলাঠি বা অসি উহা প্রতিরোধ করিতে সক্ষম হইবে না। আমি এই কথায় আপত্তি জানাইলাম। তিনি তাঁহার কথার সার্থকতা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত আমাকে বড়লাঠি লইয়া আক্রমণ করিলেন। আমি তাঁহার হাতলাঠিখানা লইয়াই আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অগ্রসর হইলাম এবং অবিলম্বেই তাঁহার আক্রমণ প্রতিহত করিলাম। তিনি বাহুতে কিঞ্চিৎ ব্যথা পাইলেন এবং আমার কথার যৌক্তিকতা মানিয়া লইলেন। এইভাবে তাঁহার পরীক্ষায় কৃতকার্য হইলাম। তৎপর প্রস্তাবিত সমিতির নামকরণ লইয়া আলোচনা চলিতে লাগিল। কেহ বলিল, বান্ধব সমিতি; কেহ বলিল, বন্দেমাতরম্ সমিতি ইত্যাদি, ইত্যাদি। পি, মিত্র মহাশয় পরিশেষে বলিলেন, 'আমি কলিকাতার সমিতির নাম দিয়াছি অনুশীলন সমিতি, তোমরাও এখানে এই নামই দাও। তবেই সমগ্র বঙ্গদেশ-ব্যাপী এক নামের ভিত্তিতে একটি বিরাট শক্তিশালী সমিতি গঠিত হইতে পারিবে।'

তিনি আরও বলিলেন, 'বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন প্রবন্ধ হইতে আমি এই নামটি গ্রহণ করিয়াছি—অনুশীলন শব্দের অর্থ চর্চা দ্বারা পরীক্ষা করিয়া দেখা, আমরাও চর্চা ও পরীক্ষা দ্বারা যেখানে যাহা ভাল পাইব তাহাই গ্রহণ করিব।'

যাহা হউক, পি, মিত্রের পরিকল্পিত অনুশীলন সমিতি নাম গ্রহণ করা হইল এবং তিনিই সমিতির সর্বাধ্যক্ষ হইলেন।

যেদিন সমিতি গঠিত হইল, সেইদিনই অপরাহ্নে বিপিন পাল ও পি, মিত্র নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতা করিলেন এবং তথা

হইতে উভয়েই ময়মনসিংহ চলিয়া গেলেন। দুইদিন পরে তাঁহাদের ঢাকা প্রত্যাবর্তনের কথা ছিল। তারক দাসও তাঁহাদের সঙ্গেই ময়মনসিংহ গিয়াছিল। কিন্তু একদিন পরেই রাত্রির ট্রেনে ময়মনসিংহ হইতে ফিরিয়া আসিয়া অতি প্রত্যুষে তারক দাস জানাইল, পি, মিত্র নির্দেশ দিয়াছেন যে, অদ্য দ্বিপ্রহরের ট্রেনে বিপিন পাল ঢাকা আসিবেন; কারণ পূর্ববঙ্গের নূতন লেফ্‌টেন্যান্ট গভর্ণর ফুলার সাহেবও আজই ঢাকা আসিতেছেন, তাই ফুলারকে উপেক্ষা করিয়া বিরাট শোভাযাত্রা সহ বিপিন পাল মহাশয়কে সম্বর্ধনা জানাইয়া নদীর তীরবর্তী রাস্তা দিয়া যাইতে হইবে এবং বহুজনাকীর্ণ এক সভারও ব্যবস্থা করিতে হইবে। ফুলার সাহেব যেন তাঁহার লঞ্চ হইতে এই সকল দৃশ্য দেখিতে পান, উহাই পি, মিত্রের উদ্দেশ্য।

মাত্র ৪।৫ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে এই বিরাট শোভাযাত্রা ও সভার ব্যবস্থা করা বড়ই কঠিন মনে হইলেও, মোটেই দমিয়া গেলাম না। সংবাদ পাইবামাত্রই ক্ষিপ্রতা সহকারে ছাত্র ও যুবক, যেখানেই যাহাকে পাইলাম, বলিয়া দিলাম, তাহারা যেন সর্বত্র প্রচার করে ও অপরকেও প্রচার করিতে বলিয়া দেয় যে, সমস্ত ছাত্র ও যুবকগণ আজ বেলা ১২টা হইতে ১টার মধ্যে যেন ষ্টেশনে যাইয়া সমবেত হয়। ইহার উদ্দেশ্যও তাঁহাদিগকে সংক্ষেপে বলিয়া দিলাম। তারক দাসকেও বলিয়া দিয়াছিলাম যে, সে যেন ষ্টেশনে যাইয়া আগে হইতেই হাজির থাকে এবং ছাত্র ও যুবকগণ ষ্টেশনে গেলে তাহাদের শ্রেণীবদ্ধভাবে সাজাইয়া এক এক শ্রেণীতে এক একজন নায়ক যেন ঠিক করিয়া দেয়।

যথাসময়ে ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়া দেখিতে পাইলাম যে, পূর্ব নির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুসারে তারক দাস সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছে।

তরুণেরা সকলেই বিরাট শোভাযাত্রায় যোগদান করিবার নিমিত্ত শ্রেণীবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান আছে এবং তাহাদের দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন উদ্বেলিত জনসমুদ্র সম্মুখে অগ্রসর হইবার নির্দেশপ্রাপ্তির প্রতীক্ষা করিতেছে মাত্র। কিন্তু এই সময়ে সহসা এক বিপর্যয়ের বার্তা আসিল। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল রসিক চক্রবর্ত্তী মহাশয় তথায় আসিয়া ঘোষণা করিলেন যে, শোভাযাত্রা ও বিপিন পালের অভ্যর্থনা বন্ধ করিবার জন্য এবং ছাত্র ও অন্যান্য তরুণগণ যেন নিঃশব্দে ভিন্ন ভিন্ন পথে সেই স্থান পরিত্যাগ করিয়া বাড়ী চলিয়া যায়—এই মর্মে আনন্দ রায় সংবাদ পাঠাইয়াছেন। কারণ হিসাবে তিনি বলিয়াছেন যে, আজ ফুলার সাহেব আসিবেন, তাই সভা, শোভাযাত্রা হইলে গোলযোগের সৃষ্টি হইতে পারে। এই কথা শুনিয়া আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় কর্তব্য বিষয়ে দ্বিধাগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, কিন্তু ললিত রায়, যোগেন্দ্র গুহঠাকুরতা প্রমুখ উকীলগণ ইহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইলেন। বলা বাহুল্য, ছাত্র ও যুবকগণও এইরূপ নিরুৎসাহব্যঞ্জক প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে বিপিন পাল মহাশয় আসিয়া পড়িলেন এবং রসিকবাবু তাঁহাকেও আনন্দ রায়ের প্রস্তাবের কথা জানাইলেন। অবশেষে বহু তর্ক-বিতর্কের পর স্থির হইল যে, শোভা-যাত্রা হইবে বটে কিন্তু ছাত্রগণ কোনরূপ ধ্বনি করিতে পারিবেনা এবং বিপিন পাল মহাশয়কে বক্তৃতা করিতে যাইবার পূর্বে আনন্দ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতে হইবে।

তাহাই হইল। বিপিন পাল মহাশয় গাড়ীতে উঠিলেন এবং ছাত্র ও যুবকগণ আমার নির্দেশক্রমে নিঃশব্দে ও সুশৃঙ্খলভাবে শোভাযাত্রা করিয়া সেই গাড়ী অনুসরণ করিল। প্রায় এক মাইলব্যাপী এইরূপ সঙ্ঘবদ্ধ শোভাযাত্রা একমাত্র জন্মাষ্টমীর মিছিল ব্যতীত ঢাকা সহরে

ইতিপূর্বে আর দেখা যায় নাই। শোভাযাত্রা ঢাকা সহরের কেন্দ্রস্থলে আসিয়া পৌঁছিলে রসিকবাবু বিপিন পালকে লইয়া আনন্দ রায়ের বাড়ী চলিয়া গেলেন এবং শোভাযাত্রা ক্রমশঃ ঐ একইরূপ সুশৃঙ্খল-ভাবে নদীর তীরে পূর্বনির্দিষ্ট সভামণ্ডপে যাইয়া উপস্থিত হইল। ইহার পূর্বেই ফুলার সাহেব আসিয়া সেই নদীবক্ষে অবস্থান করিতেছিলেন।

নির্দিষ্ট সময়ে বিপিন পাল মহাশয় সভামণ্ডপে উপস্থিত হইলেন। ইহার কিছুক্ষণ পরেই আনন্দ রায় এবং ঢাকা সহরের আরও গণ্যমান্য কয়েকজন ব্যক্তি সভায় আসিলেন। সভামণ্ডপ লোক সমাবেশে পরিপূর্ণ। কিন্তু এদিকে সভার কার্যক্রম আরম্ভ করা যাইতেছে না। কারণ, আনন্দ রায়ের মতের বিরুদ্ধে কেহই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। অবশেষে মালখানগরের অনন্ত বসু—যিনি কলিকাতায় উকীল ছিলেন, ঢাকার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে কিছু তিরস্কারবাণী বর্ষণ করিয়া বলিলেন, "আমি ঢাকা জেলার অধিবাসী, আমার প্রাণের স্পন্দন যেন ঢাকা, ঢাকা, ঢাকা শব্দে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তাই ঢাকার গৌরব রক্ষা করিবার জন্য রাজরোষের ভয় উপেক্ষা করিয়াও আজ আমি সভাপতির পদ গ্রহণ করিলাম।"

যাহা হউক, সভা শেষ পর্যন্ত সাফল্যমণ্ডিত হইল। কিন্তু ইতি-মধ্যেই আর এক সংবাদ আসিল যে, রংপুরে গভর্ণমেন্টের শিক্ষা-সংক্রান্ত একটি সার্কুলারের প্রতিবাদে তথাকার সরকারী বিদ্যালয়ের ছাত্রগণ বিদ্যালয় 'বয়কট' করিয়াছে, তথায় স্বদেশী বিদ্যালয়ও আরম্ভ হইয়াছে এবং এই আন্দোলনে কিছু কিছু মুসলমানও হিন্দুগণের সহিত যোগদান করিয়াছে—সুতরাং বিপিন পাল মহাশয়কে অবিলম্বে রংপুর যাইতে হইবে। এই স্থানে উল্লেখযোগ্য যে, অরবিন্দ ঘোষের জ্যেষ্ঠ

ভ্রাতা মনমোহন ঘোষ উত্তরবঙ্গের বিদ্যালয় সমূহের তৎকালীন পরিদর্শক ছিলেন এবং তিনিই ঐ সার্কুলার জারী করিয়াছিলেন।

বিপিন পাল মহাশয় রংপুর যাইবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। কিন্তু তিনি তাঁহার সহিত দেহরক্ষী স্বরূপ দুইজন লোক চাহিলেন। তারক দাস নিজেই একজন দেহরক্ষী হিসাবে তাহার নিজের নাম প্রস্তাব করিল এবং আনন্দ রায় প্রমুখ উকীলগণ আমাকেও বিপিন পালের দেহরক্ষী হিসাবে রংপুর যাইবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। আমিও যথাসম্ভব শীঘ্র বাসায় আসিয়া সামান্য কিছু আহার সারিলাম এবং যেখানে যেখানে আমি শিক্ষকতা করিতাম, তথায় অপর শিক্ষক নিযুক্ত করিয়া দিয়া বিপিন পাল মহাশয়ের সহিত যাত্রা করিলাম।

পরের দিন সকালে নারায়ণগঞ্জে ষ্টীমারে পি, মিত্র মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ হইল, তিনিও ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা ফিরিতে-ছিলেন। পি, মিত্র বলিলেন যে কলিকাতায় জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব চলিতেছে, সুতরাং বক্তৃতা ও আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে বিপিন পালকে রংপুর না যাইয়া কলিকাতায়ই যাইতে হইবে। তিনি নির্দেশ দিলেন যে, আমি ও তারক দাস রংপুরে যাইব এবং প্রয়োজনবোধ করিলে বিপিন পালকে রংপুর যাইবার জন্য টেলিগ্রাম করিব।

অবশেষে আমি ও তারক দাস রংপুর গেলাম। সেখানে যাইয়া শুনিলাম যে, পূর্বের দিন কলিকাতা হইতে উদীয়মান নবীন বক্তা শচীন্দ্র বসু আসিয়াছেন এবং জনসভায় বক্তৃতা করিয়া রংপুরবাসীদের মুগ্ধ করিয়াছেন। আরও শুনিতে পাইলাম যে, হিন্দুদের মধ্যে উত্তেজনা ও প্রেরণার অভাব নাই, তাই রংপুরের নেতাগণ বিপিন পাল অপেক্ষা তীব্র স্বদেশী-ভাবাপন্ন অপর কোন মুসলমান নেতার

বক্তৃতার জন্য আগ্রহশীল। কারণ, যদিও নেতাগণ বলিতেছেন যে, হিন্দু-মুসলমান এক সঙ্গে অগ্রসর না হইলে কিছুতেই দেশের কল্যাণ নাই, তথাপি রংপুরের অধিকাংশ মুসলমানই দ্বিধাগ্রস্ত। তাই টেলিগ্রাম করিয়া মুসলমান নেতা লিয়াকৎ হোসেনকে আনা হইল, তিনি হিন্দু-মুসলিম জনসমাবেশে বক্তৃতাও করিলেন, কিন্তু তথাকার মুসলমানগণ পূর্ববৎ দ্বিধাভাবাপন্ন হইয়াই থাকিল।

দুইদিন রংপুর থাকিয়া তারক দাসের সহিত যুবকগণের কয়েকটি গুপ্ত সমিতি পরিদর্শন করিয়া দেখিতে পাইলাম যে, তথায় স্থানীয় পদ্ধতিতে ছোট লাঠি ও অসি খেলার অনুশীলন চলিতেছে। তারক রংপুরেই থাকিল, আমি দুইদিন পর কলিকাতা চলিয়া গেলাম। রংপুরেই তারক দাসের সহিত শেষ সাক্ষাৎ। কারণ আমি আসিবার কিছুদিন পরে সেও কলিকাতা আসিয়াছিল, কিন্তু কলিকাতা হইতে গোপনে একেবারে সুদূর আমেরিকা চলিয়া যায়। এই সময়ে তারক দাস গেরুয়াধারী ব্রহ্মচারী বেশে ঘোরাফেরা করিত এবং নিরামিষাশীও হইয়াছিল।

দীক্ষা গ্রহণ

তারক দাসের নির্দেশ অনুসারে রংপুর হইতে কলিকাতা আসিয়া ৪৯ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থ কলিকাতা অনুশীলন সমিতির প্রধান কার্যালয়ের পরিচালক সতীশ বসুর অতিথি হইলাম। পরে পি, মিত্রের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি তখন ২০৯ নং লোয়ার সার্কুলার রোডের বাড়ীতে থাকিতেন। বাড়ীটি বর্তমান অন্ধবিদ্যালয়ের নিকটেই ছিল। বিপিন পাল মহাশয়ের সহিতও সাক্ষাৎ করিলাম এবং দেখিলাম তিনি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত আন্দোলন ও জনসভা সংক্রান্ত বক্তৃতাদি লইয়া খুবই ব্যস্ত আছেন।

ঢাকা অনুশীলন সমিতির পরিচালক হিসাবে আমাকে দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে স্থির হইলে পি, মিত্র মহাশয়ের নির্দেশ মত একদিন একবেলা হবিষ্যান্ন আহার করিয়া সংযম পালন করিলাম এবং পরদিন সকালে গঙ্গাস্নান করিয়া পি, মিত্রের বাড়ী গিয়া তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা লইলাম। ধূপ, দীপ, নৈবেদ্যাদি সকল উপচারে সাজাইয়া ছান্দগ্যোপনিষদ হইতে বৈদিক মন্ত্র পাঠ করিয়া পি, মিত্র যজ্ঞ সমাপন করিলেন। পরে আমি আলীঢ়াসনে বসিলাম, আমার মস্তকে গীতা

স্থাপিত হইল তাহার উপর অসি রাখিয়া উহা ধরিয়া পি, মিত্র আমার দক্ষিণে দণ্ডায়মান রহিলেন। আমি যজ্ঞাগ্নির সম্মুখে বসিয়া কাগজে লিখিত প্রতিজ্ঞাপত্র পাঠ করিয়া প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। পরে সম্মুখস্থিত যজ্ঞাগ্নি ও পি, মিত্রকে নমস্কার করিলাম। ভগবান, অগ্নি, মাতা (মাতৃভূমি), গুরু এবং নেতাকে সম্মুখে রাখিয়া আমি এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, যথাসর্বস্ব উপেক্ষা করিয়াও সমিতির উন্নতির জন্য সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিব, কাহারও নিকট কিছু প্রকাশ করিব না এবং সমিতির যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে তাহাদের যথোচিত শাস্তির ব্যবস্থা করিব, যদি এই প্রতিজ্ঞাপালনে বিমুখ হই, তাহা হইলে ব্রাহ্মণগণের, মাতার (মাতৃভূমির) ও সর্বদেশের দেশভক্ত মহাপুরুষদের অভিসম্পাত আমাকে অচিরে ধ্বংস করিবে।

দীক্ষাগ্রহণের পরও আমি কলিকাতায় কিছুদিন রহিলাম এবং বিভিন্ন স্থান ঘুরিয়া লাঠি ও অসি খেলা সম্বন্ধে নূতন নূতন তথ্যাদি সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলাম। ইতিমধ্যে ঢাকা হইতে সংবাদ আসিল যে, গভর্ণমেণ্টের একটা সার্কুলারের প্রতিবাদে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রগণ একদিন নগ্নপদে স্কুলে যাওয়ায় প্রত্যেকেরই ছয়টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইয়াছে। এই অর্থদণ্ডের প্রতিবাদে ছাত্রগণ স্কুল হইতে বাহির হইয়া আসিয়াছে। এই সকল ছেলেদের পড়াশুনার জন্য আনন্দ চক্রবর্ত্তীর সাহায্যে একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে—সেই সংবাদও জানিতে পারিলাম।

এদিকে কলিকাতায়ও ছাত্র আন্দোলন এবং বিপিন পাল ও মোক্ষদা সমাধ্যায়ী প্রমুখ নেতাদের বক্তৃতার ফলে উড ষ্ট্রীটে তৎকালীন ল্যাণ্ড হোল্ডারস্ এসোসিয়েশন গৃহে টি, পালিত ও অন্যান্য কয়েকজনের উপস্থিতিতে 'ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশন' প্রতিষ্ঠা করিবার

সংকল্প গ্রহণ করা হইল। আমি এই সংবাদ লইয়া ঢাকা আসিলাম। ঢাকার আন্দোলনকারীগণ দাবী জানাইতে লাগিল যে, ঢাকার সমস্ত স্কুল, কলেজগুলিকে জাতীয় বিদ্যালয়ে পরিণত করা হউক। অভি-ভাবকগণ ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন এবং ছাত্রগণও দিন কয়েক পরে অপেক্ষাকৃত শান্ত হইল। অবশেষে কলেজিয়েট স্কুলের কয়েকজন কৃতী ছাত্র ব্যতীত প্রায় সকলেই জরিমানা দিয়া স্কুলে ফিরিয়া গেল।

অবশ্য জাতীয় বিদ্যালয়ের কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয় নাই। আনন্দ চক্রবর্তীর সহায়তায় ঢাকার তাঁতিবাজারের হোমিওপ্যাথী স্কুলের কর্তৃপক্ষের অনুমতিক্রমে তথায়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের কাজ আরম্ভ হইল। ২০।২৫ জন ছাত্র লইয়া জাতীয় বিদ্যালয় চলিতে লাগিল এবং বিভিন্ন স্থান হইতে—বিশেষতঃ তৎকালীন ল-ক্লাশ হইতে আমার বন্ধু-বান্ধবদের লইয়া আসিয়া শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিয়া দিতে লাগিলাম। কিছুদিন পরে আনন্দ চক্রবর্ত্তী কিছু টাকা সংগ্রহ করিলেন এবং জাতীয় বিদ্যালয় তাঁহার বাসার নিকটস্থ অপর একটি বাড়ীতে স্থানান্তরিত করা হইল।

কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিবার পূর্বে পি, মিত্র আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, অরবিন্দ ঘোষ বলিয়াছেন, তিলক প্রমুখ মারাঠী নেতাগণ প্রায় তিনশত মারাঠী যুবককে আমেরিকা হইতে যুদ্ধ পরি-চালনা বিদ্যায় সুশিক্ষিত করিয়া আনিয়াছেন এবং বোম্বাই প্রদেশে প্রায় দেড়লক্ষ সৈনিক সংগ্রহ করিয়াছেন। এই সময়ে বাংলা দেশও যদি উপযুক্তরূপে প্রস্তুত হইতে না পারে, তবে বাংলাকে মারাঠীর অধীন হইয়া থাকিতে হইবে। সুতরাং বাংলাদেশ হইতেও অন্ততঃ এক লক্ষ যোদ্ধা সংগ্রহ করিতেই হইবে। তাই তিনি আমাকে

নির্দেশ দিয়াছিলেন যে, ঢাকা জেলা হইতে আমাকে অন্ততঃ দশ সহস্র যুবক যোদ্ধা সংগ্রহ করিয়া দিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে ফিরিবার পূর্বে আমার প্রার্থনা অনুসারে পি, মিত্র আনন্দ চক্রবর্ত্তীর নামে একখানা চিঠি দিয়াছিলেন, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন যে, উক্তরূপ কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমাকে কর্মকর্তা (**Executive Commander**) নিযুক্ত করিলেন।

পি, মিত্রের চিঠি পাইয়া এবং আমার নিকট পি, মিত্রের বক্তব্য শুনিয়া আনন্দ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রথমতঃ স্তম্ভিত হইলেন। পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, এই জন্য কি কি করিতে হইবে। আমি বলিলাম যে, কতকগুলি স্থানে লাঠিখেলা শিক্ষা দিবার জন্য সমিতি স্থাপনের ব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজন মত তিনি সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন।

অনুশীলন সমিতির কার্যারম্ভ

এদিকে জাতীয় বিদ্যালয় পূর্ববৎ চলিতে লাগিল এবং লাঠিখেলার চর্চাও পুনরায় আরম্ভ করিলাম। একদিন আমি ছাত্রগণকে জানাইলাম যে, যাহারা অনুশীলন সমিতির সভ্য হইয়াছে, তাহারা যেন আমাদের বর্তমান কর্তব্য বিষয়ে আলোচনার উদ্দেশ্যে বিকালে আমার বাসায় সমবেত হয়। নির্দিষ্ট সময়ে মাত্র একজন ছাত্র আসিল। অথচ সমিতির প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষরকারী যুবক ও ছাত্রদের সংখ্যা ছিল প্রায় ৬০।৭০ জন। তাই প্রতিজ্ঞাপত্রে তাহাদের স্বাক্ষরিত নাম ও ঠিকানা দেখিয়া প্রায় প্রত্যেকেরই বাড়ী বাড়ী গেলাম ও সমিতির প্রয়োজন, প্রতিজ্ঞার গুরুত্ব ইত্যাদি বুঝাইয়া বলিলাম এবং এইভাবে বারংবার বুঝাইয়া কয়েকদিন পর পুনরায় সভা আহ্বান করিলাম। সেইদিন সভায় ৩৫।৩৬ জন ছাত্র উপস্থিত হইল। আলাপ-আলোচনার পর স্থির হইল যে, তাহাদের প্রত্যেকেই লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে আসিবে এবং খেলা শেষ হইলেই সকলে একত্র সমবেত হইয়া মাতৃভূমির সেবা সম্পর্কে আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিবে। এই ভাবে প্রত্যহ স্কুল-কলেজ ছুটী হইবার পর সমিতির কার্য চলিতে লাগিল। ক্রমে

কতকগুলি প্রতিজ্ঞার সূত্র রচনা করিয়া সকলকে শুনাইলাম এবং কাহারও কোনরূপ আপত্তি থাকিলে তাহা জানাইতে বলিলাম। কেহ কেহ কিছু কিছু মন্তব্য করিল। ঐ সকল মন্তব্য ও দৈনন্দিন অবস্থার ভিত্তিতে প্রতিজ্ঞা পত্রের মধ্যে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিয়া প্রতিজ্ঞা পত্রটিকে ১২টি ধারাবিশিষ্ট একটি স্থায়ী রূপ দেওয়া হইল। প্রতিজ্ঞাপত্রের সারমর্ম হইল যে, আমি কখনও সমিতির কার্যপ্রণালী বা নীতির বিরুদ্ধাচরণ করিব না, কেহ ঐরূপ করিলে তাহাকে সংশোধিত করিতে চেষ্টা করিব; নেতার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে প্রতিপালন করিব; কেহ সমিতির অনিষ্ট করিতে চাহিতেছে তাহা জানিতে পারিলে তাহা প্রতিরোধ করিব ও কর্তৃপক্ষের গোচরে আনিব; সমিতির আভ্যন্তরীণ কোন বিষয় বাহিরে কাহারও নিকট প্রকাশ করিব না; কোন কার্যই অপমানজনক মনে করিব না এবং লোকনিন্দার ভয়ে কর্তব্য পথ হইতে বিচলিত হইব না; চরিত্র পবিত্র রাখিব; এবং শরীর ও মন দৃঢ় রাখিবার নিমিত্ত সর্বদাই সর্বরূপে যত্নবান থাকিব; একে অন্যকে বিপদ-আপদ হইতে রক্ষা করিব ও ঐক্যসূত্রে আবদ্ধ থাকিয়া দেশ ও জাতির কল্যাণের নিমিত্ত বদ্ধপরিকর থাকিব; সমিতি হইতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কোন বিষয়ই—যাহারা সমিতির প্রতি অনুগত নহে, তাহাদের শিক্ষা দিব না, ইত্যাদি···

প্রতিদিনই লাঠিখেলার পর এই প্রতিজ্ঞাগুলির গুরুত্ব ও প্রয়োজন সকলকে বুঝাইয়া দেওয়া হইত এবং যাহাতে সকলেই এই প্রতিজ্ঞার প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয় সেই দিকে সবিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত।

এদিকে জাতীয় বিদ্যালয় এবং অপরদিকে অনুশীলন সমিতি এই দুইটিই এখন হইতে আমার জীবনের প্রধান কর্ম বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ক্রমে কতিপয় ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদার জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়ায় কিছু কিছু অর্থ সাহায্যও পাওয়া যাইতে লাগিল এবং বেতন দিয়া শিক্ষক নিয়োগ করা সম্ভব হইল। সঙ্গে সঙ্গে সহরের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া, আলোচনা ও বিভিন্ন যুক্তি প্রদর্শন করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ের জন্য ছাত্র সংগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। ক্রমে ঢাকার প্রায় প্রত্যেক ছাত্রাবাসেই সমিতির এক একটি শাখা স্থাপিত হইল। এমনকি যে-সকল ছাত্রাবাসের মধ্যে প্রশস্ত আঙ্গিনার অভাব ছিল, সেই সব স্থানে ছাদের উপরে লাঠি খেলা হইত। উয়ারীতে তখন আমার বাসা ছিল এবং ঐ স্থানেই সমিতির প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। মাঝে মাঝে পুরাতন কোন এক ছাত্রের উপর প্রধান কেন্দ্রের ভার অর্পণ করিয়া আমি নিজে শাখা সমিতিগুলির কার্যকলাপ পরিদর্শন করিয়া আসিতাম। যে যে স্থানে ছাত্র সংখ্যা অধিক হইত, তথায় একজন প্রধান পরিচালকের এক

কিম্বা একাধিক সহকারীও নিযুক্ত করিতাম। কোন কোন বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনেও এক একটি শাখা সমিতি স্থাপিত হইয়াছিল। প্রায় বিদ্যালয়েরই প্রধান শিক্ষক ও শিক্ষকগণ সমিতির প্রতি সহানুভূতি-সম্পন্ন ছিলেন। এইভাবে সমিতির ক্রিয়া-কলাপ ক্রমশঃ অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময় সমিতির একদল কলেজের ছাত্র স্বতঃ-প্রবৃত্ত হইয়া ঐ সমিতির অভ্যন্তরেই একটি সেবা-সমিতি গঠনের প্রস্তাব করিল। আমিও আগ্রহ সহকারে একজন কলেজের ছাত্রের উপরেই ঐ সেবাসমিতি পরিচালনার ভার অর্পণ করিলাম। রোগীর শুশ্রূষা, শবদাহ, অগ্নিদাহ হইতে গৃহরক্ষা প্রভৃতি সেবাসমিতির কার্যবিধির অন্তর্ভুক্ত হইল। এই সেবাসমিতির কার্য ক্ষুদ্রভাবে আরম্ভ হইলেও ক্রমশঃ ইহার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পাইল এবং কলেরা প্রভৃতি ভয়াবহ রোগে ঢাকাবাসিগণ সর্বদা আমাদের এই সেবাসমিতিরই শরণাপন্ন হইত। এমনকি ধনীব্যক্তিদের দাস-দাসী বা অন্ত্যজ জাতির লোকদের শবদাহও সমিতির সভ্যগণ করিত। কিন্তু এই বিষয়ে আনন্দ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য নিষ্ঠাবান হিন্দুগণ আপত্তি জানাইলে আমি নিয়ম করিয়া দিলাম যে, যে-সকল তরুণ শবদাহ ও রোগীর পরিচর্যা বিষয়ে কোনরূপ দ্বিধাবোধ করিবে না কেবলমাত্র তাহাদিগকেই সেবাসমিতির সভ্য তালিকাভুক্ত করা হইবে। কিছুদিন পরে অবশ্য সেবাসমিতির অক্লান্ত ও আন্তরিক কর্মে উৎসাহিত হইয়া তরুণদের মধ্যে কাহারও কোনও কার্যেই আপত্তি দেখা যাইত না।

ইতিমধ্যে কোনও মোকদ্দমা শেষ করিয়া ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা যাওয়ার পথে পি, মিত্র ঢাকায় ১৫নং পাটুয়াটুলীতে নবীন উকীলদের স্থাপিত 'দরিদ্র-সমিতি'তে অবস্থান করিতেছিলেন এবং আমাকে তথায় ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সমিতির কাজ কতদূর

অগ্রসর হইয়াছে, উহা তাঁহাকে দেখাইতে হইবে। সহসা এই আদেশ পাইলেও আমি যথাসম্ভব ক্ষিপ্রতার সহিত বিভিন্ন শাখা সমিতিগুলিতে সংবাদ পাঠাইলাম এবং নির্দিষ্ট সময়ে সকলে একত্র হইয়া ড্রিল, আক্রমণ প্রতিরোধ, সমস্তই প্রদর্শন করিলাম। অল্প সময়ের মধ্যে শিক্ষার অগ্রগতি দেখিয়া তিনি মুগ্ধ হইলেন এবং মন্তব্য করিলেন, 'পুলিন অদ্ভুত কর্ম সম্পাদন করিয়াছে। মাত্র এক মাসের মধ্যে এতদূর অগ্রসর হওয়া বাস্তবিকই গৌরবের বিষয়।'

পি, মিত্র আরও বলিলেন, 'যাহারা অধিক কথা বলে কিম্বা বক্তৃতা দেয়, তাহাদের প্রকৃত কার্যশক্তি কমিয়া যায়।' এবং আমাকেও তিনি বলিয়াছিলেন যে, আমি যেন প্রকাশ্য সভায় কখনও বক্তৃতা না দেই।

এই সময় হইতেই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হইল। পি, মিত্র এতদিন নানা দায়িত্বভার অর্পণ করিলেও আমাকে বিশেষ সুনজরে দেখিতেন না এবং নির্ভর করিতেও পারিতেন না। কিন্তু এইবার স্বচক্ষে সমস্ত দেখিয়া ও আমার সমিতির সভ্যদের সহিত আলোচনা করিয়া আমার উপর হইতে তিনি বিরূপ ধারণা তুলিয়া লইলেন। এই ঘটনার পর প্রথম যখন আমি কলিকাতায় যাই তিনি আমার সহিত প্রাণখোলাভাবে আলোচনা করিয়াছিলেন এবং আমাকে বলিয়াছিলেন, 'এই সমস্ত সাংগঠনিক ব্যাপারে তোমার ভাল মাথা খোলে, এখন হইতে তাই সমিতির পরিচালনা ব্যবস্থা সম্বন্ধে তুমি যাহা ভাল মনে করিবে তাহাই করিবে। আমি তোমাকে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করিলাম—বিশেষ কোন কারণ না ঘটিলে আমার সহিত পরামর্শের কোনই প্রয়োজন নাই।'

ঢাকার আনন্দ চক্রবর্ত্তী সম্পর্কে আমার কিঞ্চিৎ আশঙ্কা ছিল।

কারণ, তিনি সতর্ক আইন ব্যবসায়ী, নিষ্ঠাবান গোঁড়া হিন্দু এবং বিপ্লবী পন্থাগুলি সমস্তই তিনি সমর্থন করিতেন না। তাই আমি পি, মিত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম, 'ঢাকার আনন্দ চক্রবর্ত্তীর সহিত যদি কখনও কোনও বিষয়ে মতদ্বৈধ হয়, তাহা হইলে কি করিব?'

পি, মিত্র জবাব দিলেন, 'এই অবস্থায় ঢাকার স্বামীজীর নির্দেশ মতই চলিও।'

যাহা হউক, পরে ঢাকা আসিয়া স্বামীজীর নিকট পি, মিত্রের কথা বলা মাত্রই তিনি জবাব দিলেন, 'এই সম্বন্ধে তুই কখনও আমাকে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবিনা। কখন কি করিতে হইবে, তাহা তুই আপন মনেই বুঝিতে পারিবি।'

স্বামীজী সম্বন্ধে বিভিন্ন অলৌকিক কথা প্রচলিত ছিল। কেহ কেহ বলিত যে, নানা সাহেব সন্দেহ বশে কোথায় একবার স্বামীজীকে বন্দী করা হইয়াছিল, কিন্তু উহা প্রমানিত হয় নাই বলিয়া মুক্ত হইয়াছেন। সিপাহী বিদ্রোহের বিবরণগুলি স্বামীজী এমন বিশদভাবে বর্ণনা করিতেন যে, শুনিলে মনে হইত তিনি যেন নিজে সমস্তই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ঢাকার বহু উচ্ছৃঙ্খল যুবক স্বামীজীর প্রভাবে সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছিল। আনন্দ রায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নৃপেন্দ্র রায় ঘোরতর উচ্ছৃঙ্খল ও নাস্তিক প্রকৃতির ছিলেন। স্বামীজীর প্রভাবে তিনি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন ও স্বেচ্ছাচার পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নিরামিষাশী হইয়াছিলেন।

স্বামীজী প্রথমে ঢাকা আসিয়া ইস্‌লামপুর পুলের নিকট এক ডাইল ব্যবসায়ী হিন্দুস্থানী ভদ্রলোকের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। লোকে তখন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করিয়া স্বামীজীকে 'ডাইলানন্দ স্বামী' বলিত। বহু নেপালী, হিন্দুস্থানী সিপাহী এবং পুলিশ স্বামীজীর ভক্ত ছিল। ঢাকার বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী একদিন কয়েকজন লোককে জানান যে, এই

স্বামীজী একজন শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ। একদিন স্বনামখ্যাত সন্ন্যাসী ভোলা-গিরি মহাশয় ঢাকার শ্রেষ্ঠ সরকারী উকীল ঈশ্বর ঘোষের সহিত গাড়ীতে যাইবার সময় পথে স্বামীজীকে দেখিতে পাইয়া গাড়ী হইতে নামিলেন এবং নমস্কার করিলেন। পরে ঈশ্বর ঘোষকে বলিলেন, 'এত বড় একজন মহাপুরুষকে তোমরা এরূপ অবজ্ঞাতভাবে রাখিয়াছ কেন?' ঈশ্বর ঘোষ আরও কয়েকজন ধনী ব্যবসায়ী ও জমিদারের প্রচেষ্টায় জমি সংগ্রহ করিলেন ও একটি মন্দির স্থাপন করিয়া স্বামীজীকে তথায় অবস্থান করিবার জন্য অনুরোধ জানাইলেন। স্বামীজীও সেই সময় হইতে তথায় বসবাস করিতে লাগিলেন এবং এই স্থানই 'স্বামীবাগ' বলিয়া নামাঙ্কিত হইল। তৎকালে ঢাকায় যে সকল নবীন ডেপুটি আসিতেন, তাহারা প্রায় সকলেই কালক্রমে স্বামীজীর ভক্ত হইতেন।

স্বামীজী কোনও দিন কোন প্রতিমাকে প্রণাম করিতেন না। কিন্তু শাক্ত, বৈষ্ণব প্রভৃতি বিভিন্ন ভক্তের জন্য বিভিন্ন প্রতিমা স্থাপন করিতেন, এমনকি হনুমানের মূর্তিও স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন যে, অধিকার-ভেদে বিভিন্ন লোকের বিভিন্ন রূপ প্রয়োজন আছে। জীব ও ব্রহ্ম, তথা আত্মা ও পরমাত্মা সম্বন্ধে বলিতেন যেমন, 'জল ও লহর'। দেবাসুর যুদ্ধ সম্বন্ধে বলিতেন যে, মানুষে মানুষেই যুদ্ধ হইত, তবে বহু পুরাকালে ঘটিয়াছিল বলিয়া এবং উপমা অলঙ্কার প্রভাবে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নরূপ বিকৃত বর্ণনা হইয়া গিয়াছে। দেব, দানব, অসুর, রাক্ষস প্রভৃতি তৎকালে বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতীয় মানুষ ছিল মাত্র। কালী, দুর্গা, হরি, বিষ্ণু, ব্রহ্মা, শিব প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন দেবতা নহেন—মানুষের আত্মাই সাধনা ও একাগ্র নিষ্ঠার ফলে কল্পনানুরূপ মূর্তি ধারণ করিয়া দেখা দেয়—'আমার আত্মা আমারই

অভীষ্ট রূপ ধারণ করিয়া আমাকে দেখা দেয় ও আমার কার্য সম্পাদন করে। যেমন জলের এক অংশ বরফ হইয়া জলেই ভাসিতে থাকে, সেইরূপ সাধনার ফল ব্যক্তিগতভাবে মানব আত্মারই এক অংশে অভীষ্ট রূপ ধারণ করে, অপর অংশে সত্যস্বরূপ উপলব্ধি করে। আত্মা সর্বদাই সৎ, চৈতন্যময় এবং আনন্দে পূর্ণ; সুতরাং সাধনা প্রভাবে মানব-আত্মার মধ্যে যে অভীষ্টানুরূপ পরমাত্মার উপলব্ধি হয়, তাহার সমস্ত বিকাশ-ই সত্যে পূর্ণ। সাধনাহীন মানবগণ মোহবশতঃ এই সমস্ত ঘটনাগুলিকে কখন বা অলৌকিক, কখন বা মিথ্যা কিম্বা কাল্পনিক মনে করিয়া থাকে'।

স্বামীজী বলিতেন, হিংসাই জগতের ধর্ম—অহিংসা পরম ধর্ম, ইহা বুদ্ধদেব বলেন নাই। বুদ্ধের পরবর্তী শিষ্যগণ বুদ্ধদেবের নামে এই বাক্য চালাইয়াছে।

যেদিন প্রথম স্বামীজীর অনুমতি লইয়া স্বামীবাগে প্রায় একশত ছাত্রকে ড্রিল করাইয়াছিলাম, সেদিন স্বামীজী আমাদের ক্রীড়ানুষ্ঠান দেখিয়া সন্তুষ্ট চিত্তে আমাদিগকে গরম লুচি খাইতে দিয়াছিলেন।

স্বামীজীর নাম পরে জানিতে পারিয়াছি, ত্রিপুরলিঙ্গ স্বামী। শুনিয়াছি ইনি ত্রৈলঙ্গ স্বামীর শিষ্য ছিলেন। স্বামীজীর নিকট যাতা-য়াতে অনেক সময়েই আমি অনেক ঘটনায় বিস্মিত হইয়াছি। কোনদিন হয়ত কোন বিশেষ বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে গেলাম, কিন্তু বলিতে সঙ্কোচ বোধ করিতেছি বা কি ভাবে বলিব তাহাই চিন্তা করিতেছি। স্বামীজী আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়া অপর কাহাকেও ডাকিয়া বাক্যালাপ আরম্ভ করিলেন। তিনি যে সকল প্রসঙ্গে কথা বলিলেন, ঐ সমস্ত প্রসঙ্গেই আমি তাঁহাকে প্রশ্ন করিতে আসিয়াছিলাম, অতএব কথা শেষ হইলে আমিও আমার জিজ্ঞাসার উত্তর পাইয়া মৌনভাবেই

ফিরিয়া আসিয়াছি। আমাকে আর কোন প্রশ্ন করিয়া জবাব জানিতে হয় নাই।

বাল্যকালে আমার বড়ই ভূতের ভয় ছিল, তরুণ বয়সেও সেই ভয় একেবারে দূরীভূত হয় নাই। একদিন সন্ধ্যায় স্বামীজীর সহিত আলোচনা করিতে করিতে অনেক রাত্রি হইয়া গেল। আমি এত রাত্রিতে জনমানব বিরল রাস্তায় একা কি করিয়া যাইব তাহাই ভাবিতেছিলাম। স্বামীজী বলিলেন, 'রাত্রি অধিক হইয়াছে, এখন যাও' বলিয়া দরজার নিকটবর্তী হইলেন এবং আমি দরজার বাহিরে আসিলে তিনি দরজা বন্ধ করিয়া দিলেন। অগত্যা ভয়ে ভয়ে আমাকে অগ্রসর হইতে হইল। কিন্তু বারংবার আমার পদদ্বয় যেন শিথিল হইয়া পড়িতেছিল। কতকদূর গেলেই মুসলমানদের কবরস্থান, তাহার পরেই সাহেবদের কবরস্থান। এই সময়ে কতকগুলি কুকুর আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া খেলা করিতে লাগিল এবং আমি যে পথে যাইব সেই পথে একটু একটু করিয়া অগ্রসর হয়, আবার আমার কাছে আসিয়া লেজ নাড়িতে থাকে। সহসা আমার মনে হইল, তাহা হইলে স্বামীজীই কি ইহাদের পাঠাইয়াছেন! এই কথা আমার মনে উদয় হওয়া মাত্রই কুকুরগুলি একে একে আমাকে পরিত্যাগ করিয়া বিপরীতমুখী হইয়া স্বামীবাগের দিকে চলিয়া গেল।

ইহার দিনকয়েক পরের ঘটনা। একদিন দ্বিপ্রহরে বিপিন পাল মহাশয় সহসা ঢাকা আসিলেন এবং বলিলেন সেইদিন বৈকালেই তিনি জনসভায় বক্তৃতা করিতে চাহেন। ঐ সময়ে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও বিপিন পালের মধ্যে নানারূপ বিরোধ চলিতেছিল এবং এই বিরোধ-হেতু সুরেন্দ্রনাথের মতের কোন কোন অংশের প্রতিবাদ করিতেই তিনি ঢাকা আসিয়াছিলেন। যাহা হউক, যথাসম্ভব শীঘ্র ব্যবস্থাদি

করিয়া বৈকালে স্বামীবাগে জনসভার আয়োজন করা হইল এবং লোকজনও সভায় উপস্থিত হইল। কিন্তু হঠাৎ অপ্রত্যাশিতভাবে প্রবল বৃষ্টি আরম্ভ হইল। কতক্ষণ পরেই বৃষ্টি থামিল বটে, কিন্তু আঙ্গিনা কর্দমময় হইয়া রহিল। কতক অংশে কিছু পাতিয়া না দিলে সভার কাজ আরম্ভ করা সম্ভব হইবে না। আমি কিংকর্তব্য ভাবিয়া স্বামীজীর নিকট গেলাম। তিনি তখন একখানা চারপায়ার উপর বিছানা করিয়া অর্ধশায়িত অবস্থায় ছিলেন এবং কয়েকজন ব্যক্তি তাঁহার সহিত আলোচনা করিতেছিলেন। সেই অবস্থায়ই স্বামীজীকে সব কথা জানাইলাম। তিনি বেশ সহজ নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলিলেন, 'আচ্ছা আমি কম্বল দিতেছি, তাহাই পাতিয়া দে।' তখনই তিনি বিছানা হইতে দাঁড়াইয়া বিছানায় চাদর সরাইয়া এক একখানা লাল কম্বল তুলিয়া দিতে লাগিলেন। আমি এক একজন যুবককে প্রায় ১০।১২ খানা করিয়া কম্বল দিয়া পাঠাইয়া দিলাম, তাহারা জনসভার আঙ্গিনায় যাইয়া তাহা বিছাইয়া দিতে লাগিল। এইরূপে ৬০।৭০ খানা কম্বল বাহির করিয়া দিয়া তিনি বলিলেন, 'আরও চাই?' যুবকগণ বলিল, 'না আর চাই না।'

আমরা দেখিলাম যে, চারপায়ার উপর আরও কিছু লাল কম্বল অবশিষ্ট রহিয়াছে। স্বামীজী তদুপরি চাদর বিছাইয়া শুইয়া পড়িলেন। স্বামীজীর শয্যা-রচনা বহুদিনই দেখিয়াছি—যেমন সাধারণতঃ থাকে, পাটির উপরে তোষক, তদুপরি চাদর ও বালিশ। কিন্তু সহসা আমাদের প্রয়োজনের সময় তাঁহার বিছানা হইতে এতগুলি কম্বল কি করিয়া বাহির হইল এই রহস্যের কোন কিনারা করিতে পারিলাম না।

স্বামীজীর সহিত কথাপ্রসঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার কথা উঠিলে

তিনি একদিন বলিলেন, 'ইংরেজের সহিত তোদের কোন যুদ্ধই হইবে না, ইংরাজের হাত হইতে কোন অসভ্য জাতি রাজত্ব লইবে, তাহাদের হাত হইতে তোদের হাতে আসিবে।'

কৌতূহলবশতঃ প্রশ্ন করিয়াছিলাম, 'কোন্ অসভ্য জাতি?'

তিনি প্রথমে জবাব দিতে চাহিলেন না। পরে বলিলেন, 'চীন নয়, জাপান নয়, পাঠান নয়, বর্মী নয়, গুর্খা নয়।'

আমি অধীর ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলাম, 'তবে কে?'

তিনি বলিলেন, 'বাহিরের কেহ নহে, দেশের ভিতরেই তাহারা আছে। যাহারা নাস্তিক তাহারাই অসভ্য, যাহারা বেদ মানে না তাহারাই নাস্তিক। বেদ অর্থে নিত্যজ্ঞান। যাহারা বিশ্বাস করে একরূপ, প্রকৃতি ও প্রবৃত্তির তাড়নায় কার্য করে অন্যরূপ, তাহারাই নাস্তিক, তাহারাই অসভ্য।'

তিনি আরও বলিতেন, 'ভারতের স্বাধীনতা আরম্ভ করিবে নাস্তিকগণ, সম্পন্ন করিবে আস্তিকগণ।'

১৯২৭ সালে স্বামীজী দেহরক্ষা করেন। ইহার পূর্বে স্বামী নরেশানন্দ সরস্বতীজীকে তিনি দীক্ষা দেন। কাশীধামে স্বামী নরেশানন্দজীর সবিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল। তাঁহার নিকট হইতেই আমি ও আমার পত্নী দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলাম।

কলিকাতায় শিবাজী উৎসব ও তিলকের আগমন

এই সময়ে একদিন কলিকাতা হইতে পি. মিত্র, বিপিন পাল ও আরও কয়েকজন প্রভাবশালী নেতৃবর্গের চিঠি পাইলাম। তাঁহারা লিখিয়াছেন যে, কলিকাতায় শিবাজী উৎসব হইবে এবং সেই উপলক্ষে মারাঠী নেতা তিলক, খাপাড্‌ডে, ডাঃ মুঞ্জী কলিকাতায় আসিবেন। বিভিন্ন জেলা হইতে বিভিন্ন কর্মিগণকেও এই উপলক্ষে আহ্বান জানান হইয়াছে। ঢাকা হইতে আনন্দ চক্রবর্ত্তী ও প্রকাশ পাকড়াশী এই সময়ে কলিকাতা আসিলেন।

কলিকাতা শিবনারায়ণ দাসের গলিতে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে শক্তিমূর্ত্তির সম্মুখে পূজায় রত শিবাজীর মূর্ত্তি স্থাপিত হইল। ঐ বাড়ীরই এক অংশে তিলক প্রমুখ নেতৃবর্গের বাসস্থান নির্দিষ্ট হইল। তৎকালে ঐ বাড়ীটির সংলগ্ন একটি বিরাট ময়দান ছিল। সেই ময়দানে স্বদেশী মেলা বসিল এবং ঐস্থানে কৃষ্ণনগরের পুতুল নাচ প্রভৃতি আমোদ-আহ্লাদের ব্যবস্থা করা হইল। অপর দিকে বক্তৃতা ও লাঠিখেলার জন্যও স্থান নির্দিষ্ট ছিল। সেই স্থানে শ্যামসুন্দর চক্রবর্ত্তী ইংরাজ বিতাড়ন সম্পর্কে জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিয়াছিলেন।

তিলক প্রকাশ্যে অধিক কথা বলেন নাই। কিন্তু খাপাড্‌ডে

তাঁহার ঘরে বসিয়া যুবকগণকে প্রকাশ্যেই বলিলেন, 'শুধু বিলাতী দ্রব্য তাড়াইলেই চলিবে না, সেই সঙ্গে ইংরাজকেও তাড়াইতে হইবে।'

এই সময়েই জানিতে পারিলাম যে, বিপিন পাল, সুবোধ মল্লিক, পি, মিত্র, সি, আর দাস, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতির সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি ও তাঁহার অনুগত ভক্তদের গুরুতর মতভেদ চলিতেছে।

একদিন তিলক, খাপাড়্ডে ও মুঞ্জী পি, মিত্রের বাড়ীতে এক গোপন আলোচনা বৈঠকে মিলিত হইয়াছিলেন এবং আমি তখন সেই আলোচনাগৃহের দ্বাররক্ষক হিসাবে ছিলাম। আলোচনা সম্পন্ন করিয়া বাহিরে আসিবার সময় তিলক প্রভৃতির সহিত পি, মিত্র আমার পরিচয় করাইয়া দিয়াছিলেন। 'দেশের কথা' পুস্তকের রচয়িতা সখারাম গণেশ দেউস্করের সহিতও সেই সময় আমার পরিচয় হয়।

শিবাজী উৎসবে তিলকের বক্তব্য ছিল যে, ভারতের হিন্দুগণকে এক জাতিতে পরিণত করিতে হইলে প্রথমতঃ সর্বত্র দেবনাগরী অক্ষর প্রচলন করিতে হইবে এবং সংস্কৃত ভাষার ভিত্তিতে বিভিন্ন প্রদেশের হিন্দুগণের বিভিন্ন ভাষাকে মিলিত করিয়া একটি জাতীয় ভাষার সৃষ্টি করিতে হইবে।

তিলক প্রভৃতির উৎসব অন্তে কলিকাতা পরিত্যাগ করিবার পর অনুশীলন সমিতির সাংগঠনিক নিয়ম-প্রণালী সম্পর্কে আলোচনা চলিতে লাগিল এবং প্রধানতঃ বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষ ভিন্ন ভিন্ন দুইটি পদ্ধতি উত্থাপন করিলেন। বিপিন পালের পদ্ধতিটি আংশিকভাবে ইংলণ্ডের পার্লামেন্টের পদ্ধতির অনুরূপ এবং অরবিন্দ ঘোষের পদ্ধতির মধ্যে কিছু কিছু বিপ্লবী ভাব ছিল। কিন্তু বিভিন্নরূপ দলাদলির ফলে শেষ পর্যন্ত বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে কোনরূপ মীমাংসাই সম্ভব হইল না। কলিকাতায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে

যে ঘোরতর দলাদলি চলিতেছে এই সময়ে তাহা ভালরূপেই উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

একদিন পি, মিত্র কলিকাতার অনুশীলন সমিতির সতীশ বসু, প্রমোদ সেন প্রমুখ কতিপয় প্রধান কর্মিদের আহ্বান করিয়া আমার সম্মুখে সমিতি পরিচালনা সম্পর্কে আলোচনা করিলেন। সমিতির অর্থভাণ্ডার পরিপুষ্ট করিতে হইলে ডাকাতি করিতে হইবে তাহাও ঐ আলোচনায় স্থির হইল।

আমি ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম ও গোপনে অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহে মনোনিবেশ করিলাম এবং ডাকাতি করিতে প্রস্তুত এই প্রকার একদল সাহসী যুবক-সভ্য সংগ্রহেরও চেষ্টা করিতে লাগিলাম। স্বাধীনতা-আন্দোলন পরিচালনার প্রয়োজনে ডাকাতি যে অপকর্ম নহে, এই কথা তাহাদের বুঝাইতে লাগিলাম। মহাভারতের 'আপদ্ধর্ম' অধ্যায় হইতে যুক্তি দেখাইলাম, 'আপদ্ কালে সত্যও মিথ্যা হয়, মিথ্যাও সত্য হয়। দুর্বৃত্ত দস্যুর হস্ত হইতে সাধু ব্যক্তির নিমিত্ত অনেক সময়ে মিথ্যা বলিলেও সত্য বলার পুণ্য সঞ্চয় হয়।' তাহা ছাড়া বিভিন্ন ইতিহাস হইতে উল্লেখ করিয়া দেখাইলাম যে, শিবাজী, গুরুগোবিন্দ সিংহ, প্রতাপ সিংহ, ইতালীর গ্যারিবল্ডী প্রভৃতি প্রত্যেকেই স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টায় প্রথমে অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজনে ডাকাতি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সমিতির কোন কোন তরুণ ডাকাতির নাম শুনিয়া ভয়ে জড়সড় হইয়া পড়িল। কেহ বা বলিল যে, সমিতির অন্যান্য সমস্ত বিষয়েই আপনার আদেশ বিনা বাক্যব্যয়ে পালন করিব, কিন্তু ডাকাতি করিতে বিবেকে বড় লাগে। আবার কেহ কেহ ডাকাতির নাম শুনিয়া একেবারে আনন্দে অধীর হইয়া পড়িল এবং কবে

হইতে ঐ কার্য আরম্ভ হইবে তাহার জন্য বিশেষ ব্যস্ত হইয়া উঠিল।

ঢাকায় কয়েকজন রাজপুত মিস্ত্রী সাহেবদের বন্দুক, রিভলবার প্রভৃতি মেরামতের কাজ করিত। দুই একটি উৎসাহী যুবক তাহাদের সন্ধান দিলে, ঐ যুবকদিগকে মিস্ত্রীদের নিকট হইতে বিভিন্নরূপ আগ্নেয়াস্ত্র মেরামতের কার্য ও সংযোজন প্রক্রিয়া শিক্ষা করিতে নিযুক্ত করিলাম।

ঢাকা গেণ্ডারিয়াতে খাল ও নদীর সংযোগ স্থলে গভর্ণমেণ্টের একটি তথাকথিত দুর্গ ছিল। কৌশলে তথাকার দুই একটি সিপাহীর সহিত আমার অতিবিশ্বাসী একটি যুবকের বন্ধুত্ব হইল। ঐ সিপাহীর সহিত অপর একজন সিপাহীর শত্রুতা ছিল এবং তাহাকে অপদস্থ করিবার উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত সিপাহীটি তাহার বন্দুক কার্টিজ প্রভৃতি চুরি করিয়া নদীর মধ্যে ডুবাইয়া রাখিত, আমার বিশ্বাসী যুবকটি নির্দিষ্ট সময়ে নির্দিষ্ট স্থান হইতে উহা তুলিয়া লইয়া আসিত। কিন্তু এই ব্যাপার ধরা পড়িবার বিশেষ সম্ভাবনা আছে মনে করিয়া এই পদ্ধতিটি শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু উক্ত রাজপুত মিস্ত্রীদের নিকট সংবাদ লইয়া ঢাকার বিভিন্ন স্থান হইতে পুরাতন অস্ত্র-শস্ত্র, অসি, ভোজালী, কাটারী, বর্শা, রিভলবার ইত্যাদি ক্রয় করিতে লাগিলাম। ক্রমে আমার দুই একটি বিশ্বাসী ছাত্র কোনও ইউরোপীয়ান ফার্মে শিক্ষানবিশীর কার্য করিয়া অস্ত্র-শস্ত্রের বিভিন্ন অংশ প্রস্তুত ও সংযোজন (fitting) পদ্ধতি শিখিয়াছিল। অল্প সময়ে লোহার বড় বড় সিন্দুক ভাঙ্গিবার কৌশলও তাহারা শিখিয়াছিল। তাহা ছাড়া পুস্তকাদি সংগ্রহ করিয়া বিভিন্নরূপ বিস্ফোরক দ্রব্যের প্রস্তুত প্রণালীও আমি নিজে পড়িয়া ছাত্রদের দিয়া অনুশীলন করাইতাম।

এই ব্যাপারে অর্থের প্রয়োজন প্রচুর। যদিও মুষ্টি-ভিক্ষার প্রচলন করিয়া অর্থ-সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তথাপি উহা এমনই অকিঞ্চিৎকর ছিল যে, আমি গোপনে মায়ের বাক্স হইতে টাকা লইয়া যাইতাম এবং সময় সময় আমাদের ব্যাঙ্কের পাশ বই হইতেও টাকা তুলিয়া দিতাম।

এই সময়ে কলিকাতা হইতে পি, মিত্রের চিঠি পাইয়া কলিকাতা আসিলাম এবং জানিতে পারিলাম যে, কলিকাতায় গুপ্ত সমিতিগুলির এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। বিভিন্ন জেলা হইতে আগত প্রতিনিধি-মণ্ডলীর সম্মুখে অরবিন্দ ঘোষ বক্তৃতা করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে, দেশকে স্বাধীন করিতে হইলে গুপ্ত আন্দোলন চালাইতে হইবে এবং আন্দোলন চালাইতে হইলে অস্ত্র-শস্ত্র-গোলা-বারুদের প্রয়োজন। এবং এই জন্য কাজ করিতে গেলে প্রচুর অর্থেরও প্রয়োজন আছে, আর সেই অর্থ দেশের ধনী লোকেরা দিবেনা, সরকারী অর্থ-ই ডাকাতি করিয়া আনিতে হইবে। তিনি আরও বলেন যে, ডাকাতি করা যে নীতিগত-ভাবে অপরাধ উহা তিনি স্বীকার করেন; কিন্তু স্বদেশের বৃহত্তর স্বার্থের খাতিরে তাহা অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে না। সে সময়ে অরবিন্দ ঘোষ বাংলা বলিতে পারিতেন না, কাজেই প্রতিনিধিমণ্ডলীর সভায় তিনি ইংরাজীতেই ভাষণ দিয়াছিলেন।

অরবিন্দ ঘোষের বক্তৃতার পর রংপুরের একজন প্রতিনিধি প্রস্তাব করিলেন যে, ডাকাতি করিয়া যে সকল স্থান হইতে টাকা আনা হইবে তাহার একটা সঠিক হিসাব রাখিয়া দেওয়া হইবে এবং স্বাধীনতা লাভের পর ঐ সমস্ত ব্যক্তিদের টাকা ফিরাইয়া দেওয়া হইবে। প্রস্তাবটি অরবিন্দ ঘোষ সমর্থন করিলেন এবং এইরূপে শেষ পর্যন্ত ডাকাতি করার প্রস্তাবটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

ব্যারিষ্টার পি, মিত্র

ব্যারিষ্টার পি, মিত্র শুধু আমারই গুরু নহেন, রাজনৈতিক জীবন ও বৈপ্লবিক জীবনের প্রেরণা অনেক স্বদেশ ভক্তই তাঁহার নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। এমনকি. অনেকেই জানে না যে, স্বয়ং সি, আর দাশও এই বিষয়ে বহুলাংশে পি, মিত্রের নিকট ঋণী। এখানে পি, মিত্রের জীবন কথার কিছু চুম্বক পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি।

পি, মিত্রের সম্পূর্ণ নাম প্রমথ নাথ মিত্র, নৈহাটি গঙ্গার ধারে তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল। তাঁহার পিতার নাম বিপ্রদাস মিত্র, তিনি ওভারসিয়ার ছিলেন। হুগলী স্কুল হইতে পি, মিত্র এনট্রান্স পরীক্ষায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি উচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন এবং হুগলী কলেজ হইতে এফ, এ, পরীক্ষায় গণিতে প্রথম হইয়াছিলেন। তৎপর তিনি উচ্চশিক্ষা হেতু ইংলণ্ড গমন করেন। ইংলণ্ডে তিনি যে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হইয়াছিলেন, তথাকার সংস্কৃতের অধ্যাপক সংস্কৃত ভাষা, হিন্দু-ধর্ম, হিন্দুগণের পৌরাণিক আচার-ব্যবহারের খুবই প্রশংসা করিতেন। তিনি বলিতেন যে, সমগ্র পৃথিবীর মধ্যে একমাত্র সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত ব্যাকরণই বিশুদ্ধ বিজ্ঞানসম্মত।

ঐ অধ্যাপকের প্রভাবে কতিপয় ইউরোপীয় ও ভারতীয় ছাত্র মিলিত-ভাবে একটি সমিতি গঠন করিয়া বিভিন্ন ধর্মের—প্রধানতঃ খৃষ্ট-ধর্মের, বিভিন্ন দোষ-ত্রুটির বিষয়ে আলোচনা করিত। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করিত যে, বর্তমান হিন্দু-ধর্মের মধ্যে বহু কু-সংস্কার এবং কু-প্রথা প্রবেশ করিয়াছে বটে, কিন্তু বৈদিক মন্ত্রগুলিকে, বেদান্ত প্রভৃতি দর্শনসমূহকে, 'উপনিষদ', 'গীতা' প্রভৃতি আধ্যাত্মিক গ্রন্থনিচয়কে অভ্রান্ত ও অতি শ্রেষ্ঠ জ্ঞান-গবেষণার পরিচায়ক বলিয়া মনে করিত। এই পরিবেশে পি, মিত্রও একটি নূতন পদ্ধতির আবিষ্কার করিয়া পৌরাণিক হিন্দু আচার ব্যবহার এবং হিন্দু শাস্ত্র প্রভৃতির বিশুদ্ধতা, গণিতের সাহায্যে—বিশেষতঃ প্যারালেলোগ্রাম অব্ ফোর্সেস ও ট্রায়েঙ্গাল অব্ ফোর্সেস দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিতেন। পি, মিত্র বলিতেন যে, ঋষিগণ নিশ্চয়ই গণিতের বিশুদ্ধতার সহিত মিলাইয়া তাঁহাদের শাস্ত্র প্রভৃতি রচনা করেন নাই, কিন্তু গণিতও বিশুদ্ধ এবং হিন্দুশাস্ত্র প্রভৃতিও বিশুদ্ধ। সুতরাং বিশুদ্ধ বিষয় দ্বারা বিশুদ্ধ বিষয় পরীক্ষা করিলে প্রকৃত পক্ষে সামগ্রিক বিশুদ্ধতাই প্রকট হইয়া পড়ে।

পি, মিত্র একাধারে বহুগুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার ভাস্বর প্রতিভা কোন একটা বিশেষ বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকে নাই। তিনি বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, দর্শন, বিবিধ সংস্কৃত শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়াই ক্ষান্ত থাকেন নাই। বাংলা ও সংস্কৃত কাব্যাদিও পাঠ করিয়াছিলেন এবং একখানি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনায়ও হাত দিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ উহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

মাত্র ঊনবিংশ বৎসর বয়সে পি, মিত্র ব্যারিষ্টার হইয়া দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তৎকালে হিন্দু-সমাজের রীতি অনুসারে বিলাত প্রত্যাগত পি, মিত্রের পরিবারকেও সমাজচ্যুত হইতে হয় এবং

পি, মিত্রের পিতা নৈহাটী পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তৎকালে খৃষ্টধর্মের এক প্রবল বন্যা কলিকাতা সহরকে প্লাবিত করিয়া দিয়াছিল, খৃষ্টান মিশনারীগণ তীব্র বিক্রমে খৃষ্টধর্মের প্রচার কার্য চালাইতেছিলেন এবং তাহাদের বাক-চাতুর্যে আকৃষ্ট হইয়া বহু শিক্ষিত ব্যক্তিও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়।

সেই সময়ে ডিরোজিও নামে এক তরুণ ইউরোপীয়ান কলিকাতা আসিয়াছিলেন। তিনি কোন ধর্মই মানিতেন না। কিন্তু পৌত্তলিকতা ও হিন্দুধর্মের নিন্দাবাদ করিতেন এবং বাক্যপ্রয়োগে এমনই নিপুণ ছিলেন যে, তাহার প্রভাবে ডব্লিউ, সি, ব্যানার্জি; কে, সি, ব্যানার্জি; কে, এম, ব্যানার্জি; লাল বিহারী দে; মাইকেল মধুসূদন প্রমুখ বাংলার বহু কৃতী যুবক খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন। সে সময়ে রামমোহন রায়ের ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ফলে এই খৃষ্টানী মনোভাব কিঞ্চিৎ প্রশমিত হইলেও ঐ সকল তরুণদের মধ্যে ক্রমশঃই হিন্দু-বিরোধী ভাবধারা প্রকট হইতে লাগিল।

এদিকে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং বিশিষ্ট ধনী হিন্দুগণ বিচলিত হইয়া হিন্দু কলেজ স্থাপন করিলেন। ঐ হিন্দু কলেজই বর্তমানে প্রেসিডেন্সী কলেজ নামে পরিচিত। ঈশ্বরচন্দ্র ভিন্নভাবে হিন্দুদের জন্য মেট্রোপলিটান স্কুল ও কলেজ স্থাপন করিলেন। হিন্দু ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখাই এই সকল প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল। অপর-দিকে গভর্ণমেণ্টের নিকট হিন্দুগণের আবেদনের ফলে ডিরোজিও ভারতবর্ষ হইতে অপসারিত হইলেন। অধিকন্তু ধনী ও উৎসাহী হিন্দুগণের সমর্থনে শশধর তর্কচূড়ামণি, শ্রী কৃষ্ণ প্রসন্ন সেন প্রমুখ বিজ্ঞ ও শ্রেষ্ঠ বক্তাগণ সারা দেশব্যাপী হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য প্রচারে ব্রতী হইলেন।

একদিকে খৃষ্টানী ঢেউ ও অপরদিকে স্বজাতির নির্মম ব্যবহারে ক্ষুণ্ন হইয়া পি, মিত্রের পিতা খৃষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হইলেন এবং ক্রমে তাঁহার মাতা ও ভগ্নিগণও একে একে খৃষ্টান হইলেন। পিতা-মাতা তাঁহাকেও খৃষ্টধর্মে দীক্ষা গ্রহণের জন্য বলিলে তিনি জবাব দিয়াছিলেন, 'আমি কিছুদিন ভাবিয়া দেখি।' বলা বাহুল্য শেষ পর্যন্ত তিনি খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার পিতা-মাতার অনুরোধ এবং সামাজিক বিপর্যয়ের মধ্যে পড়িয়াও হিন্দুধর্মের মৌলিক পবিত্রতার প্রতি তিনি প্রগাঢ় শ্রদ্ধান্বিত ছিলেন বলিয়া নিজের জ্ঞান ও বিশ্বাস মত আপন সংকল্পে স্থির ও অবিচল ছিলেন। তিনি মনে করিতেন যে, একবার হিন্দুধর্মের বাহিরে চলিয়া গেলে পুনর্বার সেই ধর্মে ফিরিয়া আসার দ্বার চিরতরে রুদ্ধ হইয়া যাইবে। অথচ তিনি বিশ্বাস করিতেন যে, হিন্দু সমাজ বিলাত প্রত্যাগত যুবকগণকে বিলাত যাওয়ার সামান্য কল্পিত অপরাধ-হেতু দূরে ঠেলিয়া রাখিতে পারিবে না এবং এই সমস্ত বিলাত প্রত্যাগত হিন্দু যুবকগণেরও বৃহত্তর হিন্দু সমাজের বাহিরে থাকা সম্ভব হইবে না।

তিনি কেবল নামে মাত্রই হিন্দু থাকেন নাই, জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত দৈনন্দিন আচার-আচরণে তাঁহার ষোল আনা হিন্দুত্ব প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার মৃত্যুর পর 'ইণ্ডিয়ান মিরার' কাগজে যে প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাতেই পি, মিত্রের জীবনের প্রকৃত মর্মকথা রূপ পরিগ্রহ করিয়াছে। সেই প্রবন্ধের এক স্থানে লেখা আছে—

"It may not be generally known that he (P. Mitter) was a rigid Hindu, and had considerable acquaintance with the Hindu sacred literature.........

......he was a Hindu not simply in name, or as a matter of appearance, but strictly followed the Shastric

injunctions in his daily life. He used to perform the 'homa' ceremony almost every day, and was a practical Hindu, and not merely in love with its beautiful abstract theories."

নিজের বিবাহ সম্পর্কে পি, মিত্র বলিয়াছিলেন যে, বরং তিনি আজীবন অকৃতদার থাকিবেন, তথাপি হিন্দু-কন্যা ব্যতীত অপর কোন সম্প্রদায়ের কন্যার পানিগ্রহণ তিনি করিবেন না। কারণ হিন্দুদের মধ্যে যাহারা কন্যা সম্প্রদানে রাজী ছিলেন, তাঁহারা বলিয়াছিলেন যে, বিবাহের পুর্বে ছেলেকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তিনি ইহার জবাব দিয়াছিলেন যে, বিদ্যাশিক্ষার জন্য বিলাত যাওয়া অপরাধ বলিয়া গণ্য হইতে পারে না, হিন্দু শাস্ত্রের কিংবা বেদের মর্মও সেইরূপ নহে। প্রায়শ্চিত্তের প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। অবশেষে পুর্ববঙ্গের বিক্রমপুর পরগণার মালখানগড়ের বিখ্যাত কুলীন 'বসু' বংশীয় শশী নাথ বসু মহাশয়ের প্রথমা কন্যার সহিত তাঁহার বিশুদ্ধ হিন্দু মতেই বিবাহ হয়। ঐ পত্নী মাত্র দুই বৎসর জীবিতা ছিলেন। তৎপর তিনি আন্দুলের বিখ্যাত 'বসুমল্লিক' বংশীয় সুরথ নাথ মল্লিকের একমাত্র কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহাও বিশুদ্ধ হিন্দু শাস্ত্রানুসারেই সম্পন্ন হইয়াছিল।

ইংলণ্ড হইতে প্রত্যাবর্তনের পর পি, মিত্র প্রথমে কলিকাতা হাইকোর্টেই ব্যারিষ্টার রূপে আইন ব্যবসা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু কলিকাতায় তাঁহার পরিচিত বিশেষ কেহ না থাকায় ব্যবসায়ে সফলতা অর্জন করিতে অসমর্থ হইয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া মেদিনীপুর এবং তথা হইতে রংপুর গমন করেন। অবশেষে তিনি বরিশাল গমন করেন এবং স্থির করেন যদি এই স্থানেও ব্যর্থ হন, তাহা

হইলে আইন ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পত্রিকা পরিচালনে ব্রতী হইবেন। ইতিমধ্যে তিনি 'ইণ্ডিয়ান মিরার' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া যথেষ্ট সুনাম অর্জন করিয়াছিলেন। যাহা হউক, বরিশালে তিনি মাত্র দুই বৎসরের মধ্যেই সর্বশ্রেষ্ঠ আইন ব্যবসায়ীরূপে পরিগণিত হইলেন এবং বরিশাল বার এসোসিয়েশনের প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হইলেন। এই সময়ে সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহাকে কলিকাতার রিপণ কলেজে ইংরাজী সাহিত্য, আইন, ইতিহাস ও দর্শনবিদ্যার অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। সেই পত্রে এইরূপ আভাষও ছিল যে, তৎসঙ্গে তিনি ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়ও চালাইতে পারিবেন।

পি, মিত্র রিপণ কলেজে যোগদান করিলেন এবং সেই সঙ্গে হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারীও করিতে লাগিলেন। এতদ্ব্যতীত 'ইণ্ডিয়ান মিরার' ও 'বেঙ্গলী' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধাদিও লিখিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার ভাষার মাধুর্যে ও জ্ঞান-গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধ পাঠ করিয়া তৎকালীন বিদগ্ধ সমাজ তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং ক্রমে তাঁহার খ্যাতি চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। শুধু বাংলা-দেশেই নহে, বিহার, উড়িষ্যা ও অন্যত্রও তিনি আইনবিষয়ক পরামর্শের জন্য আহুত হইয়াছিলেন। পরে তিনি অধ্যাপনা পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণভাবে আইনব্যবসায়েই আত্মনিয়োগ করেন।

তৎকালে ইংরাজী-শিক্ষিত লোকে একদিকে যেমন খৃষ্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট ছিল, অপর দিকে বাংলাভাষার প্রতিও কিঞ্চিৎ অবজ্ঞা প্রকাশ করিত। অভিভাবকগণ আপনাদের পুত্র কন্যাদের ইংরাজী-ধারায় শিক্ষা দানেই বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। এমনকি পারিবারিক কথোপকথনেও বাংলাভাষার ব্যবহার পরিহার করিয়া চলিতেন।

রিপণ কলেজে অধ্যাপনাকালে পি, মিত্র বহুদিন বহুভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন যে, আমাদের বালকগণের শিক্ষার বাহন আমাদের মাতৃ-ভাষা বাংলা হওয়াই সর্বতোভাবে বিধেয়। তিনি আরও বলিতেন যে, আমাদের দেশে যে-ভাবে ইংরাজীভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহার ফলে ছাত্রগণ প্রকৃত শিক্ষা ত পাইতেছেই না, বরং হিন্দু জাতি, হিন্দু ধর্ম, হিন্দু সমাজ, হিন্দু সাহিত্য—এক কথায় হিন্দুর কৃষ্টি ও সভ্যতাকে হেয় মনে করিবার প্রশ্রয় পাইতেছে। তিনি দুঃখ করিয়া বলিতেন যে, বর্তমানে এই কথা কেহ ভাবেও না, বুঝিতেও চাহে না যে, পৌরাণিক ও বৈদিক হিন্দুগণের আচার-ব্যবহার সমস্তই বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। বাংলা ভাষায় শিক্ষা-দানের উদ্দেশ্যে পি, মিত্র 'মিল' ও 'বেইন'এর তর্ক শাস্ত্র—যাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল, তাহা বাংলাভাষায় প্রকাশ করেন। ছাত্রদের নিকট এই পুস্তক যথেষ্ট আদরণীয় হইলেও, যেহেতু বাংলাভাষা শিক্ষাদানের মাধ্যম ছিল না, ক্রমশঃ ইহার ব্যবহার কমিয়া গেল।

পি, মিত্র সখেদে বলিতেন যে, ইংরাজী শিক্ষা ও বিজাতীয় চিন্তা-ধারার ফলে ছাত্রগণের মধ্যে ক্রমশঃ হিন্দু-বিদ্বেষ প্রবল হইতে প্রবলতর হইতে থাকে। তাহারা মনে করিত যে, হিন্দুধর্মের সমস্তই মন্দ ও উপেক্ষণীয়। ছাত্রগণের এইরূপ মনোভাব সম্পর্কে পি, মিত্র সর্বদাই কঠোর সমালোচনা করিতেন। তিনি এই সম্বন্ধে বহু প্রবন্ধা-দিও লিখিয়াছিলেন। একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন :

".........by the light of his newly acquired Western knowledge young India had begun to discover that everything that was Hindu in its origin was bad. The

ancient Hindu religion was bad. The system of caste, based on first essential principle of sound political economy,—namely, the principle of division of labour, which more than anything else, has preserved the Hindu race from utter annihilation was bad. The joint Hindu family system, leaving school for the teaching of self-negation and a life of duty, was bad. The Hindu system of marriage, which, unlike the marriage system obtaining under other religions, is not merely a civil contract by which the woman sells herself for a consideration, but a spiritual union of Positive and Negative principle of the same force,—was bad. In short everything of indigenous origin was bad. And as everything indigenous seemed bad to the educated young India, everything European seemed good to him in proportion."

মাতৃভাষার মাধ্যমে, দেশের শিক্ষা ও ধ্যানধারণার সহিত যোগসূত্র না রাখিলে মানুষের স্বাধীন সত্বার বিকাশ ঘটিতে পারে না, এই সত্যটি পি, মিত্র প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পূর্বেই হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন এবং আপন জ্ঞান ও বিশ্বাস অনুসারে যথাসম্ভব প্রতিকারের জন্যও চেষ্টা করিয়াছিলেন। পি, মিত্রের ঐ সতর্কবাণীর প্রতিধ্বনি গান্ধীজীর 'হরিজন' পত্রিকায়ও প্রায় পঞ্চাশবৎসর পরে দেখা যায়। গান্ধীজী লিখিয়াছেন :

"শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে অনেকেই তাহাদের চিন্তাধারা স্বাভাবিকভাবে আপন মাতৃভাষায় প্রকাশ করিতে পারে না, সেজন্য ইংরেজী-

ভাষার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। শিক্ষিত হিন্দুরা সাহেব ভাবাপন্ন বলিয়া তাহাদের নিজেদের দেশের জনসাধারণের সহিত প্রাণের যোগাযোগ অনুভব করে না। এইরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষার ফলেই ভারতের প্রকৃত মঙ্গলের পথে পৌঁছিতে বাধা জন্মিতেছে।”

পি, মিত্র স্ত্রী-শিক্ষারও পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁহার প্রথমা পত্নী এবং আরও কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলা ‘সখি সমিতি’ নামে একটি মহিলাদের সংগঠন করিয়াছিলেন। সমিতির সভ্যাগণ বিভিন্নদিনে বিভিন্ন বাড়ীতে মিলিত হইয়া সাহিত্য চর্চা, সামাজিক ও রাজনৈতিক চর্চা করিতেন।

যৌবন কালে পি, মিত্র প্রথমে কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন। কোন কোন বিষয়ে কংগ্রেসের অস্তিত্বের প্রয়োজন উপলব্ধি করিলেও কংগ্রেসের আবেদন-নিবেদন ও তোষণ নীতিকে তিনি একেবারেই সমর্থন করিতে পারিতেন না। তিনি বলিতেন, পরাধীনতার নাগপাশ হইতে মুক্ত করিয়া দেশকে প্রকৃত স্বাধীন কিম্বা প্রকৃত শক্তিশালী করা সামরিক শক্তি বিবর্জিত কংগ্রেসের পক্ষে কদাচ সম্ভবপর হইবে না। তাই তিনি কংগ্রেস পরিত্যাগ করিয়া সামরিক শক্তির পরিকল্পনা লইয়াই “অনুশীলন সমিতি”কে সুদৃঢ় ভিত্তিতে স্থাপন করিবার ইচ্ছায় সর্বতোভাবে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহার ব্যক্তিত্ব, সাহস এবং পাণ্ডিত্যে অভিভূত হইয়া তৎকালীন বহু শ্রেষ্ঠ প্রভাব-প্রতিপত্তি ও প্রতিভাবান ব্যক্তি তাঁহাকে এই নব অভিযানে নেতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছিলেন।

আত্মোন্নতি, যুগান্তর, অনুশীলন প্রভৃতি সমিতির উদ্ভব

১৯০০-১ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হইবার পূর্বে ওকাকুড়া নামে একজন জাপানী পরিব্রাজক ভারত ভ্রমণে আসেন। কলিকাতায়ও বিভিন্ন দ্রষ্টব্যস্থান দর্শনের জন্য তিনি আসিয়াছিলেন এবং পি, মিত্রের বাড়ীতে আহারাদিও করিয়াছিলেন। একদিন ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন হলে এক আলোচনা প্রসঙ্গে বিশেষ তীব্রতার সহিত সেই জাপানী ভদ্রলোক বলেন যে, তোমরা এত বড় একটা শিক্ষিত জাতি, কেন ইংরাজের পদানত হইয়া থাকিবে? স্বাধীনতার জন্য প্রকাশ্য কিম্বা গুপ্তভাবেই হউক বিভিন্নরূপে প্রচেষ্টা আরম্ভ কর, জাপান তোমাদিগকে নিশ্চয়ই সাহায্য করিবে। সেই আলোচনা সভায় যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পি, মিত্র, সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি, সুরেন হালদার, ভুপেন বসু, অরবিন্দ ঘোষ, জাষ্টিস গুরুদাস ব্যানার্জি, জাষ্টিস সারদাচরণ মিত্র।

কিছুক্ষণ আলোচনার পর সকলে একমত হইয়া এই বিষয়ে কার্যারম্ভের সংকল্প গ্রহণ করিলেন এবং পি, মিত্রকেই অধিনায়ক মনোনীত করিলেন।

বিভিন্ন ঘটনাচক্রে তৎকালীন জেনারেল এসেম্‌ব্‌লী কলেজের সংশ্লিষ্ট ব্যায়ামাগারের এক বিশিষ্ট কর্মী সতীশ চন্দ্র বসুর তত্ত্বাবধানে পি, মিত্র ১৯০২ সালে দোলপূর্ণিমার দিন ২১নং মদন মিত্রের গলিতে অনুশীলন সমিতি স্থাপন করিলেন। পরে উহার কার্যালয় ৪৯নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটে স্থানান্তরিত হয়।

সেই সময়ে অরবিন্দ ঘোষ বরোদা রাজ সরকারের শিক্ষা বিভাগে উচ্চপদে নিযুক্ত ছিলেন। তথায় তাঁহার সহিত দৈবাৎ জিতেন ব্যানার্জি নামে এক সুদর্শন ও বলিষ্ঠদেহ যুবকের পরিচয় হয়। যুবকটি বরোদা সরকারের সৈনিক বিভাগে কাজ করিত। অরবিন্দ তাহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিয়া কতিপয় শিক্ষিত যুবকের সহ-যোগিতায় এক গুপ্ত সমিতি গঠন করিলেন। এই সমিতির উদ্দেশ্য যুদ্ধায়োজন ও বিপ্লবের সাহায্যে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন।

কর্মী সংগ্রহ ও পরিচালনা কার্যের সুবিধার উদ্দেশ্যে পি, মিত্র ঐ গুপ্ত সমিতির সহিত তাঁহার অনুশীলন সমিতির যথাযোগ্য যোগাযোগ স্থাপন করিলে অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিদের সম্মতিক্রমে সর্বোপরি অধিনায়ক পি, মিত্র-ই রহিলেন। কিছুদিন পর্যন্ত পারস্পরিক সহ-যোগিতার মধ্য দিয়া সমিতির কার্য অগ্রসর হইতে লাগিল। ইহাতে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ আর্থিক এবং অন্য সাহায্যও করিতে লাগিলেন।

কিন্তু পূর্বোক্ত জিতেন ব্যানার্জি উদ্ধত প্রকৃতির লোক ছিলেন এবং শৃঙ্খলারক্ষা উপলক্ষ করিয়া তীব্রভাবেই আত্মপ্রভুত্বের প্রয়োগ করিতেন। তাই পি, মিত্রের অনুগত সতীশ বসু ও অপর কয়েক ব্যক্তি পি, মিত্র, সি, আর দাশ প্রমুখ ব্যক্তিদের নিকট জিতেন ব্যানার্জির বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনয়ন করিলে ক্রমশঃ দলাদলির সৃষ্টি হয় এবং শেষ পর্যন্ত জিতেন ব্যানার্জি পদচ্যুত হয়। কিন্তু অরবিন্দ

ঘোষের অনুগত স্বামী বিবেকানন্দের ভাই ভুপেন দত্ত প্রমুখ কয়েকজন শিক্ষিত যুবক বিক্ষুব্ধ চিত্তে 'আত্মোন্নতি' নাম দিয়া একটা বিরুদ্ধ দল গঠন করিল।

সুরেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি ও ভুপেন বসু এই সমস্ত বৈপ্লবিক সংস্পর্শ একেবারেই পরিত্যাগ করিলেন। রাজনীতিক্ষেত্রে কংগ্রেসের মধ্যে 'নরমপন্থী' ও 'গরমপন্থী' (moderate and extremist) দুই দলের মধ্যে তীব্র কলহের সৃষ্টি হইল। অরবিন্দ ঘোষ, বিপিন পাল, সুবোধ মল্লিক, ব্রহ্ম বান্ধব উপাধ্যায় প্রভৃতি গরমপন্থীগণ নরমপন্থী সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির বিরুদ্ধে দল গঠন করিয়া 'বন্দেমাতরম'. 'সন্ধ্যা' প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

এদিকে 'বন্দেমাতরম' কাগজের অধিনায়কত্ব লইয়া বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষের মধ্যে ঘোরতর প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরম্ভ হইল। সুবোধ মল্লিক অরবিন্দ ঘোষকেই সমর্থন করিলেন। ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস ও পি, মিত্রের সহায়তায় বিপিন পাল মহাশয় বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা দিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে ১৯০৭ সালে আত্মোন্নতি দলের কর্মিগণ পূর্বকথিত জিতেন ব্যানার্জিকে আনাইয়া তাহাদের তথাকথিত সৈনিক বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমশঃ বারীন ঘোষের সহিত জিতেন ব্যানার্জির বিরোধ দেখা দেয় এবং জিতেন ব্যানার্জিকে সমিতির সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতে হয়।

আত্মোন্নতি দলে স্বাধীনতা উপলক্ষ করিয়া সাহিত্য চর্চাই অধিক হইত। ক্রমে তাহারা রাজনৈতিক ডাকাতি সমর্থন করিয়া প্রচার করিতে লাগিল এবং 'যুগান্তর' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করিল। ভুপেন দত্ত এই পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন, সম্পাদক হিসাবে তিনি

ছয়মাস কারাদণ্ডও ভোগ করেন। 'যুগান্তর' পত্রিকা বাহির হওয়ার পর হইতে আত্মোন্নতি দলের কর্মিগণ সাধারণতঃ উক্ত পত্রিকা কার্যালয়েই অধিকাংশ সময় সমবেত হইত। ক্রমশঃ আত্মোন্নতি নামটির বদলে কর্মিগণ 'যুগান্তর সমিতি' নাম গ্রহণ করিলেন। 'যুগান্তর' পত্রিকায় অরবিন্দ ঘোষকে একজন অদ্বিতীয় নেতা বলিয়া প্রচার চলিতে লাগিল এবং তাঁহার প্রভাবে ক্রমে কর্মিগণ অস্ত্র সংগ্রহ ও বোমা প্রস্তুতকরণ বিষয়েই অধিকতর মনোযোগী হইল। কুমিল্লার উল্লাস করের পিতা ছিলেন শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যক্ষ। উল্লাস কর বিভিন্ন পুস্তকের সাহায্যে বোমা প্রস্তুতের পদ্ধতি জানিয়া লইল। মেদিনীপুরের হেম দাসও ইউরোপ হইতে বোমা প্রস্তুতের প্রণালী শিখিয়া আসিল।

যুগান্তর সমিতির সভ্য সংখ্যা নিতান্তই অল্প ছিল। কিন্তু তাহাদের মধ্যে প্রভাবশালী শিক্ষিত ও ধনী সভ্যের সংখ্যা ছিল অধিক। যুগান্তর সমিতির তুলনায় কলিকাতার অনুশীলন সমিতির সভ্য সংখ্যা অনেক অধিক ছিল এবং লাঠি খেলা, কুস্তি প্রভৃতির চর্চাও অধিক পরিমাণেই হইত। কিন্তু কলিকাতা অনুশীলন সমিতির কর্মতৎপরতা কলিকাতা সহর ও ইহার উপকণ্ঠেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঢাকার অনুশীলন সমিতি কলিকাতার অনুশীলন সমিতি হইতে প্রকৃতপক্ষে এবং কার্যতঃ সম্পূর্ণরূপেই ভিন্ন ছিল, যদিও উভয়স্থানেই পি, মিত্র ছিলেন প্রধান নেতা। পূর্ববঙ্গের প্রায় সমস্ত হিন্দু গ্রামে এবং এমনকি লাহোর, কাশী, ঝান্সী, সুরাট, আমেদাবাদ প্রভৃতি স্থানেও ঢাকা অনুশীলন সমিতির বিভিন্ন শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে মহারাষ্ট্র, মাদ্রাজ, বিহার, উড়িষ্যা,

যুক্তপ্রদেশ প্রভৃতি ভারতের বিভিন্ন অংশে ঢাকা অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হইলে পর জার্মানীর প্ররোচনায় ভারতেও বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের সূত্রপাত হইল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন বিপ্লবী সঙ্ঘগুলির মিলন প্রচেষ্টাও হইল বটে, কিন্তু আত্মপ্রাধান্য ও প্রভুত্ব সম্পর্কিত বিরোধহেতু ঐ সমস্ত প্রচেষ্টা একরূপ ব্যর্থ-ই হইয়া গেল। পরে কলিকাতার 'অনুশীলন' ও 'যুগান্তর' সমিতির বিক্ষিপ্ত সভ্যগণ একত্র মিলিত হইল, পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের কতিপয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিপ্লবী দলও তাহাদের সঙ্গে যোগদান করিল। এই মিলন অন্তরের মিলন নহে, তাই আপাততঃ মিলন হইলেও বিরোধের ভাব কমে নাই।

ক্রীড়া ও কৃত্রিম যুদ্ধের ক্রমবিকাশ

ঢাকা অনুশীলন সমিতি স্থাপিত হইবার পরে আমাকে প্রায়ই কলিকাতা আসিয়া দুইচারি দিন থাকিয়া যাইতে হইত। একবার কলিকাতা আসিয়া দুইটি বালকের ছুরিসহ যুযুৎসুর নানারূপ কৌশল-পূর্ণ ক্রীড়া দেখিবার সুযোগ ঘটিল এবং ইহা দেখিয়া বিশেষভাবেই আকৃষ্ট হইলাম। অনুসন্ধান করিয়া ঠিকানা বাহির করিলাম এবং মেটিয়াবুরুজে তাহাদের বাড়ীতে গিয়া জানিতে পারিলাম যে, তথায় অনুশীলন সমিতির একটি শাখা আছে। সেই শাখা-সমিতিতে মহা-বীরের পূজার জন্য কয়েকটি টাকা দিলাম এবং কিছু অর্থ-সাহায্যও করিলাম। ক্রমে তাহাদের সহিত বন্ধুত্ব হইল। সেখানে দুইদিন থাকিয়া তাহারা যত যুযুৎসুর কৌশল জানে সমস্তই শিখিয়া লইলাম।

আমি যেখানে যাহা দেখিতাম তাহা শিখিয়া আমার ঢাকা অনুশীলন সমিতির শিক্ষার্থীদের দিয়া পরীক্ষা করাইয়া লইতাম। লাঠি প্রভৃতির সঙ্গে সঙ্গে ড্রিল করাও শিক্ষা দিতাম। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামরিক বাহিনী-সুলভ আনুগত্য ক্রমেই প্রকাশ পাইতে লাগিল। বর্ষার সময় এমন দিনও অনেক গিয়াছে যে, ড্রিল করিবার সময় সহসা

বৃষ্টি নামিয়া পড়িল, কিন্তু বৃষ্টির মধ্যেই শিক্ষার্থীগণ তাহাদের কর্তব্য সম্পন্ন করিতে এতটুকু দ্বিধা বোধ করিত না। ইহাদের মধ্য হইতে কয়েকজন ক্রীড়ানিপুণ উৎসাহী ছাত্রকে বিভিন্ন শাখা-সমিতির পরিদর্শক নিযুক্ত করিলাম। মাঝে মাঝে আমি নিজেও শাখা-সমিতিগুলিতে যাইতাম, তাহাদের প্রশ্নাদির উত্তর দিতাম এবং কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্দেহের ভাব লক্ষ্য করিলে বিশদভাবে সেই সন্দেহ নিরসন করিতাম।

কিছুদিন ভালভাবেই কাটিল। কিন্তু তাহার পর লক্ষ্য করিতে লাগিলাম যে, ছাত্রগণের উৎসাহে যেন ভাটা পড়িতেছে। হয়ত একঘেয়ে ক্রীড়াতে তাহাদের বিরক্তবোধ হইতেছে। তাহারা ফুটবল, ক্রিকেট প্রভৃতি খেলার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে কয়েকজন বিখ্যাত ফুটবল ও ক্রিকেট খেলোয়াড় আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া পড়িল। আমি তাহাদের সহায়তায় প্রচার করিতে লাগিলাম যে, বিদেশী পণ্য বর্জনের আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী ক্রীড়াসমূহও বর্জন করিতে হইবে, নতুবা কল্যাণ নাই।

একদিকে এইরূপ প্রচারের ফলে এবং অপরদিকে ঢাকার নবাবের প্ররোচনায় ক্ষিপ্ত মুসলমানদের নানারূপ ভীতি প্রদর্শনে ঢাকার হিন্দু অভিভাবকগণ বিচলিত হইয়া আমার লাঠি ও ছুরি খেলার সমর্থন করিতে লাগিলেন। তাই ক্রমে পুনরায় আমার ছাত্রসংখ্যা বাড়িতে লাগিল।

মুসলমানগণ যদি হিন্দুগণের গৃহাদি আক্রমণ করে, তবে কি ভাবে আত্মরক্ষা করা যাইতে পারে তাহার উপায় নির্ধারণের জন্য কৃত্রিম যুদ্ধের ব্যবস্থা করিলাম। একদিন পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে উয়ারী

সমিতি রাজার-দেউড়ী সমিতিকে আক্রমণ করিল। ক্রীড়া আরম্ভ হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বরিশাল হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে, বরিশালে ডিষ্ট্রিক্ট কংগ্রেস কন্‌ফারেন্স পুলিশ লাঠি চার্জ করিয়া ছত্রভঙ্গ করিয়া দিয়াছে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, বিপিন পাল, কৃষ্ণ কুমার মিত্র, অশ্বিনী দত্ত, সি, আর, দাস, সুবোধ মল্লিক, অরবিন্দ ঘোষ, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা প্রমুখ বাংলার প্রথম শ্রেণীর নেতাগণ সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সভায় কয়েকজন যুবক গুরুতর ভাবে আহত হইয়াছে এবং পুলিশ সুরেন ব্যানার্জিসহ কয়েকজন নেতাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে।

এই সংবাদ শুনিয়া কৃত্রিমযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী যুবকগণ নিরুৎসাহ-বোধ করিতে লাগিল এবং সেইদিনের মত সেই যুদ্ধ স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জানাইল। আমি প্রবল প্রতিবাদের সহিত বলিলাম যে, আত্মরক্ষার নিমিত্ত প্রস্তুত হওয়ার ইহাই শ্রেষ্ঠ প্রেরণা, তোমরা যুদ্ধ চালাইতে থাক।

আমার উৎসাহপূর্ণ বাক্যে তাহারা পূর্ণ উদ্যমে কৃত্রিমযুদ্ধে মনোনিবেশ করিল। এই কৃত্রিমযুদ্ধে জয়ের নিদর্শন ছিল,—নিজের দলের পতাকা নিরাপদ রাখিয়া প্রতিপক্ষের পতাকা কাড়িয়া লইয়া আসা। শেষ পর্যন্ত উয়ারী সমিতি জয়লাভ করিল। কৃত্রিমযুদ্ধের রীতি ছিল এইরূপ :

এক পক্ষের উষ্ণীষ লালবর্ণের, অপর পক্ষের সবুজ অথবা নীলবর্ণের থাকিত। তাহাদের ব্যবহার্য লাঠিগুলিও যথাক্রমে তরল লাল এবং নীল বর্ণে সিক্ত থাকিত। বিভিন্ন উপাদানসমূহ তৈলে গুলিয়া লাঠিতে রং লাগান হইত এবং অতিরিক্তভাবে বড় লাঠির মাথায় নেকড়ার পুঁটুলি বাঁধিয়া উহা রং-এর মধ্যে ডুবান হইত। বড় লাঠি দ্বারা

সড়কির মত বিপক্ষ দলকে খোঁচা মারা হইত। শরীরের বিভিন্ন স্থানে বিপক্ষ দলের রং লাগিলেই সেই ব্যক্তি মৃত অথবা আহত বলিয়া গণ্য হইত। একদল বিচারক থাকিত, তাহারাই কে মৃত বা কে আহত তাহা নির্দেশ করিত।

ক্রমে কৃত্রিম যুদ্ধ খুবই জনপ্রিয় ক্রীড়ারূপে পরিগণিত হইল। শিক্ষার্থীগণ প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে ইহার অনুষ্ঠান করিতে লাগিল এবং স্থানীয় জনসাধারণও উৎসাহ ও আগ্রহের সহিত এইসব দর্শন করিত। এই কৃত্রিম যুদ্ধে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ সময় সময় গুরুতররূপে আহত হইত, কিন্তু ঢাকা মেডিকেল স্কুলের বহু ছাত্র সমিতির সভ্য থাকায় তাহাদের মধ্য হইতেই অনেকে ঔষধ-পত্র লইয়া শুশ্রূষার জন্য ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিত।

জাতীয় বিদ্যালয়

বরিশাল কন্‌ফারেন্স ছত্রভঙ্গ হওয়ার পর আনন্দ চক্রবর্ত্তী বরিশাল হইতে সুবোধ মল্লিক, বিপিন পাল ও অরবিন্দ ঘোষকে ঢাকা লইয়া আসিলেন। জাতীয় বিদ্যালয় গৃহে তাঁহাদের বাসস্থান করিয়া দেওয়া হইল। চার পাঁচদিন নানারূপ আলোচনা ও বক্তৃতাদি হইল এবং এই আলোচনা ও বক্তৃতার ফলে যুবকগণের মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার হইল।

ঢাকা হইতে কলিকাতায় ফিরিয়া সুবোধ মল্লিক ঢাকায়ই জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপন করিবেন স্থির করিলেন। এদিকে রংপুরের কয়েকজন প্রভাবশালী উকীল ও জমিদার রংপুরে জাতীয় বিদ্যালয়ের প্রধান কেন্দ্র স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিলে অবশেষে উহা কলিকাতাতেই স্থাপিত হইল এবং অরবিন্দ ঘোষ উহার প্রধান অধ্যক্ষ হইলেন। রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, বিনয় সরকার প্রমুখ বাংলার কৃতী সন্তানগণ জাতীয় বিদ্যালয়ে যোগদান করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে শ্রেষ্ঠ যন্ত্রপাতি সহযোগে কাঠের কাজ ও লোহার কাজ শিক্ষা দেওয়া হইতে লাগিল। জাতীয় বিদ্যালয়ে সুবোধ

মল্লিক মহাশয় এক লক্ষ টাকা দান করিলেন ; দেশের লোক তাঁহাকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'রাজা' উপাধি দ্বারা সম্মানিত করিল। ময়মনসিংহের ব্রজেন্দ্রকিশোর আচার্য এবং অন্যান্য ধনীগণ অনেক টাকা জাতীয় বিদ্যালয়ে দান করিয়াছেন। টি, পালিত মহাশয় দশ লক্ষ টাকা দিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন, কিন্তু নীলরতন সরকার প্রমুখ ব্রাহ্ম নেতাগণের আপত্তির ফলে তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুত অর্থ দিতে অস্বীকৃত হইলেন। নীলরতন সরকার বলিয়াছিলেন, 'আট বৎসর বয়সে আমার মন ব্রাহ্মভাবে পূর্ণ হইয়াছিল, কিন্তু জাতীয় বিদ্যালয়ে গীতা প্রভৃতি পড়ান হইলে, বালকগণ আর ব্রাহ্ম হইতে চাহিবে না।'

পি, মিত্র ও অপর কয়েকজন জাতীয় নেতার মতে, আট বৎসর বয়সে যদি কেহ ব্রাহ্মধর্ম শ্রেষ্ঠ মনে করে তাহা হইলে অপরিণত বয়সের ধারণা যে সঠিক হইবে তাহা বলা যায় না। আর গীতা পড়িলেই যদি কেহ ব্রাহ্ম হইতে না চায়, তাহা হইলেও বুঝিতে হইবে যে, গীতার ধর্মের তুলনায় ব্রাহ্মধর্ম নিতান্তই তুচ্ছ।

এই বিষয় লইয়া সেই সময়ে বহু বাগ্-বিতণ্ডা চলিয়াছিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়—যিনি প্রথমে খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং পরে গৈরিক বেশধারী সন্ন্যাসী হইয়া স্বদেশী আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনি 'সন্ধ্যা' পত্রিকায় এই সম্পর্কে কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন।

অবশেষে অবশ্য টি, পালিতের অর্থের সাহায্যে জাতীয় শিল্প-বিদ্যালয় স্থাপিত হইল এবং উহারই ক্রম পরিবর্তনের মধ্য দিয়া এক অংশ বর্তমান সায়েন্স কলেজে পরিণত হইল ও অপর অংশ পূর্বোক্ত জাতীয় বিদ্যালয়ের সঙ্গে মিলিত হইয়া বিভিন্ন স্থান পরিবর্তনের পরে যাদবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং স্কুলে রূপান্তরিত হইল। ঢাকার জাতীয়

বিদ্যালয় কলিকাতার ন্যাশনাল কাউন্সিল অব এডুকেশনের অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাসিক অর্থ সাহায্য পাইতে লাগিল। ক্রমে তথায় তাঁতের কাজের বিভাগও খোলা হইয়াছিল। তাহা বেশী দিন চলে নাই। কাঠের কাজ ও লোহার কাজের বিভাগ দুইটি চলিতে লাগিল এবং এই দুই বিভাগের ভার ছিল আমার উপর। আমি প্রধানতঃ গণিত, অঙ্কন ও বাংলা এই তিনটি বিষয়ে জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকের কাজ করিতাম। কিন্তু সমিতির কার্যোপলক্ষে আমাকে প্রায়ই বিভিন্ন স্থানে যাইতে হইত বলিয়া শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিতে হইল। পরে স্বনাম-খ্যাত কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় অবৈতনিকভাবে ঢাকা জাতীয় বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

চরমপন্থী বনাম নরমপন্থী

ঢাকার অনুশীলন সমিতি ও জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে ঢাকা সহরের নবীন উকীলগণ শ্যামাকান্তের ভ্রাতা উকীল সূর্য্যকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়কে মুখপাত্র করিয়া ১৫নং পাটুয়াটুলীতে 'দরিদ্র সমিতি' নাম দিয়া একটি সমিতি স্থাপন করিলেন। উকীল ব্যতীত অপরেও ঐ সমিতির সভ্য হইতে পারিত। বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী দ্রব্যের প্রচলনই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহারা একটি স্বদেশী বাজারও স্থাপন করিয়াছিলেন, যদিও তাহা অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। পরে দরিদ্র সমিতি সকালে ও বিকালে স্বদেশী বস্ত্র ও স্বদেশী অন্যান্য দ্রব্যাদি ফেরী করিয়া বিক্রয় করিবার জন্য ছাত্র ও যুবকদিগকে আহ্বান জানাইল। আমি উহাতে বাধা দিলাম। কারণ সকালে ছাত্রদিগকে লেখাপড়া করিতে হইবে, বিকালে লাঠি প্রভৃতির খেলা শিখিতে হইবে এবং সমিতির বিভিন্নরূপ প্রয়োজনীয় কার্য্যও করিতে হইবে। সুতরাং ফেরী করিবার মত সময় ছাত্রদিগের নাই। ইহা ছাড়া এই সময়ে রাজনৈতিক মতবাদ লইয়াও বিরোধের ভাব দেখা দিল। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির সমর্থকগণ 'আবেদন-নিবেদনকারী

মডারেট' বা 'নরমপন্থী' ও বিপিন পাল, পি, মিত্র প্রমুখ নেতাদের সমর্থকগণ 'একষ্ট্রিমিষ্ট' বা 'চরমপন্থী' নামে অভিহিত হইল। আমরা চরমপন্থী দলকেই সমর্থন করিলাম এবং সমস্ত ছাত্র ও যুবকগণ আমারই অনুগত রহিল। ইহাতেও 'দরিদ্র সমিতি' ও আনন্দ রায় প্রমুখ নেতাগণ বিচলিত হইলেন। প্রথমতঃ তাঁহারা আমাকে বশীভূত করিতে চেষ্টা করিলেন এবং পরে আমার বিরুদ্ধে কিছু সংখ্যক যুবক ও ছাত্রকে সমবেত করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এই কার্যেও ব্যর্থ হইয়া তাঁহারা কলিকাতায় সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জির নিকট ইহার উপায় নির্ধারণের জন্য আবেদন জানাইলেন। সুরেন্দ্রনাথ 'ছাত্রদিগকে বশীভূত করিবার ব্রহ্মাস্ত্র স্বরূপ' শচীন বসুকে ঢাকায় পাঠাইলেন। শচীন বসু স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে গরম গরম বক্তৃতা দিতে পারিতেন। তাই সুরেন্দ্রনাথ একদিন শচীনের পিঠ চাপড়াইয়া বলিয়াছিলেন, আমি মরিলে শচীন বসুই বাংলা দেশের প্রধান নেতা হইবে।

শচীন বসুর গরম বক্তৃতার ফলে কলিকাতার গোলদীঘির পারে অনেক লোক শরীর হইতে বিলাতী বস্ত্র খুলিয়া অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিত। যাহা হউক, শচীন বসু ঢাকায় যুবক ও ছাত্রদিগকে নানাভাবে বুঝাইতে লাগিলেন যে, একমাত্র স্বদেশী দ্রব্য প্রচার ও বিদেশী বর্জন দ্বারাই ইংরাজ তাড়ান সম্ভব হইবে। কারণ বিদেশী দ্রব্য বর্জনের ফলে বিলাতের ব্যবসায়িগণ নিতান্ত বিপন্ন হইয়া বিলাতে বিদ্রোহ আরম্ভ করিবে, তাহার ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বাধ্য হইয়া ভারতীয় নেতাগণের সহিত আপোষ মীমাংসার পথে আসিবে এবং ভারতকে স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হইবে। সুতরাং সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জিকে নেতৃপদে বরণ করিয়া স্বদেশী প্রচার করাই ছাত্র ও যুবকগণের প্রধান কর্তব্য।

আমিও প্রচার করিতে লাগিলাম যে, প্রথমে বিদেশী রাজাকে এই দেশ হইতে তাড়াইতে না পারিলে বিদেশী দ্রব্য বর্জন অসম্ভব হইবে।

ক্রমে দেখা গেল যে, মাত্র অল্প সংখ্যক ছাত্র ব্যতীত অধিকাংশই আমার অনুগত রহিল। শচীন বসু ব্যর্থ হইয়া ঢাকা পরিত্যাগ করিলেন। আনন্দ রায় প্রমুখ উকীল নেতাগণ তখন ছাত্র ও যুবকগণকে বশীভূত করিবার উদ্দেশ্যে এইবার সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, অম্বিকা মজুমদার, মতিলাল ঘোষ, অশ্বিনী দত্ত প্রমুখ বড় বড় নেতাদিগকে আমন্ত্রণ করিয়া ঢাকায় আনাইলেন। তাঁহারা ঢাকার বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করিলেন এবং বিপিন পাল প্রমুখ চরমপন্থী নেতাদের যুক্তি খণ্ডন করিতেও নানাভাবে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ছাত্র ও যুবকগণ কিছুতেই সংকল্পচ্যুত হইল না। তখন অনন্যোপায় হইয়া ঐ সকল নেতৃবৃন্দ এক আলোচনা সভার আয়োজন করিলেন এবং মতিলাল ঘোষের অনুরোধে চরমপন্থী দলের নেতা উকীল আনন্দ চক্রবর্তীকেও ঐ সভায় আমন্ত্রণ জানাইলেন। তথায় মডারেট দলের মনোমত কোনও এক প্রস্তাব সম্পর্কে ভোট নেওয়া হইল। দেখা গেল যুবক ও ছাত্র স্বেচ্ছাসেবকগণ সকলেই প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে ভোট দিয়াছে। ইহাতে আনন্দ রায় ও অন্যান্য মডারেটপন্থী নেতাগণ নিয়ম করিলেন যে, স্বেচ্ছাসেবকগণ ভোট দিতে পারিবে না। পুনরায় ভোট নেওয়া হইল এবং তাহাতে একমাত্র আনন্দ চক্রবর্তী বিরুদ্ধে ভোট দেওয়াতে অধিক সংখ্যক ভোটে মডারেটদের প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। কিন্তু আনন্দ চক্রবর্তী ইহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, রুদ্ধদ্বার কক্ষে ভোট না লইয়া ময়দানে ভোট লইয়া দেখ, কাহাদের প্রস্তাব সর্ববাদীসম্মতরূপে গৃহীত হয়।

মতিলাল ঘোষ আনন্দ চক্রবর্তীর সহপাঠী ও বন্ধু ছিলেন। তিনি মডারেটপন্থী হইলেও, এক্সট্রিমিষ্টদের সম্পূর্ণ বিরোধী ছিলেন না। পূর্বোক্ত কন্‌ফারেন্সের পরে একদিন মতিলাল ঘোষ আনন্দ চক্রবর্তীকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, বর্তমান অবস্থায় কিভাবে কার্য পরিচালনা করিলে দেশের প্রকৃত কল্যাণ হইতে পারে। আনন্দ চক্রবর্তী ইহার উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, আমার মতে বর্তমান অবস্থায় আমাদের প্রথম ও শ্রেষ্ঠ কর্তব্য হইতেছে প্রচলিত কাগজগুলিতে সর্বপ্রকার মন্তব্য ও দলগত সমালোচনা একেবারে বন্ধ করিয়া দেওয়া।

ইহা শুনিয়া মতিলাল ঘোষ কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিলেন এবং পরে বলিলেন, 'হ্যাঁ, আমরাই দেশের হীনতম বিশ্বাসঘাতক।'

মডারেট নেতাগণ শেষ পর্যন্ত ঢাকা হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু এই সকল ঘটনায় ঢাকার অনুশীলন সমিতির কার্যক্রম ও প্রভাব ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। নবীন উকীলগণ ও 'দরিদ্র সমিতি' এই সমিতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা প্রস্তাব করিলেন যে, তাঁহারাও আমার নিকট হইতে লাঠিখেলা শিখিবেন, কিন্তু সমিতির প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে পারিবেন না। তবে তৎপরিবর্তে আমাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। কিন্তু তাহাদের বেতনভোগী লাঠিখেলার শিক্ষক হইয়া সমিতির আদর্শ ক্ষুণ্ণ করিতে আমি রাজী হইলাম না। ইহাতে উকীলগণ আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া জমিদার মহেন্দ্র রায়ের অনুগত এক লাঠিয়াল প্রজাকে শিক্ষকরূপে নিযুক্ত করিলেন এবং সেই লাঠিয়াল খুব ওস্তাদ বলিয়া তাঁহারা গর্ব করিতেন ও সকলের নিকট প্রচার করিতেন। একদিন আমার ছাত্র ১৫।১৬ বৎসর বয়স্ক সুরেন্দ্র মজুমদার 'দরিদ্র সমিতি'র পার্শ্ববর্তী রাস্তা দিয়া যাইবার সময় নবীন উকীলগণ তাহাকে

ঐ সর্দারের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে আহ্বান জানাইলেন। আমার ছাত্রটি মোটেই খেলার জন্য প্রস্তুত ছিল না, তথাপি ঐ আহ্বান সে গ্রহণ করিল এবং সর্দারকে পরাস্ত করিল। নবীন উকীলগণ অবশ্য পরের দিনই সর্দারকে তাড়াইয়া দিয়াছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ-যোগ্য, আমার লাঠিখেলার ছাত্রগণ যাহারা খুব সামান্য দিনও আমার নিকট অভ্যাস করিয়াছে, কোথাও পরাজিত হয় নাই। এই কারণেই অতি অল্প সময়ের মধ্যে সমগ্র পূর্ববঙ্গে, উত্তরবঙ্গে, শ্রীহট্টে এবং পশ্চিমবঙ্গেরও বাঁকুড়া, মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি স্থানে লাঠিখেলার প্রভাবে ঢাকা অনুশীলন সমিতির অসংখ্য শাখা স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল। কলিকাতার অনুশীলন সমিতি মূলতঃ কলিকাতা সহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।

ঢাকার প্রত্যেক পাড়ায় ও প্রায় প্রত্যেক ছাত্র-নিবাসে সমিতির শাখা স্থাপিত হইয়াছিল। রোগী শুশ্রূষার কাজের ফলে অভিভাবক-বৃন্দও ক্রমশঃ সমিতির প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। ক্রমে দেখা গেল কয়েকজন ছাত্র লাঠিখেলা প্রভৃতিতে খুবই দক্ষতা দেখাইতে লাগিল কিন্তু লেখাপড়ায় তেমন মনোযোগী নহে। তাই ঐ সমস্ত ছাত্রগণের জন্য একটি শিক্ষামন্দির (coaching class) স্থাপন করিলাম। আমার সহকারী ভূপেশ নাগ ইংরাজী পড়াইত, জাতীয় বিদ্যালয়ের পণ্ডিত সংস্কৃত শিক্ষা দিতেন এবং আমি গণিত, বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষা দিতাম। কলেজের কয়েকজন ছাত্রও এই শিক্ষামন্দিরে পাঠগ্রহণ করিতে আসিত। এই প্রচেষ্টার ফলে দেখিতে পাইলাম যে, মাত্র একটি ছাত্র ব্যতীত স্কুল-কলেজের আর সকল ছাত্রই পরীক্ষায় আশাতীত ফল লাভ করিয়াছে। এই কারণেও আমাদের সমিতির প্রভাব প্রতিপত্তি আরও বৃদ্ধি পাইল।

এই সময়, বিশেষতঃ ঢাকা সহরে, গভর্ণমেণ্ট ও নবাবের প্ররোচনায় হিন্দুদের প্রতি মুসলমানদের পক্ষ হইতে নানারূপ উপদ্রব দেখা দিল। মুসলমান গাড়োয়ান, রাজমিস্ত্রী বা অন্যান্য মুসলমানগণও পথে-ঘাটে, যেখানে-সেখানে হিন্দুগণকে ভয় দেখাইতে লাগিল, যাহা খুশী তাহাই বলিতে লাগিল। একদিন ঢাকার নবাব কয়েকজন বিশিষ্ট সম্মানিত হিন্দুকে বাড়ীতে ডাকাইয়া লইয়া অপমান করিল। হিন্দুগণ এই কারণে কিছু বিচলিত হইয়া পড়িল। তাই নিয়ম করিলাম, সমিতিতে কোন মুসলমান ছাত্র নেওয়া হইবে না। কেহ কেহ অবশ্য ইহাতে আপত্তি করিয়া বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্টই মুসলমানগণকে উত্তেজিত করিতেছে, আমরা সদ্ভাব রাখিলে মুসলমানগণও সদ্ভাব রাখিবে। কিন্তু অধিকাংশ লোকেই এই যুক্তি মানিয়া লইতে পারিল না। কারণ হেদায়েৎ মাষ্টার প্রমুখ সদাশয় মুসলমানগণও বহু চেষ্টা করিয়া সাধারণ মুসলমানদের সুমতি আনিতে পারেন নাই। একদিন হেদায়েৎ মাষ্টার নিজেই আনন্দ রায়ের বাড়ীতে বসিয়া বলিয়াছিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট মুসলমানগণকে যে সমস্ত প্রলোভন দেখাইতেছে তাহা সম্বরণ করা মুসলমানদের পক্ষে অসম্ভব।

নারায়ণগঞ্জের অভিভাবকগণ প্রথমতঃ আপত্তি করিয়াছিলেন যে, সমিতিতে মুসলমান নেওয়া না হইলে তাঁহারা তথায় কোন সমিতি করিতে দিবেন না। কিন্তু পি, মিত্র ময়মনসিংহ হইতে কলিকাতা যাইবার পথে নারায়ণগঞ্জের অভিভাবকগণকে বিভিন্ন যুক্তি দেখাইয়া তাহাদের অভিমত ত্যাগে সম্মত করাইয়াছিলেন। ক্রমে নারায়ণগঞ্জে একটি শক্তিশালী শাখা-সমিতি গঠিত হইয়াছিল এবং আমার ছোট ভাই প্রমোদ বিহারী প্রত্যহ ঢাকা হইতে নারায়ণগঞ্জ যাইয়া লাঠি প্রভৃতি খেলা শিখাইত।

একমাত্র কলিকাতা সহর ব্যতীত সমগ্র বাংলাদেশে ঢাকা অনুশীলন সমিতির প্রসার ও প্রভাব স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সময়ে আমি একবার কলিকাতা আসিলে আমার বন্ধু বারুদীর সুরেশ নাগ একদিন আমাকে স্যার জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের বাড়ীতে লইয়া গেলেন। সুরেশ নাগ তখন জগদীশ বসুর লেবরেটরীর অধ্যক্ষ ছিলেন। সুরেশ নাগের নিকট শুনিলাম যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতির সাংগঠনিক কার্যক্রম, প্রচার পদ্ধতি এবং কৃত্রিম যুদ্ধাদির বিবরণ শুনিয়া স্যার জগদীশ নাকি মুগ্ধ হইয়া আমাকে দেখিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। আরও শুনিয়াছি যে, স্যার জগদীশ একবার তাঁহার নিজ গ্রাম বিক্রমপুরের রাড়ীখাল গেলে তথায় গ্রামের যুবকগণ ষ্টেশন হইতে তাঁহাকে পাল্কীতে চড়াইয়া কাঁধে বহন করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেই যুবকদিগকে তিনি বলিয়াছিলেন যে, তোমরা, সমস্ত বিক্রমপুরের যুবকগণ, যদি ঢাকার পুলিন দাসের নেতৃত্বে মিলিত হইয়া দেশের কাজে আত্মনিয়োগ করিতে পার, তবে আমি সর্বদাই তোমাদের প্রতি সহানুভূতি দেখাইব।

যাহা হউক, স্যার জগদীশের সহিত তাঁহার বাড়ীতে সাক্ষাৎ হইলে তিনি অত্যন্ত আগ্রহসহকারে বিভিন্ন প্রশ্ন করিয়া আমার নিকট হইতে সমস্ত বিষয় জানিয়া লইলেন। এমন কি ডাকাতির প্রসঙ্গও বাদ পড়িল না। কথা-বার্তা শেষ হইলে তিনি আমাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে অবস্থিত তাঁহার লেবরেটরীটি বিশদভাবে দেখাইয়া ও বুঝাইয়া দিলেন, কিছু অর্থ সাহায্য করিলেন এবং বিভিন্ন উপদেশ দিলেন।

তিনি আমাকে বলিয়াছিলেন, "দেখ, ইউরোপ, আমেরিকার লোকেরা যখন আমার দিকে ও রবি ঠাকুরের দিকে তাকায় তখন ভারতবর্ষকে শ্রদ্ধা না করিয়াই পারে না। তাই সর্ববিষয়ে জ্ঞানে, গুণে, যোগ্যতায় শ্রেষ্ঠ হইতে থাক, তবেই সমগ্র জগতের শ্রদ্ধা পাইবে এবং স্বাধীনতা লাভও সহজসাধ্য হইবে।"

স্যার জগদীশ গুণীলোকের যথাযোগ্য সমাদরে কার্পণ্য করিতেন না। আমারই অনুমোদনে আমার পুরোহিতবংশীয় শ্রীমান গোপাল ভট্টাচার্যকে স্যার জগদীশ বসু বিজ্ঞান মন্দিরে কর্মী হিসাবে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। পরিশেষে গোপাল স্যার জগদীশের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হইয়াছিলেন। বর্তমানে গোপাল বসু-বিজ্ঞান মন্দিরে একজন বিশিষ্ট প্রতিভাশালী, কৃতী কর্মী হিসাবে পরিচিত।

আমার লাঠিখেলার প্রতি স্যার জগদীশ সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ক্রমে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের গবেষণাকারী ছাত্র ও কর্মিগণকে লাঠি, ছোরা, যুযুৎসু প্রভৃতি শিক্ষা দানের জন্য আমাকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার পত্নী শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু তাঁহাদের বাড়ীর ছাদে কিছুদিন আমার নিকট লাঠিখেলা শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা স্যার জগদীশ অসুস্থ হইয়া পড়ায় এবং

কিছুদিনের জন্য দার্জিলিং চলিয়া যাওয়ায় লাঠিখেলা শিক্ষায় বিরতি ঘটে। আমি প্রায় দুই বৎসর কাল বসুবিজ্ঞান মন্দিরের ছাত্র ও কর্মিগণের লাঠি-শিক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিলাম।

শ্রদ্ধেয়া অবলা বসু ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে, বিদ্যাসাগর বাণীভবনে এবং মহিলাগণের 'দীপালী সমিতি'তে আমাকে লাঠিখেলার শিক্ষক-রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

তৎকালে স্যার জগদীশ প্রেসিডেন্সী কলেজে ও অন্যান্য স্থানে যখনই বক্তৃতা করিতেন, শুনিয়াছি তখন প্রায় সর্বত্রই বক্তৃতার শেষভাগে লাঠিখেলার প্রশংসা ও উহার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করিতেন এবং ছাত্র ও যুবকগণকে আমার নিকট লাঠিখেলা শিক্ষা করিতে উপদেশ দিতেন।

আমেরিকার ভূতপূর্ব প্রেসিডেণ্ট রুজভেল্টের কন্যা ও জামাতা ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে আমার ছাত্রিগণের লাঠিখেলা ইত্যাদি দেখিয়া খুবই প্রীতিলাভ করিয়াছিলেন। রুজভেল্টের জামাতা আমাকে ডাকাইয়া তাঁহার পত্নীর সম্মুখেই রসিকতা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, তুমি যে এইভাবে মেয়েদের সাংঘাতিক বিদ্যা শিখাইতেছ, দেখিও শেষে যেন তাহারা তাহাদের নিজ নিজ স্বামীর উপরই এই বিদ্যার প্রয়োগ না করে।

ভাইসরয় পত্নী লেডী লিন্‌লিথগোও ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে আমার ছাত্রীদের লাঠিখেলা দেখিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

স্যার জগদীশচন্দ্র তাঁহার বিপুল কর্মব্যস্ততার মধ্যেও অবকাশ পাইলে আমাকে ডাকিয়া রাজনৈতিক ও বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করিতেন। তিনি গান্ধীর সত্যাগ্রহ, হরতাল, ত্রয়ী বর্জন, অহিংস, অসহযোগ আন্দোলন প্রভৃতি কিছুই সমর্থন করিতেন না। গান্ধীর

সত্যাগ্রহ, বাধাপ্রদান (picketing) এবং বর্জন তিনি কপট অহিংসার আবরণে হিংসার লীলাখেলা বলিয়া মনে করিতেন।

তিনি আরও বলিতেন যে, হিন্দুগণ সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে সুসংগঠিত না হইলে ভারতের কোনই কল্যাণ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, স্যার জগদীশের মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী শ্রদ্ধেয়া লেডী বসু স্যার জগদীশের নামে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিন্দু ছাত্রগণের জন্য একটি বাৎসরিক বিশেষ বৃত্তিদান ব্যবস্থার সংকল্প জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র হিন্দু ছাত্রগণের জন্যই ঐ বৃত্তিটি নির্ধারিত হওয়াতে তৎকালীন মুসলমান মন্ত্রিগণ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে উহার ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। যাহা হউক, শ্রদ্ধেয়া লেডী বসু ভিন্নভাবে হিন্দু ছাত্রগণের জন্যই সেই বৃত্তিটি প্রদানের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বিক্রমপুরের সংগঠন

স্যার জগদীশের সহিত সাক্ষাতের পর ঢাকা ফিরিয়া আসিয়া জানিতে পারিলাম যে, বিক্রমপুরের অবস্থা নিতান্তই সঙ্কটজনক ও ভীতিপূর্ণ। তথায় 'বন্দেমাতরম' ধ্বনি উচ্চারণ করিলেই মুসলমানগণ তাড়িয়া মারিতে আসে এবং স্বদেশী প্রচারেও নানাবিধ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতেছে। তাহা ছাড়া হাটে-বাজারে সময়ে সময়ে হিন্দু জনতার উপরে লাঠিচালনা করিবার সংবাদও পাওয়া যাইতে লাগিল। দুই এক স্থানে হিন্দুগণ মুসলমানদের অত্যাচারে বাধা দেয় বটে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রাণ লইয়া পলায়ন করে। বিদ্গা-বানরী স্কুলের টুল-টেবিল জোর করিয়া লইয়া নিকটবর্ত্তী স্থানীয় ক্ষুদ্র মুসলমান জমিদার নিজ বাটীতে স্কুল স্থাপন করে। ঢাকা হইতে একজন বিশ্বপ্রেমিক গ্র্যাজুয়েট হিন্দু যুবক শিক্ষক আসিয়া 'হিন্দু-মুসলমান মিলন' বাণী প্রচার করিয়া হিন্দুর বিরুদ্ধে ঐ মুসলমান জমিদারকেই সমর্থন করে। ইহাতে মুসলমানগণ আরও প্রশ্রয় পাইয়া হিন্দুর বাড়ী লুঠ ও হিন্দুদের ইজ্জৎ নষ্টেরও ভয় দেখায়। এই কারণে বিক্রমপুরের বিভিন্ন গ্রাম হইতে আতঙ্কিত হিন্দুগণ সমিতির নিকট লাঠিশিক্ষক

প্রেরণ করিবার আবেদন জানাইতে থাকে। তাই আমি আমার ছাত্র আশুতোষ দাসকে সঙ্গে লইয়া বিক্রমপুরে গেলাম। মুন্সীগঞ্জ হইতে আরম্ভ করিয়া গ্রামে গ্রামে সমিতির শাখা স্থাপন করিতে লাগিলাম। বহু স্থানেই স্থানীয় লোকগণ আমাদের শক্তি পরীক্ষা করিতে চাহিত এবং আমি আশুতোষকে তাহাদের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে নিয়োগ করিতাম। সকল ক্ষেত্রেই আশুতোষ জয়ী হইত—এক সঙ্গে পঁচিশ-ত্রিশজন লোক আক্রমণ করিয়াও আশুতোষকে কাবু করিতে পারিত না।

অনেক স্থলেই আমরা এক গ্রামে গেলে পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামের অধিবাসীগণ আসিয়া আগ্রহ সহকারে আমাদের নিকট লাঠিখেলা, যুযুৎসু ইত্যাদি শিক্ষা করিত এবং এক গ্রামের কাজ শেষ হইলে অন্য গ্রামের লোকেরা আসিয়া আমাদিগকে তাহাদের গ্রামে লইয়া যাইত। ক্রমে বজ্রযোগিনী, কলমা, ভাগ্যকুল, লৌহজঙ্গ, কামারখাড়া প্রভৃতি স্থানের জমিদারগণের বাটিতেই শক্তিশালী শাখা-সমিতি স্থাপিত হইল। সমগ্র বিক্রমপুর বিপুল উৎসাহে মাতিয়া উঠিল। এমনকি কোথাও কোথাও বিদ্যালয় প্রাঙ্গণেই সমিতির কার্যকলাপ চলিতে লাগিল। বাহেরেক নামে একটি গ্রামে প্রবেশ করিতেই সেই গ্রামের রমণীগণ মাঙ্গলিক হুলুধ্বনি দ্বারা আমাদিগকে সম্বর্ধনা জানাইলেন। আমাদের সমিতির জনপ্রিয়তা ও কার্যক্রমের ক্রমপ্রসার হইতে থাকিল সত্য, কিন্তু ময়মনসিংহের 'সুহৃদ সমিতি'র প্রচারক কালীমোহন ঘোষ মাঝে মাঝে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। অবশ্য ইহাতে শেষ পর্যন্ত তাহাদের কোনই লাভ হয় নাই।

বিক্রমপুর পরিক্রমাকালে একদিন মধ্যপাড়া গ্রামে লাঠিখেলা শিখাইতেছি, হঠাৎ ঢাকা হইতে সমিতির একজন সভ্য আসিয়া

জানাইল যে, আনন্দ চক্রবর্ত্তী ও অন্যান্য উকীলগণ আমাকে অবিলম্বে ঢাকা চলিয়া যাইতে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। কারণ ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট নাকি আমাদের কার্যকলাপে ভয়ানক ক্ষিপ্ত হইয়াছেন। আনন্দ চক্রবর্ত্তীকে তিনি ধম্‌কাইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, "তোমাদের জেনারেল কমাণ্ডার কোথায়?"

আনন্দ চক্রবর্ত্তী জবাব দিয়াছিলেন, "কে সে?" ম্যাজিষ্ট্রেট জবাবে বলিয়াছেন, "কেন? পুলিন দাস, কোথায় সে?"

ম্যাজিষ্ট্রেট সকৌতুকে জবাব দিলেন, "আমি জানি কোথায় সে। সে এখন লৌহজঙ্গ আছে এবং বিদ্রোহ পরিচালনার জন্য বিক্রমপুরে স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ ও সংগঠন করিতেছে। শীঘ্র তাহাকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত কর।"

যাহা হউক, এই সংবাদ পাইয়া আমি ঢাকা চলিয়া আসিলাম। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট না যাইয়া অনুশীলন সমিতির কার্যোপলক্ষে সোজা ঢাকা হইতে কলিকাতা চলিয়া গেলাম।

বিক্রমপুরে সংগঠন পরিচালনার সময় সমিতির নূতন সদস্যগণ বিভিন্ন বিষয়ে জানিবার জন্য আমাকে প্রায়ই নানারূপ প্রশ্ন করিত। আমি সেই সকল প্রশ্নের জবাব যথাসম্ভব সহজ ও সংক্ষেপে দিতাম এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই সকল প্রশ্নের জবাব লিখিয়াও রাখিতাম। পরবর্ত্তীকালে ঐ সমস্ত প্রশ্নোত্তরগুলিকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া পুস্তিকা প্রকাশ করিয়াছিলাম। ১ম ভাগের নাম 'উপক্রমনিকা' দ্বিতীয় ভাগের নাম 'পরিদর্শক' এবং তৃতীয় ভাগের নাম 'সম্পাদকগণের কর্তব্য।' 'উপক্রমনিকা' লাঠিখেলা সম্পর্কিত; 'পরিদর্শক' বিভিন্ন সমিতি পরিদর্শন সম্পর্কিত এবং 'সম্পাদকগণের কর্তব্য' বিভিন্ন শাখা সমিতির পরিচালনা সম্পর্কিত।

ময়মনসিংহঃ মহারাজা সূর্যকান্ত প্রসঙ্গ

একবার পি, মিত্রের চিঠি পাইয়া আমি কলিকাতা গেলে তিনি আমাকে বলেন যে, ময়মনসিংহের জামালপুরে মুসলমানগণ হিন্দুনারী হরণ, হিন্দুনারী ধর্ষণ, দুর্গা প্রতিমা ভঙ্গ ও অন্যান্য নানা প্রকারে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়াছে। জামালপুরের শোচনীয় ঘটনায় মুক্তাগাছার মহারাজা স্বর্যকান্ত প্রাণে বড়ই আঘাত পাইয়াছেন এবং হিন্দুদের অবমাননা স্মরণ করিয়া তিনি সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী একটি শক্তিশালী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন করিবার সংকল্প করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে, স্বেচ্ছাসেবকগণের সংগঠন, রক্ষাবিধান ও সর্বরূপ আপদ-বিপদ, মামলা-মোকদ্দমা হইতে উদ্ধার করিবার জন্য সর্বপ্রকারে সাহায্য করিবেন। এবং এই কাজের জন্য তিনি অন্যান্য জমিদার ও রাজা-মহারাজাদের নিকট হইতে অর্থ সংগ্রহ করিয়া একটি স্থায়ী অর্থভাণ্ডার স্থাপিত করিবেন।

মহারাজা স্বর্যকান্তের সহিত পি, মিত্রের এই সকল ব্যাপারে আলোচনা হইয়াছে এবং এই বিরাট সংগঠনের দায়িত্ব কাহার উপর অর্পিত হইবে তিনি তাহার পরামর্শ চাহেন। পি, মিত্র এই কাজের

জন্য আমার নাম প্রস্তাব করেন এবং মহারাজা নিজেও ময়মনসিংহ সুহৃদ সমিতির পরিচালক কেদার চক্রবর্তীকে মনোনীত করেন।

পি, মিত্র আমাকে আরও জানাইয়াছিলেন যে, বাংলাদেশের মধ্যে প্রকৃত নেতা হওয়ার যোগ্যতা একমাত্র সূর্যকান্তেরই আছে। তাঁহার প্রভাব আছে, অর্থ এবং বুদ্ধিবলও আছে, জিদ্ ও সংকল্পের দৃঢ়তা আছে, কাহাকেও ভয় করেন না এবং কোনও কর্মে একবার আত্মনিয়োগ করিলে, কদাচ পশ্চাদপসরণ করেন না।

যাহা হউক, নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে মহারাজা সূর্যকান্ত পি, মিত্রের বাড়ী আসিলে তিনি আমাকে তাঁহার সহিত পরিচিত করিয়া দিলেন। স্থির হইল প্রথমে আমি ও কেদার চক্রবর্তী মাদারীপুরের অন্তর্গত বাজিৎপুর গ্রামের জমিদার মণীন্দ্র মজুমদারের নিকট হইতে দুইশতেরও অধিক নমঃশূদ্র লাঠিয়াল সংগ্রহ করিব। মণীন্দ্রবাবু মহারাজা সূর্যকান্তের খুল্লতাত ভ্রাতা। আমি ও কেদার চক্রবর্তী মহারাজার চিঠি লইয়া বাজিৎপুর যাইয়া মণীন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করি এবং সংগঠনের কাজের জন্য চেষ্টা করি। পরিশেষে নানারূপ প্রতিকূল অবস্থার ফলে এই কাজ অধিকদূর অগ্রসর হয় নাই।

এই ঘটনার প্রায় বৎসরাধিককাল পরে পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী বন্দীনিবাস হইতে ফিরিয়া মহারাজা সূর্যকান্তের মৃত্যু সংবাদ পাই এবং সেই সঙ্গে আর একটি কাহিনীও শুনিতে পাইলাম।

আমার সম্পর্কিত এক মাতুল, শরৎচন্দ্র বসু, বি, এ পাশ ও বুদ্ধিমান এবং ইংরাজী ভাষায় বিশেষ সুদক্ষ ছিলেন। ঘটনাক্রমে তিনি মহারাজা সূর্যকান্তের অত্যন্ত বিশ্বাসী ও প্রিয়পাত্র হন। পরে তিনি মহারাজার মুক্তাগাছা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষকের পদ লাভ করিয়াছিলেন। তিনি খামখেয়ালী মেজাজের ও অত্যন্ত ক্রোধপরায়ণ

ছিলেন। তাঁহার মতের বিরুদ্ধে কোন কিছু হইলেই তিনি ক্রোধে জ্ঞানহারা হইয়া পড়িতেন এবং প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য যে-কোনওরূপ পন্থা গ্রহণ করিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না। মহারাজা আমার মাতুলকে এতখানি ভালবাসিতেন যে, আপনা হইতেই তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্রকে ট্যানিং বিদ্যা শিখাইবার জন্য সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিয়া জাপান পাঠাইয়া দেন। তথাপি আমার উক্ত মাতুল মহাশয় আপন স্বভাবের বশে মহারাজার অনিষ্ট করিতে কার্পণ্য করেন নাই। জামালপুরের ঘটনার প্রতিশোধ লইবার উদ্দেশ্যে মহারাজা যে গুপ্তভাবে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগঠন করিতেছেন সেই সংবাদ তিনি পুলিশকে জানাইয়া দেন। মহারাজা তাঁহার এই বিশ্বাসঘাতকতায় তাঁহাকে পদচ্যুত করেন এবং তাঁহার পুত্রের জাপানে পড়াশুনার খরচাদি দেওয়াও বন্ধ করিয়া দেন। অবশ্য গভর্ণমেণ্ট সেই ছেলের ব্যয়ভার বহন করিতে থাকেন। শুধু তাহাই নয়, গভর্ণমেণ্ট সেই ছেলেকে জাপান হইতে আমেরিকা পাঠাইয়া দেন কৃষিবিদ্যা শিক্ষা করিবার জন্য।

কিছুকাল পরেই মহারাজা সূর্যকান্ত দেহত্যাগ করেন। প্রকাশ যে, মহারাজার চারিজন অতি-বিশ্বাসী ভৃত্য প্রত্যেকে এক এক হাজার টাকা পুরস্কার পাইয়া বিষপ্রয়োগ দ্বারা মহারাজার মৃত্যু ঘটায়।

যাহাহউক, আমার উক্ত মাতুল মহাশয় মুক্তাগাছা বিদ্যালয় হইতে পদচ্যুত হইয়া পরে কুমিল্লার উচ্চ বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু তথায় যাইয়াও কুমিল্লার ছাত্রদিগকে উত্যক্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। যাহাকে বিপ্লবী দলের সহিত সামান্যরূপেও সংশ্লিষ্ট বলিয়া তিনি মনে করিতেন তাহাকেই নানারূপ অজুহাতে

শাস্তি দিতেন, ভয় প্রদর্শন করিতেন বা অন্যান্যভাবে বিপন্ন করিতেন। ফলে তথাকার তরুণ ও ছাত্রগণ তাঁহাকে পুলিশের গুপ্তচর বলিয়া মনে করিত এবং সর্বদাই তাঁহার সম্পর্কে ভীতভাব পোষণ করিত। পরিশেষে বিপ্লবীদের হাতে কুমিল্লায়ই তিনি রিভলবারের গুলিতে নিহত হন।

মুসলমানগণ কর্ত্তৃক আমার বাসা আক্রমণ

আমি ঢাকায় ৫০ নং ওয়াড়ীতে বাসা ভাড়া করিয়া থাকিতাম। একদিন রবিবার দ্বিপ্রহরে একটি মুসলমান আমার বাসার সম্মুখে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া নানারূপ কুৎসিৎ ভাষায় গালাগালি করিতে আরম্ভ করিল। সে বলিতেছিল যে, তাহার একটি গো-শাবককে আমরা মারিয়া পা এবং কোমর ভাঙ্গিয়া দিয়াছি, তাই সে ইহার প্রতিশোধ না লইয়া যাইবে না। প্রকৃতপক্ষে একটি নিতান্ত রুগ্ন গো-শাবক আমাদের বাসার নিকটবর্ত্তী রাস্তার পার্শ্বে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় পড়িয়াছিল। সমিতির ছাত্রগণ ঐ মুসলমানটিকে শান্তভাবে বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, ঐ গো-শাবকটিকে মারিবার কিম্বা আঘাত করিবার আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই এবং আমরা উহাকে আঘাতও করি নাই। তাহা ছাড়া হিন্দুরা গরু মারে না। গো-শাবকটি রুগ্ন বলিয়াই ঐভাবে পড়িয়া আছে। কিন্তু লোকটি কিছুতেই তাহা শুনিবে না এবং ক্রমশঃই অধিকতর উত্তেজিত ও উন্মত্তভাবে গালি দিতে সুরু করিল এবং ইহার প্রতিশোধ না লইয়া কিছুতেই আমাদের বাসার দরজা পরিত্যাগ করিবে না বলিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল।

মুসলমানগণ কর্তৃক আমার বাসা আক্রমণ

একতরফা এরূপ কুৎসিৎ গালি অধিকক্ষণ সহ্য করিতে না পারিয়া আমাদের সমিতির একটি যুবক ঐ মুসলমানটিকে এক চপেটাঘাত করে। ফলে নিকটবর্তী বহু মুসলমান আসিয়া বাসার বাহিরের রাস্তায় দণ্ডায়মান সমিতির ৩।৪টি ছেলেকে আক্রমণ করিল। এই সংঘর্ষে একজন মুসলমানের মস্তকে আঘাত লাগিয়া রক্ত নির্গত হওয়াতে প্রতিশোধ গ্রহণ মানসে ক্রমে আরও বহু মুসলমান আসিয়া আমার বাসা আক্রমণ করে এবং আমাকে ধরিবারও চেষ্টা করে। আমি এক ঝট্‌কায় মুক্ত হইয়া বাড়ীর ভিতরে গিয়া তাড়াতাড়ি একটি লাঠি লইয়া আসিয়া দরজার সম্মুখে দাঁড়াই এবং আক্রমণকারীদের বাধা দিতে থাকি। এই সময়ে আমার একজন পরিচিত মুসলমান মাতব্বর রাস্তা হইতে কিছু পরিমাণ ধূলি লইয়া আমার মুখের উপর নিক্ষেপ করিল। আমার চস্‌মা ছিল বলিয়া ধূলি বিশেষভাবে চক্ষে প্রবেশ করিতে পারে নাই। তখন মুসলমানগণ বাড়ীর ভিতরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা না করিয়া অনবরত ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকে। মুসলমান রমণীগণও অজস্র গালিগালাজ করিতেছিল এবং পুরুষের হাতে আনিয়া ঢিল জোগাইয়া দিতেছিল। ক্রমে প্রায় ছয়-সাত শত মুসলমান আসিয়া পড়িল এবং আমার বাসা ঘিরিয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। অবস্থা দেখিয়া পার্শ্বস্থ জাতীয় বিদ্যালয় গৃহ হইতে দুইটি বালক পিছনের দিক দিয়া দেওয়াল অতিক্রম করিয়া আমার বাসা রক্ষা করিতে আসিল। অপর দুইটি বালক সম্মুখের রাস্তা দিয়া আমার বাসায় আসিতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মুসলমানগণ ঐ দুইটি বালককে রাস্তায় আটক করিয়া প্রহার করিতে থাকে। এই অবস্থা দেখিয়া জাতীয় বিদ্যালয় হইতে আরও দুইজন বলিষ্ঠ যুবক তীব্রবেগে ছুটিয়া আসিয়া আক্রান্ত বালক

দুইটিকে মুক্ত করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে চলিয়া গেল। এই সময়ে আমার বাসা যেন ঘিরিয়া ফেলিতে না পারে, সেই উদ্দেশ্যে একটি যুবক আমার বাসা ও জাতীয় বিদ্যালয়ের মধ্যস্থিত রাস্তাটিকে শুধু ঢিল ছুড়িয়াই রক্ষা করিতে লাগিল।

তখন ঐ মুসলমান জনতা দুইভাগে বিভক্ত হইয়া একটি দল জাতীয় বিদ্যালয় ও অন্য দল আমার বাসা আক্রমণ করিল। জাতীয় বিদ্যালয় হইতে দুইটি বালক পুলিশে সংবাদ দিতে যাইতেছিল, কিন্তু পথে নবাবের লোকদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হইল।

ঠিক সেই সময়েই নূতন একদল মুসলমান আসিয়া চীৎকার করিতে লাগিল, 'নবাবের হুকুম, আগে ওর মেয়েছেলে টেনে বার কর, পরে ওকে দেখে নিবি।' এই কথা বলিবার সঙ্গে সঙ্গে একদল মুসলমান উপর্যুপরি আঘাত করিয়া গেটের দরজা ভাঙ্গিয়া গেটের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িল। আমিও তৎক্ষণাৎ একটি লাঠি লইয়া সর্বাপেক্ষা অগ্রগামী মুসলমানটিকে প্রতি-আক্রমণ করিলাম। কিন্তু আত্মরক্ষা হেতু সে তাহার আপন লাঠি উঁচু করিয়া মাথা নীচু করিয়া দিল এবং এই অবসরে আমি তাহার বাম কনুইতে আঘাত করিলাম। সে পিছু হটিয়া গেল, কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে অপর চারিজন মুসলমান অগ্রসর হইয়া আমার মাথা লক্ষ্য করিয়া লাঠি মারিল। আমি কৌশলে লম্ফদান করিয়া আত্মরক্ষা করিলাম এবং লাঠি চালনা দ্বারা তীব্র আঘাত করিলাম। ফলে চারিজনই জড়াজড়ি করিয়া মাটীতে পড়িয়া গেল। আমি তখন আমার সম্মুখবর্তী আক্রমণকারীদিগকে মরিয়া হইয়া প্রতিহত করিতে প্রবৃত্ত হইলাম। আমার প্রতিরোধ ক্ষমতায় উৎসাহ পাইয়া পঞ্চদশ বর্ষীয় এক বালক (রাধিকা রায়) লাঠিসহ আমার সহায়তার জন্য অগ্রসর হইল।

সে বাম পার্শ্ব হইতে এবং আমি দক্ষিণ পার্শ্ব হইতে প্রতিরক্ষা ও প্রতি-আক্রমণ চালাইয়া যাইতে লাগিলাম। আমাদের ক্ষিপ্র আক্রমণের মুখে তাহারা আমাদিগকে প্রতিহত করিবার সুযোগ পাইতেছিল না এবং সেই কারণে ক্রমে পশ্চাদপসরণ করিতে লাগিল। ইত্যবসরে অপর একটি বালকও আমাদের সহায়তায় অগ্রসর হইল। যাহা হউক, আমাদের আক্রমণের বেগ সহ্য করিতে না পারিয়া অবশেষে তাহারা গেটের বাহিরে চলিয়া গেল। এই সময়ে দুই দিক হইতে ঢিল আসিয়া একটি আমার দক্ষিণ হস্তের মণিবন্ধে ও অপরটি দক্ষিণ পদ-সন্ধিতে লাগিল। কিন্তু এই আঘাতের কয়েক সেকেণ্ড আগেই আমার তীব্র আঘাতে একজনের মস্তক ক্ষত হইয়া রক্ত নির্গত হইতেছিল।

মুসলমানগণ ভূপতিত ব্যক্তিগণকে টানিয়া বাহির করিয়া বাহির হইতে গেট বন্ধ করিয়া দিল আমার আক্রমণ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য।

ঘটনাগুলি লিখিতে যে সময় লাগিল, তাহার সহস্র ভাগের এক ভাগের মধ্যেই বুঝি ঐ সমস্ত কাণ্ড ঘটিয়া গেল।

অল্পকাল মধ্যেই বহু পুলিশ আসিয়া পড়িল, ঘোড়ায় চড়িয়া কয়েকজন ইউরোপীয়ান সার্জেণ্টও আসিলেন। মুসলমানগণ আমাকে দেখাইয়া চীৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, "এই ব্যাটা খুন করিয়াছে, মেঘনার যত ডাকাতি এই ব্যাটাই সব করে, ধর এই ব্যাটাকে।"

একজন যুবক মুসলমান সাব্-ইনস্পেক্টর আমার নিকটবর্তী হইয়া ভদ্রভাবেই জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কি হইয়াছে বলুনত ?'

আমি বলিলাম, 'এই দেখুন, মুসলমানগণ আমার বাড়ীর গেট ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া আক্রমণ করিয়াছে।'

যুবকটি ভদ্রভাবেই পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 'কে কে করিয়াছে দেখাইয়া দিতে পারেন?'

আমি রাস্তায় নামিয়া একে একে দেখাইতে লাগিলাম। কিন্তু ক্রমশঃই আসামীগণ সরিয়া পড়িতে লাগিল। আমি ও আমার সঙ্গের বালক দুইটী আক্রমণকারীদের দেখাইয়া দিতেছিলাম এবং তরুণ সাব্-ইনস্পেক্টর মহাশয়ও আমাদিগকে সাহায্য করিতেছিলেন, এমন সময় সহসা ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয়পাত্র হিন্দু দারোগা শরৎ ঘোষ আসিয়া বাধা দিয়া বলিলেন, "এ যে যাকে তাকে দেখাইতেছে, ইহা গ্রাহ্য করিও না।"

ইহার খানিকক্ষণ পরেই একজন পুলিশ আসিয়া আমাকে ডাকিয়া নিকটবর্তী মনোমোহন কবিরাজের বাড়ী লইয়া গেল। যাইবার সময় পথের পার্শ্বে দেখিতে পাইলাম ১০।১২ জন আহত মুসলমান অজ্ঞানাবস্থায় পড়িয়া রহিয়াছে। কবিরাজ মহাশয়ের বাড়ীতে যাইয়া দেখিলাম তথায় পরিচিত অপরিচিত কয়েকজন সাব্-ইন্স্পেক্টর আহত কয়েকজন মুসলমানদের জবানবন্দী লিখিয়া লইতেছেন। দারোগা আমার এজাহারও লিখিয়া লইলেন। এই সময়ে একজন দারোগা আসিয়া বলিলেন যে, এইমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব মিঃ এলেন ঘটনাস্থলে আসিয়াছিলেন এবং তিনি আদেশ দিয়াছেন পুলিনবাবুর বাসা ঘিরিয়া রাখিয়া বাসার সমস্ত পুরুষদিগকে 'এ্যারেষ্ট' করিতে হইবে। সিটী ইনস্পেক্টর মিঃ হাউই ম্যাজিষ্ট্রেটের আদেশ পালনে তৎপর হইলেন, কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় আক্রমণকারী মুসলমান-দের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনের কোনরূপ উৎসাহই দেখা গেল না।

মিঃ হাউই আমাকে এবং ছয়টী বালককে গ্রেপ্তার করিলেন ও জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমাদের কোন জামীন আছে কিনা?

নিকটেই একজন প্রতিপত্তিশালী মোক্তার ছিলেন। তিনি কাগজে কি কি লিখিয়া দিয়া আমাদের জামীন হইলেন।

ইতিমধ্যে ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট অব পুলিশ ত্রিপুরাবাবু (বোধ হয় সেন) আসিয়া বিস্তৃতভাবে আমার নিকট হইতে সমস্ত বিবরণ জানিয়া লইলেন এবং সিটি ইনস্‌পেক্‌টর মিঃ হাউইকে আদেশ করিলেন, আজই সন্ধ্যার পূর্বে সমস্ত তদন্ত শেষ করিয়া দোষী মুসলমানদিগকেও গ্রেপ্তার করিতে হইবে। অগত্যা বাধ্য হইয়া মিঃ হাউই আমাকে সঙ্গে লইয়া নিকটবর্ত্তী রাস্তা হইতে ১০।১২ জন মুসলমানকে গ্রেপ্তার করিলেন। পরে ধৃত মুসলমানগণকে সঙ্গে লইয়া মিঃ হাউই পূর্বোক্ত কবিরাজ মহাশয়ের বাসার সম্মুখস্থ খোলা জায়গায় আসিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিলেন এবং মুসলমানগণের সঙ্গে কি কি পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তথায় কিছুক্ষণের মধ্যে আরও কয়েকজন মাতব্বর আসিয়া জুটিল। জানিতে পারিলাম যে, আমাদের বাসায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সংঘর্ষ আরম্ভ হইয়াছে, এই সংবাদ পাইবামাত্র ঢাকার নবাব বাহাদুর তাঁহার লোককে বিশেষ উপদেশ ও নির্দেশ দিয়া ঘটনাস্থলে পাঠান এবং নিজেকে সাফাই রাখিবার জন্য ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চলিয়া যান ও সেই স্থান হইতেই অপর লোকের মারফতে ঘটনার সংবাদ লইতেছিলেন।

আহত হিন্দু ও মুসলমানগণ এবং পূর্বোক্ত গো-শাবকটি হাসপাতালে প্রেরিত হইল। হিন্দুগণ বিশেষভাবে আহত হয় নাই বলিয়া সকলেই মুক্ত হইয়া আসিল। মুসলমানগণ চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে রহিয়া গেল। ডাক্তারের রিপোর্টে জানা গেল যে, গো-শাবকটী খাদ্যাভাবে রুগ্ন হওয়াতেই চলিতে অক্ষম হইয়াছিল, কোনরূপ শারীরিক আঘাত পায় নাই।

পুনরায় মিঃ হাউই আমাকে ডাকাইয়া নিতান্ত নিরীহ ভাল মানুষের ন্যায় প্রস্তাব করিলেন যে, মোকদ্দমা চলিলে উভয় পক্ষেরই ক্ষতি ও লাঞ্ছনা হইবে মাত্র। তাই তিনি আপোষ প্রস্তাব করিতেছেন। তিনি আরও জানান যে, মুসলমানগণ আপোষ প্রস্তাবে স্বীকৃত হইয়াছে। একজন মুসলমান মাতব্বরও মিঃ হাউইর সহিত আসিয়াছিলেন। তিনি অনুনয়ের সুরে বলিলেন, 'বাবু আপনাদের সহিত আমাদের ত কোন শত্রুতা নাই, আপনি আপোষ করিয়া ফেলুন।'

মিঃ হাউই আবার বলিলেন যে, ব্যাপার যতদূর অগ্রসর হইয়াছে, তাহাতে একমাত্র ম্যাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত আমার কিছুই করিবার নাই। উভয় পক্ষ রাজী হইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী গেলে, তিনি এখনই আপোষের অনুমতি দিবেন, চল সেখানেই আমরা যাই।

বিশেষ আলোচনা না করিয়া আমরা আপোষ ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইলাম। তখন মিঃ হাউই আমাকে এবং একজন মুসলমান মাতব্বরকে লইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একথা বলিলেন যে, আপোষ যখন হইয়াই গেল, তখন শুধু মুসলমানদের আর আটক রাখিবার [illegible] তিনি তাহাদের নিজ নিজ বাড়ী যাইবার অনুমতি দিয়া দিলেন। মুসলমানদিগকে মুক্তি দিয়া সেই সঙ্গে গ্রেপ্তার সম্পর্কিত কাগজখানাও ছিঁড়িয়া ফেলিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হওয়ার পর অপর একদল মুসলমান মাতব্বর সম্মুখ দিক হইতে আসিয়া বলিল যে, নবাবের হুকুম কোনরকম আপোষ করা হইবে না।

মিঃ হাউই কপট আপত্তি করিয়া বলিয়া উঠিলেন, তবে যে আমি ধৃত মুসলমানদিগকে ছাড়িয়া দিলাম ?

মুসলমান মাতব্বরগণ বলিল, তা আমরা কি জানি। আপনি ছাড়িয়া দিলেন কেন ?

মিঃ হাউই কপট রাগান্বিত হইবার লক্ষণ দেখাইয়া বলিলেন, ও বুঝেছি, বুঝেছি তোমাদের চালাকি।

আমি ও অপর ছয়টী বালক জামীনে মুক্ত হইয়াছিলাম. তাহার কোন পরিবর্তন করা হইল না।

এই ঘটনায় হিন্দুগণ বড়ই বিস্মিত হইলেন এবং ক্ষুব্ধ হইলেন। হিন্দুগণ পুলিশের বিরুদ্ধে 'কর্ত্তব্যের অবহেলা' দর্শাইয়া আবেদন করিবার ফলে অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট অতিরিক্ত প্রমাণ লইয়া মাত্র তিনজন মুসলমানকে পুনরায় গ্রেপ্তার করিবার নির্দেশ দিলেন।

যাহা হউক, কিছুদিন পর্যন্ত সিটী ইনসপেক্টর পাড়া ঘুরিয়া আমার বিরুদ্ধে সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। মুসলমানগণও বিভিন্ন কৌশলে একজন হিন্দু কনেষ্টবল ও দুইজন হিন্দু সাক্ষী আমার বিরুদ্ধে জুটাইয়া ফেলিল। আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, রাজশক্তির এত অবিচারের মধ্যেও ঢাকার উকীলগণ আমার সাহায্যের জন্য নিঃস্বার্থভাবে অগ্রসর হইলেন, নিজেরা চাঁদা তুলিয়া টাকা সংগ্রহ করিলেন, আমার পক্ষ সমর্থনের উদ্দেশ্যে কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার পি, মিত্র দুইবার ঢাকা আসিলেন। তাঁহার যাতায়াতের আংশিক ব্যয় মাত্র তাঁহাকে দেওয়া হইয়াছিল। আমাকে ঘর হইতে এক পয়সাও বাহির করিতে হয় নাই।

মিঃ হাউই ঢাকার নবীন উকীলদের নিকট গর্ব করিয়া বলিতেন, 'তোমাদের লীডারকে এবার পাইয়াছি. দেখি কোথায় যায় ?'

যাহা হউক, মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। মোকদ্দমার তৃতীয় দিবসে একটি বালক মুক্তি পাইল—দুইজন মুসলমান সাক্ষী ঐ বালকটির পিতার নিকট হইতে অর্থ পাইয়া বলিয়াছিল যে, সেই বালকটী হাঙ্গামায় ছিল না। অবশেষে বিচারের ফল হইল এই যে, আমার ২১ দিন ও অপর পাঁচটী বালকের প্রত্যেকের ১৫ দিন করিয়া কারাদণ্ড ভোগ করিতে হইবে এবং আমাদের প্রত্যেকেরই ১৫ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড হইল। বিচারক যুক্তি দেখাইলেন, 'মুসলমানগণ গেট ভাঙ্গিয়া ভিতরে ঢুকিয়া বাড়ী আক্রমণ করিয়াছিল বটে, কিন্তু আত্মরক্ষার প্রয়োজন অতিক্রম করিয়া অতিরিক্তভাবেই হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে মারিয়াছে।'

ধৃত তিনজন মুসলমানেরও বিচার হইয়াছে, তাহারা সকলেই মুক্তি পাইল। বিচারক যুক্তি দেখাইলেন, 'হাঙ্গামার সময় বহু মুসলমান একত্রিত হইয়াছিল, তাহাত প্রমাণিতই হইয়াছে। কিন্তু বহু লোকের মধ্যে এই তিনজন মুসলমানকে প্রকৃত হাঙ্গামায় জড়িত বলিয়া নিশ্চিতরূপে সনাক্ত করা সম্ভবপর কিম্বা বিশ্বাসযোগ্য বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না।'

আমরা এক রাত্রি কারাবাস ভোগ করিয়া পরের দিন জামীনে মুক্তি পাইলাম। পরে জজকোর্টে আপীলের ফলে কারাবাস হইতে অব্যাহতি পাইলাম। কিন্তু জরিমানার টাকা সকলকেই দিতে হইল।

সেকালে ঢাকার ইউরোপীয়ান ক্লাবে সন্ধ্যার পর স্থানীয় প্রায় সমস্ত ইউরোপীয়ানগণই মিলিত হইতেন এবং নাচ-গান, খেলাধুলা ছাড়াও সম-সাময়িক রাজনীতি ইত্যাদি আলোচনা হইত। তথায় যে সমস্ত বাঙ্গালী কেরাণী বা অন্যান্য উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী থাকিতেন,

তাঁহারাও ঐ সকল আলোচনা অবাধে শুনিতে পারিতেন। তাঁহাদেরই একজনের কাছে পরে জানিতে পারিয়াছি যে, ঢাকার অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বের্ণিং সাহেব—যিনি আমাদের মোকদ্দমার বিচারক ছিলেন, তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ ও সুবিচারক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। ঢাকায় আসিবার পূর্বে আসামে তিনি সহকারী কমিশনার হিসাবে নাকি যথেষ্ট ন্যায়পরায়ণতা দেখাইয়াছিলেন।

আমাদের মোকদ্দমার অবস্থা দেখিয়া বের্ণিং সাহেব নাকি আমাদিগকে পূর্ণভাবেই মুক্তি দিবার সংকল্প করিয়াছিলেন। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয়ানগণ আমাদিগকে শাস্তি দিবার জন্য তীব্র পীড়াপীড়ি করায় নাকি তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহাদের যুক্তি ছিল এই যে, কিছু শাস্তি দিয়া এবং কিছুদিনের জন্য জেলে রাখিয়া ভয় না দেখাইলে ইহাদের সাহস বাড়িয়া যাইবে, শেষে ইউরোপীয়ানদেরও মারিতে ও গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যাইতেও কোনরূপ দ্বিধা করিবে না। তাহা ছাড়া কেবলমাত্র পাঁচ-ছয়টী বালকের সহায়তায় এতগুলি মুসলমানকে আহত ও পরাভূত করা কিরূপে সম্ভব হইল, তাহাও ইউরোপীয়ানগণের নিকট আশ্চর্য বলিয়াই গণ্য হইয়াছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের পরে ঢাকার নবাবের প্রভাবে ঢাকার সাধারণ মুসলমানগণ হিন্দুগণের প্রতি অবজ্ঞা এবং আক্রোশের ভাবই দেখাইত। কিন্তু আমাদের সমিতি স্থাপিত হইবার পর আমার বাসা আক্রমণের সেই দুর্ঘটনা ব্যতীত বিভিন্ন মুসলমান মাতব্বরের (সম্ভবতঃ নবাব নিযুক্ত) নানারূপ প্ররোচনা সত্ত্বেও সাধারণ মুসলমানগণ আমার সঙ্গে অথবা সমিতির বালকগণের সহিত কোনরূপ অসদ্ব্যবহার ত' করেই নাই, তদুপরি কথা-বার্তা, কাজে-কর্মে তাহাদের

সদাচারই প্রকাশ পাইত। তবে গুপ্তচর যাহারা, তাহারা হিন্দুই কি আর মুসলমানই বা কি, তাহারা স্বতন্ত্র জাতের। স্বদেশী আন্দোলনে মুসলমানদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা না পাইলেও হিন্দুদের তীব্র দেশাত্মবোধের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই। কিন্তু কংগ্রেস যেদিন হইতে স্বাধীনতার জন্য হিন্দু-মুসলমানের মিলনের বাণী প্রচার করিতে লাগিল, সেদিন হইতে মুসলমানগণও ভাবিতে লাগিল যে, মুসলমানদের কৃপা ব্যতীত হিন্দুগণ নিতান্তই নগণ্য।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম ভাগে স্বদেশী নেতাদের গতিবিধি, বক্তৃতা, সভা-সমিতি ইত্যাদির উপরেই পুলিশের তৎপরতা সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ক্রমে সেই তৎপরতা বৃদ্ধি পাইয়া 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি, বিদেশী দ্রব্য বর্জন, পিকেটিং প্রভৃতি কার্যকলাপের উপরও বিস্তার লাভ করিল। এই উপলক্ষে বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছাত্র ও পুলিশের মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংঘর্ষ হইতে লাগিল। ছাত্র ও যুবকগণ প্রধানতঃ 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনির উপাসক হইয়া পড়িল। তাহা ছাড়া স্বদেশী আন্দোলনে পুলিশের দমন নীতির প্রতিবাদও তাহারা তীব্রভাবেই করিত। গভর্ণমেণ্টও ছাত্রদের শায়েস্তা করিবার অভিপ্রায়ে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিত্য নূতন সার্কুলার জারী করিতে লাগিলেন। ফলে ঢাকা, রংপুর ও অপরাপর কয়েকটি স্থানে ছাত্রগণ সাময়িকভাবে স্কুল পরিত্যাগ করিল। ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রগণ কোনও এক দমন নীতির প্রতিবাদে জুতা পরিত্যাগ করিয়া নগ্ন পদে স্কুলে গেল এবং সেইজন্য তাহারা অর্থদণ্ডও ভোগ করিল। এই সময়ে কিছু সংখ্যক ছাত্র সরকারী বিদ্যালয় পরিত্যাগ

করিয়া জাতীয় বিদ্যালয়ে ভর্তি হইল। ছাত্র ও যুবকগণের উপর আমার এবং অনুশীলন সমিতির প্রভাব আছে অনুমান করিয়া একদিন সিটি ইনস্পেক্টর মিঃ হাউষ্ট আমার জনৈক পুলিশ কর্মচারী বন্ধুর মারফতে তাহার বাসায় ডাকাইয়া নিয়া আমাকে উপদেশ দিলেন যে, ঢাকার ছাত্র ও যুবকগণ যেন পথে কোন ইংরেজ পুরুষ অথবা স্ত্রীলোককে দেখিয়া 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি উচ্চারণ না করে। হাউই সাহেবের গাল্লাও সেইরূপ উপদেশ দিলেন। ক্রমে সভা-সমিতি করা আইনতঃ নিষিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইল।

এই সময় শারীরিক শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রদের মধ্যে ধর্মভাব জাগাইয়া তুলিয়া নৈতিক চরিত্র বিকাশের উদ্দেশ্যে সমিতির অঙ্গস্বরূপ একটি 'গীতা-সঙ্ঘ' আমি স্থাপন করিবার সংকল্প করি এবং আমার অনুরোধে স্বনামখ্যাত অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় ইহার দায়িত্বভার গ্রহণে সম্মত হন। একদিন বৈকালে সমিতির ক্রীড়াদি শেষ হইলে পর তিনি আমার অনুরোধে আমার বাসার সংলগ্ন জাতীয় বিদ্যালয় গৃহে পদার্পণ করেন। সমিতির কয়েকজন বয়স্ক ছাত্র, কয়েকজন অভিভাবক এবং সমিতির কয়েকজন পৃষ্ঠপোষকও সেইদিন বিদ্যালয় গৃহে আসিয়াছিলেন। সেইদিন কুঞ্জবাবু উপস্থিত ছাত্রগণের নিকট হিন্দুধর্ম, হিন্দুশাস্ত্র, গীতা প্রভৃতির শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে আলোচনা করিয়া তাহাদিগকে হিন্দুধর্মের প্রতি অনুরক্ত থাকিতে ও চরিত্রবান হইতে উপদেশ দিয়াছিলেন। সেইদিন আমিও বলিয়াছিলাম যে, জ্ঞানবল, ধর্মবল এবং চরিত্রবল না থাকিলে শুধুমাত্র শারীরিক বল দ্বারা কখনও কোন দেশের, কোন জাতির কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

পরের দিন ম্যাজিষ্ট্রেট আমাকে ডাকাইয়া তীব্রভাবে তিরস্কার

কারণ বলিলেন যে, আমি নাকি আইন অমান্য করিয়া সভা করিয়াছি এবং ছাত্র ও যুবকদের বিদ্রোহীভাবাপন্ন করিয়া তুলিয়াছি। তিনি আমাকে ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক করিয়াও দেন।

আমি কিছু বলিতে যাইতেছিলাম, তিনি বাধা দিয়া বলিলেন, 'আমি তোমার কোন কথাই শুনিতে চাহি না, তুমি সাবধান থাকিও।'

কোন কথা বলিতে না পারিয়া আমি বাধ্য হইয়া নীরবেই চলিয়া আসিলাম।

ইহার কিছুদিন পর ম্যাজিস্ট্রেট নগরের বিদ্যালয়সমূহের প্রধান শিক্ষকদের সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ নির্দেশ দিলেন যে, ছাত্রগণ ক্রমশঃই গভর্ণমেন্টের বিরোধী হইয়া পড়িতেছে, ছাত্রগণ যাহাতে রাজভক্ত থাকে এবং কেবলমাত্র লেখাপড়ায় লিপ্ত থাকে, তাঁহারা যেন সেইরূপ ব্যবস্থা করেন।

কিন্তু এই সময়ে বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী আন্দোলন কিছু পরিমাণে স্তিমিতভাব ধারণ করিলেও ছাত্রদের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষা ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। তাহাদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইতে থাকে যে, দেশের স্বাধীনতা না আসিলে অভাব-অভিযোগের বা দুঃখ-দৈন্যের প্রতিকার হইবে না এবং দেশের গৌরব বৃদ্ধিরও কোন সম্ভাবনা নাই। বিভিন্ন স্বদেশী সঙ্গীত হইতেও ছাত্রগণ অনুরূপ প্রেরণাই লাভ করিত। রাজনীতির আলোচনা কোথাও আরম্ভ হইলেই ছাত্রগণ বলিয়া উঠিত "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়", অথবা "বাজরে শিঙা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন বিপুল ভবে, সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রবে?"

ফলে ছাত্রদের উপর আবার পুলিশের তৎপরতা দেখা দিল। বিভিন্ন ছাত্রনিবাসে, ক্রীড়া প্রাঙ্গণে এবং স্কুল-কলেজে নূতন নূতন লোকের আবির্ভাব হইতে লাগিল। কেহ কেহ বা অযাচিত, অপরিচিত, অপ্রত্যাশিতভাবে অথবা স্বদেশী সঙ্গীত গাহিয়া কিম্বা সন্ন্যাসী সাজিযা দেখা দিতে লাগিল। তাহাদের অনুসন্ধিৎসু কর্মপ্রচেষ্টা, হাল-চাল, কথা-বার্তা হইতে ছাত্রগণও বুঝিযা ফেলিল যে, তাহারা পুলিশের গুপ্তচর ভিন্ন অপর কেহ নহে। এমনকি কোন কোন ছাত্রও পুলিশের নিকট হইতে টাকা পাইয়া সন্দেহজনক কার্য-কলাপের পরিচয দিতে লাগিল। বলা বাহুল্য, সমিতি ও আমার উপরও পুলিশের শ্যেন চক্ষু পড়িল।

নরেন সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্ক সেন এই সময়ে ঢাকা পাটুযাটুলীতে 'ননসেন্স ক্লাব' নাম দিযা একটি সঙ্ঘ স্থাপন করিয়াছিল। সেই সঙ্ঘে বহু শিক্ষিত যুবক ছিল এবং তাহারা প্রত্যেকেই আমাদের সমিতির কল্যাণ কামনা করিত। ঐ ননসেন্স ক্লাবের কযেকজন সভ্যের সহিত উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারীদের বন্ধুতা ও আত্মীয়তা ছিল। তাই ক্রমে আমার এমন সুবিধা হইল যে, ম্যাজিস্ট্রেটের বাড়ীতে আমার সম্পর্কে যখনই যেইরূপ আলোচনা হইত, তাহাই আমি জানিতে পারিতাম এবং সেই অনুসারে সতর্ক হইতে পারিতাম। একদিন জানিতে পারিলাম যে, ঢাকার পুলিশ সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, সম্ভবতঃ মিঃ বোনাম কার্টার, বলিয়াছেন যে, যতদিন বৃক্ষে বৃক্ষে রাইফেল ও কার্ট্রিজ না জন্মিবে, ততদিন পুলিনকে ও তাহার সমিতিকে আমাদের ভয় করিবার কিছুই নাই; তাহাদের লাঠি তাহারাই উপভোগ করুক।

কিন্তু তাহাদের উপহাস সত্ত্বেও ক্রমেই সমিতির প্রভাব বৃদ্ধি

পাইতে লাগিল। ঢাকা সহর অতিক্রম করিয়া বাংলার বিভিন্ন স্থানে সমিতির শাখা স্থাপিত হইল এবং অভিভাবকগণ ও যুবকগণ যাহারা আমাদের সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ করিত, তাহারা আমাদের কার্য-কলাপ ও সঙ্ঘশক্তি দেখিয়া আমাদিগের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিলেন। সমিতির মধ্যে শৃঙ্খলার ভাবও পূর্বের অপেক্ষা অধিক দেখা দিল। এই সকল কারণে সমিতির উপর পুলিশের নজরও প্রখর হইতে লাগিল এবং তাহারা সমিতি ও আমার সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে ব্যাপৃত হইল। আমার এক সহপাঠী ও বাল্যবন্ধু পুলিশ কর্মচারীর নিকট শুনিয়াছি যে, পুলিশ আমার সম্পর্কে অনুসন্ধান করিয়া গভর্ণমেণ্টকে রিপোর্ট দিয়াছে যে, শিবাজীই পুলিন দাসের আদর্শ এবং সফলতার সহিত পুলিন দাস সেই আদর্শের দিকেই অগ্রসর হইতেছে। সুতরাং এখনই যদি তাহাকে দমন করা না হয়, তবে আওরঙ্গজেবের পক্ষে শিবাজী যেমন ত্রাসের কারণ হইয়াছিল, দুই-তিন বৎসরের মধ্যেই বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের পক্ষে পুলিন দাস সেইরূপ হইয়া দাঁড়াইবে।

ঢাকার বিভিন্ন দুষ্ট প্রকৃতির যুবক ও ছাত্রগণ ব্যক্তিগত কলহ কিম্বা শত্রুতার প্রতিশোধ হেতু অনেক সময়েই নিম্নশ্রেণীর মুসলমান নিযুক্ত করিত। ঐ সমস্ত মুসলমানগণ সামান্য অর্থ কিম্বা অসৎ প্রবৃত্তি চরিতার্থতার প্রলোভনে সুযোগমত যে-কোন ব্যক্তিকে লাঞ্ছিত ও অপমানিত করিতে দ্বিধাবোধ করিত না। রহমতুল্লা নামে একজন মুসলমান যুবক তাহার অনুগত কয়েকজন নিম্নশ্রেণীর অসৎ প্রকৃতির হিন্দু-মুসলমান ছেলেকে লইয়া একটি দল গঠন করিয়াছিল এবং তাহারা অন্যান্য বালকদের দলে টানিবার উদ্দেশ্যে নানারূপ ভীতি প্রদর্শন করিত। তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া কোন কোন বালক

আমাদের সমিতির সাহায্য প্রার্থনা করিত ও আমরাও তাহাদের ঐরূপ দুষ্কার্যে বাধা দিতাম। ফলে অনন্যোপায় হইয়া রহমতুল্লার দল আমাদের প্রতি হিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিল এবং পরে কার্যতঃ পুলিশের গুপ্তচর হিসাবে আমাদের বিরুদ্ধে নানারূপ সংবাদ সরবরাহ করিত। রহমতুল্লা ও তাহার দলের সভ্যগণ আমাকে রাত্রিতে একাকী রাস্তায় দেখিয়া দুইবার আমার উপর আক্রমণও করিয়াছিল। কিন্তু আমার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই।

একবার রহমতুল্লার দলের একটি হিন্দু যুবক পৃষ্ঠদেশে ছুরিকাহত হইয়া [illegible] সমিতির [illegible]-সহ। যুবকদের প্রতি রহমতুল্লার পর হইতেই [illegible] ছিল। [illegible] সময় সে সেই সব যুবকদের নাম বলিয়া দেয়। অবশেষে দুইটি যুবকের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়। [illegible] দ্বিতীয় [illegible] শ্রেণীর ছাত্র [illegible] সহকারী পরিচালক জ্যোতির্ময় রায়। [illegible] মুক্তি লাভ করিল কিন্তু জ্যোতির্ময়ের [illegible] মাসের কারাদণ্ড হইল। এই ঘটনায় ঢাকার জনসাধারণের [illegible] উকীলগণের মধ্যে বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়। [illegible] জ্যোতির্ময়কে [illegible] করিতে পারে নাই। [illegible] যুবকটিও বিচারের সময় সরকারী উকীলের প্রশ্নের উত্তরে জ্যোতির্ময়কে দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, যে তাহাকে ছুরিকাঘাত করিয়াছে এই ব্যক্তি সে নহে। কিন্তু বিচারক পুলিশের বর্ণনাকেই প্রামাণ্য হিসাবে গ্রহণ করিয়া জ্যোতির্ময়কে শাস্তি দিলেন। বিচারক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট মহাশয় বাঙ্গালী ছিলেন। তাই এইরূপ অবিচারের ফলে কোন কোন সম্মানিত প্রবীণ উকীলও মন্তব্য করিয়াছিলেন যে, বাঙ্গালী হইয়াও যে বাঙ্গালীর উপর এইরূপ

ধীন অবিচার করিতে পারে, তাহাকে সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। কোনও এক বিশিষ্ট বন্ধুর প্রশ্নের উত্তরে সেই বাঙ্গালী ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়াছিলেন যে, স্বয়ং ম্যাজিষ্ট্রেটের গোপন আদেশ অনুসারেই তিনি ঐরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সংবাদ শুনিয়া যুবকগণের আক্রোশ বাঙ্গালী ডেপুটির পরিবর্তে ইংরাজ ম্যাজিষ্ট্রেটের উপরেই পড়িল। কেহ কেহ এইরূপ মন্তব্যও করিল যে, ইংরাজের প্ররোচনাতেই মুসলমানগণ হিন্দুগণের এবং স্বদেশী আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণ করিতেছে। তাই ইংরাজের অধীন বাঙ্গালী কর্মচারীদিগকে শিক্ষা না দিয়া, ইংরাজ কর্তৃপক্ষকেই সমুচিত শিক্ষা দেওয়া কর্তব্য। এই বিষয়ে যুবকগণ আমার মতামত জানিতে আসিল। আমি তাহাদিগকে বলিলাম যে, পি. মিত্র বলিয়াছেন, দুই একটি ইংরাজ উচ্চ কর্মচারীর প্রাণ নাশ করিলে যুবকদের বিরুদ্ধে পুলিশের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইবে। তাহাতে আমাদের প্রস্তুতি সম্পর্কে বিঘ্নের উৎপত্তি হইবে এবং গভর্ণমেন্ট সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি প্রমুখ নরমপন্থী নেতা ও তাহাদের অনুগামী লোকদের কয়েকটি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিবে—যাহার ফলে সেই সকল নেতৃবৃন্দ প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া কংগ্রেসের ভিতর দিয়া এমনভাবে রাজনীতি পরিচালনা করিবেন যে, দেশের সাধারণ লোক ও যুবকগণ প্রকৃত স্বাধীনতা কি তাহার মর্ম বুঝিতে পারিবে না এবং স্বাধীনতা লাভের প্রকৃত পদ্ধতি পরিত্যাগ করিয়া বাহ্যিক আড়ম্বরে মোহাভিভূত হইয়া থাকিবে। এই সময়ে পি. মিত্র প্রায়ই মিশরের দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিতেন ও তথাকার জাতীয়তাবাদী নেতাদের দুর্বলতা সম্পর্কে কটাক্ষ করিতেন। পি. মিত্র আরও বলিতেন যে, প্রকাশ্য বিদ্রোহ অথবা যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্কেত স্বরূপই মাত্র রাজনৈতিক গুপ্ত হত্যা এবং

উচ্চ রাজকর্মচারীদের প্রাণনাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। গুপ্ত সমিতির প্রথম সংগঠনকালে ঐরূপ কার্য সুফলের পরিবর্তে কুফলই অধিক ঘটাইয়া থাকে।

কিন্তু যুবকগণের মনে তখন ইংরাজ বিদ্বেষ এমনই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছে যে, আমার ও পি, মিত্রের যুক্তি উপেক্ষা করিয়াও তাহারা উত্তেজিত হইয়া উঠিতে লাগিল। অধিকন্তু ক্ষুদিরাম, কানাই প্রমুখ তরুণদের ফাঁসীর সংবাদ ও প্রফুল্ল চাকির মৃত্যু কাহিনী ইত্যাদি ঘটনা তাহাদের প্রতিহিংসা প্রবৃত্তিকে আরও তীব্র করিয়া তুলিতে সাহায্য করিল। ছেলেরা এই সময়ে 'ক্ষুদিরামের ফাঁসী, জাগ বঙ্গবাসী' এইরূপ পোষ্টার লিখিয়া বিভিন্ন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দিত।

একদিন সংবাদ পাইলাম , চারিজন বালক তাহাদের অভিভাবকদের না জানাইয়া কোথায় চলিয়া গিয়াছে। একজন বালক লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছিল যে, দেশের শত্রু ধ্বংস করাই তাহাদের উদ্দেশ্য। অবশ্য এক সপ্তাহকাল পরে তাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল। কারণ দেশের শত্রু মারিবার কোনরূপ সুযোগ-সুবিধা তাহারা পায় নাই।

বিভিন্ন ঘটনাস্রোতে দেশের মধ্যে—বিশেষতঃ কর্মোন্মুখ যুবকগণের মধ্যে যে উত্তেজনা ও প্রেরণা তীব্রভাবে জাগিয়া উঠে, কোন যুক্তি-তর্ক বা শাসন দ্বারা তাহা রোধ করা সম্ভব হয় না।

ইতিমধ্যে সংবাদ পাইলাম যে, ঢাকার ম্যাজিষ্ট্রেট এলেন সাহেব কলিকাতা যাইবার পথে গোয়ালন্দ ষ্টেশনে গুলীবিদ্ধ হইয়া অজ্ঞানাবস্থায় কলিকাতায় নীত হইয়াছেন। গভর্ণমেণ্টের বিবৃতিতে প্রকাশ যে, অস্ত্রোপচার করিয়া গুলী বাহির করা হইয়াছিল এবং

বিশেষজ্ঞগণ পরীক্ষা করিয়া বলিয়াছেন যে, ঐরূপ গুলী ভারতবর্ষে পাওয়া যাইতে পারে না। সংবাদে আরও প্রকাশ পাইল যে, এলেন সাহেব অল্পদিনের মধ্যেই আরোগ্যলাভ করিয়া ইংলণ্ড চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পি. মিত্র আমাকে বলিয়াছিলেন যে, এলেন সাহেব নিশ্চয়ই মারা গিয়াছেন। বিপ্লবী আততায়িগণ পাছে তাহাদের এই প্রথম সফলতায় অতিমাত্রায় উৎফুল্ল হইয়া তীব্র ভাব ধারণ করে এই আশঙ্কায় গভর্ণমেণ্ট এলেন সাহেবের মৃত্যু সংবাদ প্রকাশ করেন নাই।

পি, মিত্র এলেন সাহেবের মৃত্যু সম্পর্কে আমার নিকট দুইটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছিলেন। একটি হইল এই যে, কলিকাতার যে বাড়ীতে এলেন সাহেবকে রাখা হইয়াছিল, সে বাড়ী হইতে দুইদিন পরে একটি ইউরোপীয়ানের মৃতদেহ বিনা আড়ম্বরে যথাসম্ভব গোপনভাবে রাত্রির অন্ধকারে বালীগঞ্জ সমাধিক্ষেত্রে সমাহিত করা হইয়াছিল। এই সংবাদ তিনি ক্রিশ্চিয়ান শববাহীদের কাহারও নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় প্রমাণ, কোনও এক বিশেষ দিনে ইংলণ্ডগামী যাত্রী জাহাজের সমস্ত যাত্রিদের নাম (তৎকালীন নিয়ম অনুসারে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়, তাহাতে মিঃ এবং মিসেস্ এলেন উভয়েরই নাম মুদ্রিত ছিল। কিন্তু ঐ জাহাজ ইংলণ্ড পৌঁছিলে পর যেই সমস্ত যাত্রী তথায় অবতরণ করিল তৎকালীন নিয়ম অনুসারে, তাহাদের নামের যে তালিকা ইংলণ্ডে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল, তাহার মধ্যে মিসেস্ এলেনের নাম ছিল কিন্তু মিঃ এলেনের নাম ছিল না, কিম্বা তিনি কোথায় গেলেন বা পথিমধ্যে তাহার কিছু ঘটিয়াছে কিনা সে সম্পর্কে কোন সংবাদই পাওয়া যায় নাই।

যাহা হউক, সমিতির বিরুদ্ধে পুলিশের অভিযান ক্রমশঃই বাড়িতে লাগিল। সামান্য সামান্য অজুহাতেও সমিতির যুবকগণকে পুলিশ নানারূপে হয়রান করিত। কেহ বা সাহেবদের গোরস্থান হইতে ফল চুরি করিবার অপরাধে, কেহ বা 'বন্দে-মাতরম্' বলার অপরাধে, কেহ বা পিকেটিং করা বা নিষিদ্ধ পুস্তক রাখার অপরাধে, আবার কেহ কেহ বা রহমতুল্লার দলের চক্রান্তের ফাঁদে পড়িয়া নানাভাবে পুলিশের নিগ্রহ ভোগ করিতে লাগিল।

কিন্তু উপরোক্তরূপ নিগ্রহ ভোগ করিয়াও সমিতির কোন সভ্যই পুলিশের নিকট সমিতি সংক্রান্ত কোন গুপ্ত কথাই প্রকাশ করে নাই। পুলিশ তখন নির্য্যাতনের এই রাস্তা পরিহার করিয়া এক নূতন কৌশল অবলম্বন করিল। দেখা গেল সমিতি-নিবাসে (বোর্ডিং) কয়েকজন গুপ্তচর প্রবেশ করিল। তাহারা যেন আমার অতিভক্ত, সমিতির নিয়ম-প্রণালীর প্রতিও অতিমাত্রায় অনুরক্ত—এইরূপ ভাব দেখাইয়া সমিতির সমস্ত প্রতিজ্ঞাদি পালনে অত্যধিক তৎপর থাকিয়া সমিতি এবং সমিতি-নিবাসের সভ্য হইল। কিন্তু কয়েকদিনের মধ্যেই তাহাদের চাল-চলনে সমিতি-নিবাসের সভ্যগণ বুঝিয়া ফেলিল যে, তাহারা গুপ্তচরের ছদ্মবেশে উদ্দেশ্য সাধনে আসিয়াছে। ঐ গুপ্তচরগণ কোন কাজেই পশ্চাৎপদ হইত না, ঘর পরিষ্কার করা, উনুনের ছাই ফেলা হইতে আরম্ভ করিয়া কোন কাজেই তাহাদের বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। তাহারা এই ধরণের বিভিন্ন কাজের অজুহাতে প্রায় সকল সময়েই সমিতি-নিবাসের অভ্যন্তরে থাকিত। সমিতির সভ্যগণ সমস্ত বুঝিতে পারিয়া এমনভাবে নিজেদের কাজ-কর্মাদি করিত, যাহাতে তাহারা কিছুই জানিতে না পারে। সমিতি-নিবাসের সম্মুখেই কয়েক-জন মুসলমান দাগী চোরের বাসস্থান ছিল। তাহারা পুলিশের নিকট

অর্থ পাইয়া সমিতি-নিবাস সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদ তাহাদিগকে জানাইত। সমিতি-নিবাসের পশ্চাতে কয়েকজন ধনাঢ্য তন্তুবায়ী অধিবাসীও আমাদের সংবাদ সরবরাহের জন্য পুলিশ কর্তৃক নিযুক্ত হইয়াছিল। তাহা ছাড়া কিছু সংখ্যক গুপ্তচর আমি সমিতি-নিবাস হইতে বাহিরে গেলে আমার পশ্চাদনুসরণ করিত। সর্বাপেক্ষা আশ্চর্যের বিষয়, পুলিশের এত কৌশল সত্বেও সমিতির যুবকগণ এমনভাবে কার্য সমাধা করিত যে, পুলিশ সন্দেহ করিলেও কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ হাজির করিতে পারিত না।

পুলিশ এবারও ব্যর্থ হইল। তাহারা আমাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার উদ্দেশ্যে একের পর এক কৌশল প্রয়োগ করিতে লাগিল। একদিন তাহারা জানিতে পারিল যে, সমিতির একটি নৌকা আছে এবং বিভিন্ন কারণে তাহারা সন্দেহ করিল যে, হয়ত এই নৌকা কোন রাজনৈতিক ডাকাতিতে ব্যবহার করা হইবে। হঠাৎ একদিন সংবাদ পাইলাম যে, সমিতির নৌকার মধ্যে একটি মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে এবং পুলিশ আসিয়া ঐ নৌকা তাহাদের হেপাজতে রাখিয়া নৌকার সত্বাধিকারীর অনুসন্ধান করিতেছে। আমি সমিতির সভ্যদিগকে বলিয়া দিলাম যে, তাহারা যেন এই নৌকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন ভাব দেখাইয়া আপন আপন কর্মে লিপ্ত থাকে। পুলিশ আসিয়া বিভিন্ন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করিয়াও কোন সদুত্তর পাইল না। পরে জানিতে পারিয়াছি যে, আমাকে বিপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে পুলিশ পূর্বের রাত্রিতে জেলখানা হইতে একটি মৃতদেহ আনিয়া আমাদের নৌকায় রাখিয়া দিয়াছিল এবং ঘটনার দিন পুলিশের সঙ্কেত অনুসারে নিকটবর্তী কোনও অধিবাসীর প্রেরিত সংবাদে পুলিশ আসিয়া নৌকা অধিকার করে।

পুলিশের এই বারের ষড়যন্ত্রও ব্যর্থ হইল। কিন্তু তাহারা নিত্য-নূতন কৌশল অবলম্বনে বিরত হইল না। প্রায় প্রত্যহই কোন না কোন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া আমাকে এবং সমিতির কোন কোন সভ্যকে বিভিন্নরূপ প্রশ্ন করিয়া তাহাদের নিজেদের মনোমত মন্তব্য লিখিয়া লইয়া যাইত। সমিতি-নিবাসে কয়েকজন অল্পবয়স্ক বালক সভ্যও ছিল। তাহাদের মধ্যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণের পুত্রও ছিল। ঐ বালকটির পিতা বহু বিবাহ করিয়াছিল এবং অধিকাংশ সময়েই গৈরিক বসন পরিধান করিয়া থাকিত ও বিভিন্ন শ্বশুর বাড়ী কিম্বা অন্যত্র ঘুরিয়া বেড়াইত। সুতরাং বালকটি মাতুলালয়েই প্রতিপালিত হইত এবং মাতুলই তাহার প্রকৃত অভিভাবক ছিল। একদিন বালকটির মাতুল তাহাকে বাড়ী ফিরাইয়া নিতে আসিলে আমি তাহাকে মাতুলের সহিত বাড়ী ফিরিয়া যাইতে অনুমতি দেওয়া সত্বেও বালকটি দৃঢ়তার সহিত জানাইয়া দিল যে, সে দেশের সেবা করিবার উদ্দেশ্যে জীবনপণ করিয়া আসিয়াছে এবং তাহার উদ্দেশ্য সফল না হওয়া পর্যন্ত সে কিছুতেই গৃহে ফিরিয়া যাইবে না। মাতুল মহাশয় বহু পীড়াপীড়ি করিয়াও বালকটির মতের পরিবর্তন করাইতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে পুলিশের শরণাপন্ন হইলেন। সেইদিন অপরাহ্নে পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কয়েকজন পুলিশ ইনস্পেক্টর ও সাব-ইনস্পেক্টর এবং শস্ত্রধারী বহু পুলিশসহ সহসা আসিয়া সমিতি-নিবাস ঘিরিয়া ফেলিল। আমি সেই সময় পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে নারায়ণগঞ্জ সমিতি পরিদর্শনে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলাম। দেখিতে পাইলাম যে, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত পূর্বোক্ত বালকটির মাতুলও ছিল। সে সময়ে সমিতির ছেলেরা সমিতি-নিবাসের আঙ্গিনায় লাঠিখেলা করিতেছিল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের

নির্দেশমত আমার অনুমতি লইয়া সমস্ত বালক ও যুবকগণ শ্রেণীবদ্ধ-ভাবে দাঁড়াইল এবং হাতের লাঠিগুলি একস্থানে স্তূপাকারে রাখিয়া দিল। পূর্বোক্ত বালকটির মাতুলের সঙ্কেতমত দুইজন কনেষ্টবল বালকটিকে বলপূর্বক সমিতি-নিবাসের বাহিরে লইয়া গেল। বাহিরে কয়েকটি গাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে বলিলেন, সমিতি-নিবাসের সমস্ত সভ্যগণকে লইয়া তোমাকে কোতোয়ালীতে যাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করিতে হইবে। সুতরাং তাঁহার নির্দেশমত আমরা সকলে ভিন্ন ভিন্ন গাড়ীতে উঠিলাম ; প্রত্যেক গাড়ীতেই অবশ্য এক একজন পুলিশ ইনস্‌পেক্‌টর অথবা সাব-ইনস্‌পেক্‌টর উঠিল। আমার গাড়ীতে দুইজন পুলিশ কর্মচারী উঠিল। ধৃত বালকটি পুলিশ কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে সিপাহীর সহিত পদব্রজেই চলিতে লাগিল এবং পুলিশ সুপারি-ণ্টেণ্ডেণ্টও বালকটির সহিত হাসিমুখে কথা বলিতে বলিতে পদব্রজেই চলিতে লাগিলেন। এদিকে গাড়ীর অভ্যন্তরে সতর্ক পুলিশ প্রহরায় বসিয়াও বালকগণ সোল্লাসে বারম্বার 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনি দিতে লাগিল। প্রকৃতপক্ষে পুলিশের হস্তে বন্দী থাকিয়াও পূর্বোক্ত বালকটী সেই সমবেত 'বন্দে-মাতরম্' ধ্বনির সহিত সরবে আপন কণ্ঠও যোগ করিয়া দিতেছিল।

কোতোয়ালীতে ম্যাজিষ্ট্রেট পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছিলেন ; আমরা সেখানে প্রবেশ করিলে ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে অল্পবয়স্ক বালকগণকে পৃথক করিয়া রাখিয়া প্রধান প্রধান পুলিশ কর্মচারীগণ ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে এই সংবাদ দাবানলের মত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল, ক্রমশঃ অসংখ্য বালক ও যুবক আসিয়া কোতোয়ালীর সম্মুখে ভীড়

করিল। পাটুয়াটুলী, ইস্‌লামপুর, শাখারীবাজার প্রভৃতি রাস্তাগুলি লোকে লোকাকীর্ণ হইয়া পড়িল; মুহুর্মুহুঃ 'বন্দে-মাতরম্‌' ধ্বনিতে আকাশ বিদীর্ণ হইতে লাগিল।

কি জানি কি ভাবিয়া এই সময়ে দারোগা শরৎ ঘোষ ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ মত আমার কাছে আসিয়া অনুরোধের সুরে বলিলেন, 'পুলিনবাবু এই সমস্ত যুবকদের একটু শান্তভাব অবলম্বন করিতে বলুন এবং উহাদিগকে বলিয়া দিন যে, আমরা কাহাকেও কিছু বলিব না, প্রত্যেকেই শান্তভাবে আপন আপন গৃহে ফিরিয়া যাক।' ম্যাজিষ্ট্রেটের অভিপ্রায়ের আসল উদ্দেশ্য কি তাহা বুঝিতে না পারিয়া আমি নিঃশব্দেই দাঁড়াইয়া রহিলাম। ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া শরৎ ঘোষ মহাশয় পুনরায় আসিয়া আমাকে বলিলেন, 'আপনাদিগকে জামীনে ছাড়িয়া দিব, তাই জামীন হইতে পারে এইরূপ কয়েকজন লোকের নাম বলিয়া দিন।' আমি নিকটবর্তী কয়েকজন উকীল ও মোক্তারের নাম বলিয়া দিলাম এবং কোতোয়ালীর সম্মুখে দণ্ডায়মান কয়েকজন যুবককে ঐ সমস্ত জামীনদার ব্যক্তিদিগকে সংবাদ পাঠাইবার জন্য বলিয়া দিলাম। জামীনে বালক ও যুবকগণ মুক্ত হইয়া সমিতি-নিবাসে ফিরিয়া গেল। উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী মিঃ ব্যামফোর্ড আমাকে জেলখানাতে লইয়া গেলেন।

প্রায় এক মাস পর মোকদ্দমার তারিখ পড়িল। কিন্তু মোকদ্দমা যে কি এবং কেন তাহা কিছুই জানান হইল না।

তরুণ বয়স্ক মিঃ ব্যামফোর্ড সাহেব জেলে লইয়া যাইবার সময় গাড়ীতে বসিয়া আমার নিকট দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, তোমাকে জেলে লইয়া যাওয়ার জন্য আমি খুবই দুঃখিত। কারণ তুমি একজন

দেশপ্রেমিক। কিন্তু গভর্ণমেণ্টের পক্ষে ইহা ভিন্ন অন্য কোন উপায় ছিল না।

বলা বাহুল্য, তরুণ সাহেবের এই সহানুভূতিসূচক মন্তব্য আমার হৃদয় স্পর্শ করিয়াছিল।

প্রায় ১৭ দিন আমাকে কারাগারে থাকিতে হইল এবং জামীনের জন্য সমস্ত আবেদনই অগ্রাহ্য হইল। আমি জেলে থাকাকালেই সংবাদ পাইলাম যে, একদিন পুলিশ বাহিনী সহসা সমিতি-নিবাসে হানা দিয়া প্রায় কুড়ি-পঁচিশটী ঢাল, অসংখ্য লাঠি, সতেরো শতেরও অধিক পুস্তক, সমিতি-সংক্রান্ত কাগজ-পত্র, মহাপুরুষ ও দেব-দেবীর বহু ফটো লইয়া গিয়াছে।

ঢাকার উকীল শ্রীশবাবু জেলে আমার সহিত দেখা করিয়া বলিলেন, যে গভর্ণমেণ্ট আমার বিরুদ্ধে 'বালক-অপহরণ'-এর (kidnapping) অভিযোগ আনিয়াছে।

প্রায় সতেরো দিন পরে আমাকে এক বাঙ্গালী ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত করা হইল এবং পূর্বোক্ত বালক অপহরণ মামলা হইতে অব্যাহতি দিয়া অপর দুইটী নূতন বালক অপহরণ মোকদ্দমায় আমাকে জড়িত করা হইল এবং প্রায় তিন সপ্তাহ পরে পরবর্তী মোকদ্দমার তারিখ নির্ধারিত হইল।

প্রথম মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি দেওয়ার কারণ ছিল এই যে, সংশ্লিষ্ট বালকটী নিজেই দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিল, সে নিজের ইচ্ছাতেই সমিতিতে যোগদান করিয়াছে এবং তাহার গেরুয়াধারী পিতাও পুলিশ তদন্তকালে বলিয়াছিল যে, তাহার ইচ্ছা তাহার ছেলে সমিতিতেই থাকুক।

জেল হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলাম যে, সমস্তই লণ্ড ভণ্ড

হইয়া গিয়াছে, কিন্তু বালক ও যুবকগণের উৎসাহ, উদ্যম যেন দ্বিগুণ বাড়িয়া গিয়াছে। শুনিলাম যে-সমস্ত অল্প বয়স্ক বালকগণকে কোতোয়ালীতে আবদ্ধ রাখা হইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকের অভিভাবককে দেশ হইতে আনাইয়া ম্যাজিষ্ট্রেট বিভিন্ন বালককে নিজ নিজ অভিভাবকদের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন এবং প্রত্যেক অভিভাবককেই বিশেষভাবে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন যে, ঐ সমস্ত বালকেরা যেন সমিতির সহিত কোনরূপ সম্পর্ক না রাখে। কিন্তু প্রতিটি বালকই অল্প কয়েকদিনের মধ্যে সমিতি-নিবাসে ফিরিয়া আসিয়াছিল।

আমি জেলে থাকাকালে পুলিশ ১৪টি বালকের অভিভাবককে আমার বিরুদ্ধে বালক-অপহরণ মোকদ্দমা আনিবার জন্য প্ররোচিত করিতেছিল। তন্মধ্যে মাত্র দুইটি ক্ষেত্রে পুলিশের ষড়যন্ত্র সফল হইয়াছিল। আমি জানিতে পারিয়াছিলাম যে, আমার বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনা হইলেও উহার বিচার করিয়া নিষ্পত্তির কোনও ইচ্ছা পুলিশের ছিল না। কারণ যাহাতে আমি আত্মগোপন করিতে না পারি সেই উদ্দেশ্যে আমাকে জামীনে আবদ্ধ করিয়া রাখাই পুলিশের অভিপ্রায় ছিল। তাহা ছাড়া স্বদেশী সংক্রান্ত প্রয়োজনে আমি কখন কাহার সহিত গুপ্তভাবে যোগাযোগ করি সেই সকল সূত্র পুলিশের জানা দরকার, তাই তাহারা জেলে রাখিতেও চাহে না। সুতরাং কৌশল করিয়া আমার বিরুদ্ধে দুইটি মোকদ্দমা ঝুলাইয়া রাখা হইল এবং আমাকে জামীন দেওয়া হইল।

রজনী গুপ্ত, ত্রৈলোক্য বসু, আনন্দ চক্রবর্তী, ললিত রায় প্রমুখ সমিতির হিতাকাঙ্খী ও প্রবীণ উকীলগণ আমাকে বলিলেন যে, গভর্ণমেণ্ট প্রকাশ্যভাবে আর সমিতি পরিচালনা করিতে দিবে না। ললিত রায় মহাশয় আমাকে আত্মগোপন করিয়া থাকিতে উপদেশ

দিলেন এবং বলিলেন যে, আমাকে লুকাইয়া রাখিবার সমস্ত দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করিতে স্বীকৃত আছেন।

আত্মগোপনের প্রস্তাবে আমি সম্মত হইতে পারিলাম না। আমার যুক্তি ছিল যে, আমি আত্মগোপন করিলে সমিতির বালক ও যুবকগণ ভীরুতার দৃষ্টান্তই দেখিবে মাত্র, এবং তাহাদের উৎসাহ-উদ্যমও সমস্তই ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বরং আমি যদি কারাবরণ কিম্বা অন্যান্য লাঞ্ছনাও নির্ভীক চিত্তে বরণ করিয়া লইতে পারি, তবে বালক ও যুবকগণ নির্ভীকতার দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হইয়া দেশের কল্যাণের জন্য অকুতোভয়ে আত্মত্যাগ করিতে অগ্রসর হইবে।

সমিতির কাজ-কর্ম পুনরায় পূর্ণোদ্যমে সুরু হইলে সকলেই আশঙ্কা করিল যে, গভর্ণমেণ্ট আমাকে ছলে-বলে-কৌশলে অন্ততঃ কিছুকালের জন্য নিশ্চিতরূপেই জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবে। তাই আমার অবর্তমানেও যাহাতে সমিতির কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতে পারে সেই উদ্দেশ্যে সমিতি-নিবাসের কর্মিগণকে বিভিন্ন জেলার প্রধান প্রধান শাখা কেন্দ্রে পাঠাইয়া দিলাম এবং আমি নিজেও কুমিল্লা চলিয়া গেলাম।

দুইদিন কুমিল্লায় থাকার পর তৃতীয় দিবসে হঠাৎ টেলিগ্রাম পাইলাম যে, আমাকে অবিলম্বে ঢাকায় যাইতে হইবে। ঢাকা আসিয়া শুনিলাম যে, সমিতি-নিবাসের যে-সমস্ত যুবকগণ প্রথম দিন আমার সহিত ধৃত হইয়াছিল এবং পরে জামীনে মুক্তি পাইয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেককেই তিনদিনের মধ্যে ঢাকায় উপস্থিত করিবার জন্য জামীনদার উকীলগণকে গভর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিয়াছেন।

যেদিন কুমিল্লা হইতে ঢাকায় ফিরিয়া আসিলাম, সেইদিন হইতেই পুলিশ দিনে একবার, রাত্রিতে দুইবার আমার বাড়ীতে

আসিয়া আমাকে দেখিয়া যাইত এবং সমিতি-নিবাসে কে কে আছে, কে আসিল এবং কে গেল প্রভৃতি লিখিয়া লইয়া যাইত।

ইতিমধ্যে একদিন কলিকাতা হইতে অজ্ঞাত পরিচয় এক ব্যক্তির চিঠি পাইলাম এবং নরেন সেনের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শশাঙ্ক সেনও কলিকাতা হইতে লোক মারফতে চিঠি পাঠাইল। উভয় চিঠিরই বক্তব্য প্রায় একরূপ। চিঠিতে লেখা ছিল যে, গভর্ণমেণ্ট সমিতির কয়েকজন বিশিষ্ট কর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া কোন অজ্ঞাত স্থানে পাঠাইয়া দিবে বলিয়া জানা গেল; তাই আত্মগোপন করিতে হইলে অবিলম্বে তাহা করিতে হইবে। আত্মগোপন করিয়া থাকা আমি যুক্তিযুক্ত বলিয়া কখনও মনে করিতে পারি নাই। তবু আমার অবর্তমানেও যাহাতে সমিতির কাজ চলিতে পারে তদুদ্দেশ্যে বিভিন্ন কর্মীকে বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দিলাম। শিশির গুহ নামে একজন তরুণকে ভূটান সীমানার অন্তর্গত মিস্‌মি, আবর প্রভৃতি স্বাধীন অসভ্য জাতিগণের মধ্যে কোনও গুপ্তকেন্দ্র স্থাপনের নির্দেশ দিয়া প্রয়োজনীয় অর্থাদিরও ব্যবস্থা করিয়া দিলাম।

ইহার পরের দিন রাত্রিতে শয়ন করিয়া আছি, হঠাৎ সংবাদ পাইলাম সেই রাত্রিতেই আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পুলিশ বাহিনী প্রস্তুত হইতেছে। এই সংবাদ শুনিবামাত্র কয়েকজন তরুণ কর্মীকে অন্যত্র পাঠাইয়া দিলাম। অবশ্য সেই রাত্রিতে ও পরের দিনও কিছু ঘটিল না। উহার পরের দিন কয়েকজন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া বিভিন্ন বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া গেল। সন্ধ্যার কিছু পরে একজন পদস্থ পুলিশ কর্মচারী ও আরও কয়েকজন পুলিশের লোক আসিয়া সমিতি-নিবাসে অবস্থিত প্রত্যেক ব্যক্তির নাম-ঠিকানা ইত্যাদি লিখিয়া লইয়া গেল। তৎপরে সেই রাত্রিতেই পুনরায় বারটা-একটার

সময় অপর একদল পুলিশ কর্মচারী আসিয়া প্রত্যেকের নাম-ধাম লিখিয়া লইল। পুনঃ পুনঃ উৎপাতে বিরক্ত হইয়াও লাভ নাই, পুলিশের নির্দেশ মানিতেই হইবে। কিন্তু শেষ বারে নাম লিখিবার সময় আমাদের সমিতি-নিবাসের অধ্যক্ষ আশুতোষ গুপ্তের নাম গোপন করিয়াছিলাম। পুলিশ কর্মচারী বারংবার প্রশ্ন করিলে আমি বলিয়া দিলাম যে, আশুতোষ আহারাদি করিয়া সন্ধ্যার পরই বিশেষ কার্যহেতু নৌকাযোগে বিক্রমপুরে তাহার নিজের বাড়ীতে চলিয়া গিয়াছে।

পুলিশ এই সমস্ত লিখিয়া চলিয়া গেল। গভীর নিঃস্তব্ধ রাত্রি। বারংবার পুলিশের হয়রানিতে ক্লান্ত বোধ করিতেছিলাম এবং মাত্র শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি, এমন সময় বহু লোকের পদশব্দে শয্যাত্যাগ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নীচে নামিয়া আসিয়া মধ্যরাত্রির প্রায়ান্ধকার অবস্থার মধ্যেও দেখিতে পাইলাম যে, আনুমানিক দুই তিন শত সশস্ত্র সৈনিক সমিতি-নিবাসের কক্ষগুলি আক্রমণ করিবার উপক্রম করিতেছে। হঠাৎ আশুতোষ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে একজন বাঙ্গালী দারোগা অত্যন্ত ব্যস্ততা সহকারে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল, 'পুলিনবাবু নাই কি?'

আমিও উত্তর দিলাম, 'এই যে আমি, কেন?'

দারোগাবাবু যেন এইবার একটু আশ্বস্ত হইয়া বলিলেন, 'না হে থাক, আর প্রয়োজন নাই।' এবং আমার দিকে সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, 'এদিকে আসুন'। আমি তাহার সহিত পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে, সমিতি-নিবাসের গেটটি সিপাহীগণ ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে এবং সেই ভাঙ্গা গেটের নিকটেই পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় দাঁড়াইয়া আছেন।

সাধারণতঃ সমস্ত দিবারাত্রিই সমিতি-নিবাসের প্রথম কক্ষের এক ক্ষুদ্র প্রবেশ দ্বারে পালা করিয়া পাহারা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু পুলিশের পূর্বোক্ত উপদ্রব বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এই ঘটনার দুই তিন দিবস পূর্ব হইতে রাত্রির পাহারা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং প্রধান প্রবেশ দ্বারে সর্বদাই দৃঢভাবে তালা দিয়া রাখা হইত।

পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (সম্ভবতঃ র‍্যালী সাহেব) সক্রোধে বলিয়া উঠিলেন, 'কেন দরজা খুলিয়া দিলে না, তাইতো দরজা ভাঙ্গিয়া আমাদিগকে ঢুকিতে হইল ? এজন্য তোমরাই দায়ী থাকিবে !'

আমি বলিয়াছিলাম যে, আলো জ্বালিবার বা তালা খুলিয়া দিবার মত অবসর পর্যন্ত আপনারা দেন নাই, কি করিয়া দরজা খুলিব ?

যাহা হউক, তাহাদের কথা-বার্তায় বুঝিতে পারিলাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অনুমান করিয়াছিলেন যে, আমরা গুর্খা বাহিনীকে গুরুতরভাবে বাধা দিয়া পলায়ন করিয়া যাইব।

পরে পুলিশ সুপার আমার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মোলায়েম স্বরে বলিলেন, তোমার বিরুদ্ধে এক ওয়ারেণ্ট আছে, তাই আমি তোমাকে গ্রেপ্তার করিলাম ; ওয়ারেণ্টটি দেখাইতেও পারি।

বৃথা বাক্য ব্যয় না করিয়া নিঃশব্দে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সহিত রাস্তায় আসিয়া তাঁহারই নির্দেশ অনুসারে তাঁহাদের একটি গাড়ীতে উঠিয়া বসিলাম। গাড়ী ছাড়িবার পূর্বে তাড়াতাড়ি সমিতি-নিবাসের এক যুবক আমাকে একখানা গায়ের চাদর আনিয়া দিল। নতুবা সেই শীতের রাত্রিতে একবস্ত্রে ও নগ্ন শরীরে আমাকে যাইতে হইত। চাদরটি পুলিশ সাহেব নিজের হাতে লইয়া কি

পরীক্ষা করিলেন এবং বলিলেন. ইহার মধ্যে আবার কিছু নাই ত?

গাড়ী ছাড়িয়া দিল, বিরাট গুর্খা বাহিনী গাড়ীর দুই পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে চলিতে লাগিল। গাড়ীর মধ্যে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব একান্ত ভদ্রভাবে আমার সহিত কথা-বার্তা বলিতে লাগিলেন। রাত্রির শেষভাগে বুড়িগঙ্গার ধারে ম্যাজিষ্ট্রেটের তৎকালীন বাসগৃহের সম্মুখে বাকল্যাণ্ড বাঁধের উপরে আমরা সকলেই গাড়ী হইতে অবতরণ করিলাম। প্রভাত হইবার পূর্বেই দেখিলাম আমার সহকারী ভূপেশ নাগও ধৃত হইয়া আসিল।

বেলা প্রায় সাড়ে আটটার সময় আমরা পুলিশের লঞ্চে উঠিয়া যাত্রা করিলাম। কিন্তু কোথায়, তাহা জানিবার কোন উপায় ছিল না।

১৯০৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে (সম্ভবতঃ ৮ই ফেব্রুয়ারী) পরিবার হইতে, সমিতি হইতে এবং ঢাকা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া চলিলাম। ১৯০৬ সালের শেষ ভাগে ঢাকা অনুশীলন সমিতির সূত্রপাত হয়। ১৯০৭ সালের প্রথম ভাগে সমিতি স্থাপিত হয় এবং সমিতির কার্যাদিও প্রথমে ধীরে আরম্ভ হইয়া ক্রমে দ্রুতগতিতে বিভিন্ন বিভাগে বিস্তৃতি লাভ করিয়া দেশময় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। এই সমিতির কার্য-কলাপ ১৯০৮ সালে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিশেষ-ভাবেই বিচলিত করিয়া তোলে। আমাকেই ইহার মূল কল্পনা করিয়া গভর্ণমেণ্ট আমাকে নির্বাসনে পাঠাইয়া দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার অনুশীলন সমিতিকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলেন।

প্রায় দ্বিপ্রহরে আমাদের লঞ্চ চাঁদপুরের নিকটবর্তী হইলে কয়েকজন খালাসী বোটে চড়িয়া ডাঙ্গায় যাইয়া প্রয়োজনীয় কিছু

কিছু জিনিষপত্র ক্রয় করিয়া আনিল। মিঃ লোম্যান—যিনি আমাদের পরিদর্শকরূপে যাইতেছিলেন, আমার ও ভূপেশ নাগের সম্মুখে কিছু কলা, কমলা ইত্যাদি ফল রাখিয়া বলিলেন, এই ফলগুলি এখন খাইতে থাক এবং যখনই প্রয়োজন হইবে বিনা দ্বিধায় চাহিয়া লইও। অবশ্য আমাদের চাহিবার প্রয়োজন হইত না, ফলগুলি নিঃশেষ হইবার পূর্বেই আরও প্রচুর ফল আমাদের সম্মুখে দেওয়া হইত।

পরে মিঃ লোম্যান আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ দিয়া বিশুদ্ধ হিন্দু পদ্ধতিতে রন্ধন করিয়া দিলে আমাদের উহা গ্রহণ করিতে আপত্তি আছে কিনা।

ভূপেশ দৃঢ়তার সহিত জানাইল যে, ম্লেচ্ছ-আরোহীযুক্ত লঞ্চে সে কিছুতেই অন্নগ্রহণ করিবে না। ভূপেশ নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং বিজয় গোস্বামীর ভক্ত ও তাঁহার পুত্রের শিষ্য ছিল। খাদ্যাখাদ্য ও ধর্মসংস্কারাদি সম্পর্কে সে অতি তীব্রভাবেই নিষ্ঠাপরায়ণ ছিল।

চাঁদপুর হইতে ছাড়িয়া লঞ্চ অবিরামভাবে চলিতে লাগিল। সন্ধ্যার প্রাক্কালে আমাদিগকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কেবিনে লইয়া যাওয়া হইল। দেখিলাম পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন শয্যা পূর্বেই প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে। আহারাদি শেষ করিয়া শুইয়া পড়িলাম। আমাদের কেবিনের দরজা খোলা রাখা হইল এবং দুইজন সশস্ত্র গুর্খা তথায় পাহারার জন্য দণ্ডায়মান ছিল।

পরের দিন অতি প্রত্যুষে জাগরিত হইলাম। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে লঞ্চের সম্মুখভাগে রক্ষিত আমাদের নির্দিষ্ট আরাম-কেদারায় যাইয়া বসিলাম। তখন দেখিতে পাইলাম যে, আমাদের লঞ্চের পাশাপাশি অপর একখানি লঞ্চও চলিতেছে। উভয় লঞ্চের

সাহেবগণই উভয় লঞ্চে যাওয়া-আসা করিতেছে ইহাও দেখিতে পাইলাম।

কিছুক্ষণ পরে এক সাহেব আমাদিগকে জানাইলেন যে, বরিশাল হইতে অশ্বিনীবাবু ও তাঁহার এক সহকর্মীকে গ্রেপ্তার করিয়া আনা হইয়াছে; তাঁহারা পাশের লঞ্চেই আছেন। কিন্তু সেই লঞ্চে স্থান কম বলিয়া ঠিক করা হইয়াছে যে, তাঁহারা আসিয়া দিনে দুইবার আমাদের লঞ্চে পায়চারী করিয়া যাইবেন। কিন্তু আমরা যেন তাঁহাদের সহিত কোনরূপ কথাবার্তা না বলি।

এদিকে ভূপেশ অন্ন গ্রহণ করিতেছে না দেখিয়া সাহেবগণ প্রমাদ গণিলেন। তাহাদের একজন আসিয়া আমাকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিলেন যে, অশ্বিনীবাবু বলিলে ভূপেশ নাগ অন্ন গ্রহণ করিবে কিনা!

আমি বলিলাম, করিলে করিতেও পারে!

অশ্বিনীবাবু ও তাঁহার সহকর্মীকে আমাদের সম্মুখে লইয়া আসা হইল। দেখিলাম সহকর্মীটি আর কেহই নহেন বরিশাল ব্রজমোহন কলেজের প্রধান অধ্যক্ষ সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। তিনি বরিশাল অনুশীলন সমিতির প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং সমিতি সংক্রান্ত আলোচনার জন্য ঢাকা যাইয়া আমার সহিত কয়েকবার সাক্ষাতও করিয়াছিলেন।

দেখা গেল, অশ্বিনীবাবুর অনুরোধেও ভূপেশ অন্ন গ্রহণে রাজী হইল না। কিন্তু বহু যুক্তি-তর্কের পর এইরূপ জানাইল যে, প্রয়োজন হইলে ঔষধ সেবনে আপত্তি করিবে না। বরিশাল হইতে একজন বাঙ্গালী ডাক্তারকে আমাদের সঙ্গে লওয়া হইয়াছিল, যে চারিদিন আমরা লঞ্চে ছিলাম, প্রত্যহই তিনি ভূপেশকে ঔষধ দিয়া যাইতেন।

আমাদের লঞ্চ দুইটি ক্ষুদ্র নদীপথে চলিতে চলিতে ক্রমে সুন্দরবনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বৃহৎ নদীর মধ্যে পড়িল।

পরের দিন প্রভাতে উঠিয়া দেখি আমাদের লঞ্চটি এক সংকীর্ণ খালের মধ্যে মাটিতে আটকাইয়া গিয়াছে। কোন লোক কিম্বা গৃহাদি দেখিলাম না বটে, কিন্তু মনে হইল তথায় নিশ্চয়ই মানুষের পদার্পণ হইয়া থাকে এবং নিকটেই লোক বসতিও আছে।

প্রায় অর্ধঘণ্টা পরে জোয়ারের জলে খাল পূর্ণ হইলে ছোট লঞ্চটিকে বড় লঞ্চটির সহিত শিকল ও মোটা রজ্জু সাহায্যে বাঁধিয়া গভীর জলে নামাইয়া দেওয়া হইল। ক্রমে উভয় লঞ্চই পূর্বের মত চলিতে আরম্ভ করিল। নিবিড় অরণ্যমধ্যস্থ আঁকা-বাঁকা নদীর মধ্য দিয়া যাইবার সময় পথের উভয় পার্শ্বেই রৌদ্রসেবনরত বহু কুম্ভীরও দেখা গেল। লোম্যান সাহেব বন্দুকসহ শিকারে মাতিয়া গেলেন। বন্দুকের শব্দে কুম্ভীরগুলি ঝুপ্‌ঝাপ্‌ শব্দে জলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে লাগিল।

পরের দিন প্রভাতে আমাদের জন্য রক্ষিত পূর্ব নির্দিষ্ট ইজিচেয়ারে যাইয়া বসিয়া আছি এমন সময় শুনিতে পাইলাম যে, লোম্যান সাহেবের প্রশ্নের উত্তরে খালাসীদের একজন বলিল যে, আমরা মেটিয়াবুরুজে আসিয়াছি। বুঝিতে পারিলাম যে, কলিকাতা আসিয়াছি। এই সময়ে আমাদের লঞ্চটিকে পর্দা দিয়া ঢাকিয়া দেওয়া হইল এবং কিছুক্ষণ পর তীরে না ভিড়াইয়া নদীর মধ্যেই একস্থানে নোঙ্গর ফেলিয়া লঞ্চটিকে রাখা হইল। সেখানে একজন উচ্চপদস্থ পুলিশ কর্মচারী আসিয়া আমাদের প্রয়োজন মত বিছানাপত্র ইত্যাদি যাবতীয় জিনিস দিয়া গেলেন।

সন্ধ্যার পরে হাওড়া ষ্টেশনে লঞ্চ হইতে অবতরণ করিয়া পুলিশের

নির্দেশ মত একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর ট্রেণের কামরায় উঠিয়া বসিলাম। মধ্যের আসনে আমার জন্য এবং দুই পার্শ্বের দুই আসনে মিঃ লোম্যান ও ক্যাপ্টেনের জন্য শয্যা প্রস্তুত ছিল। আমি গাড়ীতে উঠিলাম কিন্তু ভূপেশ কিম্বা অশ্বিনীবাবুর কি হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না।

যে দুইদিন গাড়ীতে ছিলাম লোম্যান সাহেব নানাবিধ আলাপ-আলোচনা, কৌতুক করিয়া আমাকে সর্বদাই হাসি-খুসী রাখিতে চেষ্টা করিতেন। রাজনৈতিক প্রসঙ্গও মাঝে মাঝে উঠিত বটে, কিন্তু মিঃ লোম্যান অতি সতর্কতার সহিতই ঐ প্রসঙ্গ বন্ধ করিয়া দিতেন। যদিও আমার নিকট হইতে কোন গুপ্ত সংবাদ জানিবার জন্য পীড়াপীড়ি করেন নাই, তথাপি মিঃ লোম্যান আমাকে একবার কথায় কথায় বলিয়াছিলেন যে, এলেন সাহেবকে গুলী করা সম্পর্কে প্রকৃত ঘটনা যদি আমাকে জানাইতে পার, তাহা হইলে এই মুহূর্তেই তোমাকে তোমার বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া যাইব।

দুইদিন পর অপরাহ্নে লাহোরে পৌঁছিলাম এবং সে স্থান হইতে সন্ধ্যার পর ট্রেণে উঠিয়া প্রায় মধ্য রাত্রিতে মণ্টগোমারী ষ্টেশনে নামিলাম। ষ্টেশন হইতে এক্কাগাড়ীতে ও তৎপরে কিছু পথ হাঁটিয়া মণ্টগোমারী জেলের দরজায় পৌঁছিলাম।

ইতিমধ্যে জেল-দারোগা আসিয়া পড়িলেন এবং মিঃ লোম্যান তাঁহাকে কিসব বলিলেন। তিনি আমার দিকে ও সাহেবদের দিকে বার কয়েক তাকাইয়া আমাকে নির্দেশ দিলেন, দাঁড়াও।

আমি দাঁড়াইয়া রহিলাম।

মণ্টগোমারী জেল

জেল-দারোগার নির্দেশ অনুসারে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবার পর তিনি আমাকে জেলের অভ্যন্তরে লইয়া গেলেন। বিরাটায়তন মণ্টগোমারী জেলটি পুরাতন জেল, নূতন জেল এবং জেনানা জেল এই তিনভাগে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেকটি জেলই ভিন্ন ভিন্নভাবে প্রাচীরে বেষ্টিত ছিল। এই বিরাট প্রাচীরের এক কোণে জেলের সূত্রধরশালা এবং উহার সম্মুখে জেলের সমস্ত স্পর্শ বাঁচাইয়া ইউরোপীয় কয়েদীগণের আবাসগৃহ ছিল।

পরের দিন প্রাতে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া সামান্যভাবে প্রাথমিক আলাপাদি করিলেন এবং বাংলা, পাঞ্জাব প্রভৃতি স্থানের বিপ্লবী আন্দোলনের তীব্র নিন্দা করিলেন। বলিলেন, লাজপৎ রায় এবং অজিত সিংহকে অন্তরীণ করিবার পরই পাঞ্জাবের অবস্থা ঠিক হইয়া গিয়াছে এবং বাংলাও শীঘ্রই ঠিক হইয়া যাইবে। তিনি সতর্ক করিয়া আরও বলিলেন যে, তোমরা ইংরাজের বিরুদ্ধে বিপ্লব করিতে গিয়া নিতান্তই ভুল করিয়াছ, পাথরের উপর মাথা ঠুকিতে গেলে পাথরের কিছুই হয় না, মাথা-ই ফাটিয়া যায়।

আমার বিশেষ কিছুই বলিবার ছিল না। কিন্তু আমি বিপ্লবী নই —শুধু যুবকদিগকে আত্মরক্ষার কৌশলাদি শিখাইতেছিলাম মাত্র—এই কথাটি সাহেবকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার বক্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন যে, আত্মরক্ষার জন্য তোমরা কেন চেষ্টা করিবে? সে অধিকার তোমাদের নাই। তোমাদিগকে বিপদের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য গভর্ণমেণ্টই আছে।

জামালপুরের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কথা উল্লেখ করিয়া আমি বলিলাম যে, সেখানে অত্যাচারী মুসলমানগণকেই গভর্ণমেণ্ট সহায়তা করিয়াছে, অত্যাচারিত হিন্দুদের রক্ষার ব্যবস্থা করে নাই।

উত্তেজনাবশতঃ সাহেব সহসা বলিয়া ফেলিলেন যে, মুসলমানগণ তোমাদের মত গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করে না।

পরে একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এই প্রসঙ্গেই আমাকে সতর্ক করিয়া বলেন যে, জানিয়া রাখিও, তোমাকে কারাগার হইতে কোনদিনই মুক্তি দেওয়া হইবে না। যাহারা বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ করে তাহাদের জন্য এই পৃথিবীতে দুইটি মাত্র স্থান আছে একটি জেলখানা, অপরটি ভারতবর্ষের বাহিরে নির্বাসন।

অপর একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট উত্তেজিতভাবে আমাকে গালাগালি করেন। তিনি বলেন যে, তোমরা শৃঙ্খলার মধ্যে বিশৃঙ্খলা আনিয়া সমস্তই ওলট-পালট করিয়া দিতে চাও, তোমরা পাজি, বদমাইস, গুণ্ডা, চোর, ডাকাত······ইত্যাদি।

সাহেবের কথা শুনিয়া আমার আপাদমস্তক জ্বলিয়া উঠিল। তবু উত্তেজনা দমন করিয়া শান্তভাবে জবাব দিলাম যে, আমি এখন অসহায়-ভাবে তোমাদের হাতে বন্দী, তোমার যাহা ইচ্ছা হয় বলিতে পার।

আমার কথায় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুতের মত ভাব দেখিলাম। ইহার পরে আর কোনওদিন এমন কুৎসিত ভাষা প্রয়োগ করেন নাই।

আর একদিন কথা প্রসঙ্গে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জানাইলেন যে, তোমরা যতই ষড়যন্ত্র কর না কেন, দেশের লোক তোমাদের চায় না। তাঁহার অভিমতের সমর্থনে তিনি পাঞ্জাবের একজন বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ীর কথা উল্লেখ করেন। ঐ ব্যবসায়ী ভদ্রলোকের অভিমত যে, বৃটিশ কর্মচারীগণ না থাকিলে দেশীয় কর্মচারীদের অত্যাচারেই দেশবাসীগণ জলিয়া-পুড়িয়া মরিত, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট যেন এই দেশকে দেশীয় কর্মচারীদের অত্যাচারের অধীনে ফেলিয়া না রাখে।

একদিন আমার নিষেধ সত্বেও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার রন্ধনের সীমানার অভ্যন্তরে গিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। আমি রাগ করিয়া পাচককে সমস্ত আহার্য্যদ্রব্য ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম। নিকটস্থ কোন কোন কয়েদী কেহ বা পাচকের নিকট হইতে চাহিয়া, কেহ বা মাটী হইতে কুড়াইয়া ঐ খাদ্যের কিছু কিছু অংশ গ্রহণ করে।

পরের দিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ক্রোধোন্মত্ত মূর্তিতে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, বাবু কাল তুমি খাও নাই কেন?

আমি জবাব দিলাম, কারণ কাল তুমি আমার আপত্তি সত্বেও আমার রান্নার স্থানে গিয়াছিলে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রাগতস্বরেই পুনরায় বলিলেন যে, আমি তোমার রান্নার স্থানে যাই নাই। এই কথা বলিয়া তিনি তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে আমার পাচককে ডাকিলেন। পাচকটী একজন কয়েদী, অতএব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কথায় সায় দিবে ইহাই প্রত্যাশিত ছিল। কিন্তু পাচকটী ভয়ে ভয়ে বলিল, হাঁ সাহেব, তুমি গিয়াছিলে।

সাহেব ক্রোধ বিস্ফারিত লোচনে কিছুক্ষণ পাচকের দিকে চাহিয়া থাকিয়া আমাকে বলিলেন, যাহা হউক, না খাইয়া থাকিলে তুমি নিজেই কষ্ট পাইবে। কিন্তু জেলের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কয়েদীগণকে তোমার আহার্য্য দ্রব্য কেন দিয়াছ? ইহা যে গুরুতর অপরাধ তাহা তুমি অবশ্যই জান।

আমি বলিলাম, আমি কাহাকেও কিছু দেই নাই, কেহ যদি কুড়াইয়া লইয়া থাকে, তাহার জন্য আমি দায়ী হইতে পারি না। আমি পাচককে সমস্ত খাদ্যই ফেলিয়া দিতে বলিয়াছিলাম।

সাহেব এইবার বলিলেন, ঐ সব কুসংস্কার ছাড়িয়া দাও; দেখ না তুমি আর আমি একই আকাশের নীচে আছি, তবে এই মিথ্যা পার্থক্য কেন?

আমি জবাব দিলাম, যদি পার্থক্য না-ই থাকে তবে তোমরা শাসক ও আমরা শাসিত ও পদদলিত কেন?

সাহেব বলিলেন, কারণ আমরা শ্রেষ্ঠ ও যোগ্যতম।

আমিও বলিলাম, সেই শ্রেষ্ঠ যোগ্যতা অর্জন করিতে হইলে জাতীয় গৌরবের বৈশিষ্টও অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত রাখিতে হয়। হিন্দুগণের পক্ষে অহিন্দুগণের সংস্পর্শে আহারাদি না করা সেই গৌরবেরই একটী লক্ষণ মাত্র।

এই ঘটনার পর সাহেব কিছুদিন আমার কাছে আসিতেন না। শুনিয়াছি আমার পাচক তাহার প্রাপ্য ১৫ দিনের কারাবাসের অব্যাহতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল।

মণ্টগোমারী জেলে থাকাকালে আমি তিনবার অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম। প্রথমবারে আমাশয়, পরে টাইফয়েড ও ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়াছিলাম। বিভিন্ন সময়ে অসুস্থ অবস্থায় আমি তিনজন জেল

ডাক্তারের সংস্পর্শে আসিয়াছিলাম। তাহারা পর্যায়ক্রমে আমার চিকিৎসা করিয়াছিলেন—তন্মধ্যে দুইজন ছিলেন মুসলমান ডাক্তার আর একজন তরুণ বয়স্ক হিন্দু ডাক্তার। তাঁহাদের চিকিৎসার আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ হইয়াছিলাম।

জেল-দারোগা এবং অন্যান্য হিন্দু জেল-কর্মচারীগণ সুযোগ পাইলেই আমাকে বলিত যে, ইণ্ডিয়া গভর্ণমেণ্ট তোমার জন্য মাসিক ১৫০৲ টাকা এবং বাড়ীতে তোমার স্ত্রীর জন্য মাসিক ৪০৲ টাকা ধার্য করিয়া দিয়াছেন। তুমি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট তোমার খাদ্য, পরিচ্ছদ ও আরামের জন্য কিছুই চাওনা কেন? সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট তোমার জন্য যৎ-সামান্য ব্যয় করিয়া বাকী সবই আত্মসাৎ করে।

আমি লক্ষ্য করিয়া দেখিয়াছি যে, যদি কদাচিৎ কোনও কিছু ভাল প্রয়োজনীয় জিনিষ চাহিতাম, তাহা হইলে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মহাশয় আক্রোশের সুরে বলিতেন যে, তুমি ত মাত্র কুড়ি টাকা বেতনে চাকুরী করিতে, তোমার এত আরামের দাবী করিবার কারণ থাকিতে পারে না।

যাহা হউক, শেষ পর্যন্ত এক পাঠান ওয়ার্ডারের প্রচেষ্টায় আমার আহারের খুব সুবন্দোবস্ত হইল। বিভিন্ন পুষ্টিকর আহারের ফলে শেষে এরূপ অবস্থা হইয়াছিল যে, সর্বদাই শরীরে পরিপূর্ণ তৃপ্তির আনন্দ অনুভব করিতাম। যে-সময়ে আমি জেলে যাই, তখন আমার দেহের ওজন ছিল ১০৪ পাউণ্ড; বৎসরাধিক কাল পরে মুক্তিলাভের সময় আমার ওজন বাড়িয়া ১৪৮ পাউণ্ড হইয়াছিল।

মণ্টগোমারী জেলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ইউরোপীয় পরিদর্শক আমাকে দেখিতে যাইতেন। ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেট ব্যতীত একজন পাঞ্জাবী মুসলমান ম্যাজিষ্ট্রেটও দুইবার আমাকে দেখিতে গিয়াছিলেন।

তাঁহারা প্রত্যেকেই আমার সহিত অতি ভদ্রভাবে কথা বলিতেন এবং আমার কোন অসুবিধা হয় কিনা আগ্রহের সহিত জানিতে চাহিতেন।

ইউরোপীয় ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট আমি বলিয়াছিলাম যে, সময় ভালভাবে কাটাইবার জন্য কিছু পুস্তকের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। তিনি জানান যে, বাংলা পুস্তক দেওয়া সম্পর্কে কিছু বিধিনিষেধ আছে, তবে তোমাকে ইংরাজী ও হিন্দী পুস্তক দেওয়া যাইতে পারে। পরের দিন সাহেব একটি তুলসী দাসের রামায়ণ নিজে হাতে করিয়া আমাকে দিয়া যান। তাহার পরে মূল মহাভারতের একটি ইংরাজী অনুবাদও পাইয়াছিলাম। আমি একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট 'কনিক-সেকশন্', কেলকুলাস্ প্রভৃতি বি, এ, অনার্স কোর্সের গণিতের পুস্তকাদি চাহিয়াছিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট চোখ রাঙ্গাইয়া বলিয়া উঠিলেন, না, না, গণিত সম্পর্কিত কোন পুস্তকই তোমাকে দেওয়া হইবে না।

চার-পাঁচ মাস অতীত হওয়ার পর কলিকাতার স্বনামখ্যাত পুলিশ কর্মচারী পূর্ণ লাহিড়ী মণ্টগোমারী জেলে আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের সুরে আমাকে বলেন যে, আপনিইত ভদ্রলোক ঘটিত ডাকাতীর প্রথম প্রবর্তক? বাঢ়ড়া ডাকাতীই ভদ্রলোক ঘটিত প্রথম ডাকাতী! আপনিই যুবকগণকে কৃত্রিম যুদ্ধের ভিতর দিয়া যুদ্ধবিদ্যা শিখাইয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতেছিলেন! আপনার শিষ্যইত এলেন সাহেবকে গুলী করিয়াছিল? আপনিই অনুশীলন সমিতির সৃষ্টিকর্তা ও পরিচালক?

এত সব প্রশ্নের একমাত্র উত্তর আমার ছিল 'জানি না'।

একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে বলিয়াছিলাম যে, সব সময় পড়িতে

ভাল লাগে না এবং দুই চারখানা বই যা দিয়াছ, তাহাত শেষ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং সময় কাটাইতে লিখিবার জন্য টেবিল, দোয়াত, কলম, কাগজ প্রভৃতির ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। পরের দিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া বলিলেন যে, তুমি যদি তোমার সমিতির সাংগঠনিক ইতিহাস ও সমিতির অনুষ্ঠিত কার্যবিবরণী লিখিয়া দিতে স্বীকৃত থাক, তাহা হইলেই তোমার লিখিবার ব্যবস্থাদি করিয়া দিতে পারি।

আমি বলিলাম যে, আমি এমন কিছুই করি নাই, যাহা দিয়া ইতিহাস লেখা যাইতে পারে। তবে যাহা কিছু করিয়াছি তাহার সমস্তই পুলিশ জানে।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আর বিশেষ কিছু না বলিয়া শুধু বলিলেন যে, আমার লেখার সরঞ্জাম দেওয়া সম্পর্কে তিনি বিবেচনা করিয়া দেখিবেন। কিন্তু সেই বিবেচনার শেষ ফলাফল আর জানা গেল না।

দিন কয়েক পরে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমাকে বলিলেন যে, তোমার সময় কাটাইবার জন্য তোমাকে একটা কাজ দিব। পরের দিন তিনি টাকার থলী প্রস্তুত করিবার জন্য কিছু জিনিসপত্র দিয়া গেলেন ও বলিলেন, সমস্ত দিন বসিয়া তুমি এই জালী নির্মাণ করিবে, তাহাতেই তোমার সময় বেশ কাটিয়া যাইবে।

ঐ জালী প্রস্তুত করিবার কৌশল শিখাইবার জন্য একজন লোক ঠিক করা হইয়াছিল। কিন্তু জেল-দারোগা আমাকে চুপি চুপি জানাইয়া গেলেন যে, তুমি ঐরূপ সাধারণ কয়েদীর কাজ করিতে স্বীকৃত হইও না, তাহাতে আমাদের জাতির অপমান হইবে।

পরের দিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট লোক লইয়া আসিলে আমি ঐ কাজ শিখিতে বা করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলাম।

একদিন একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী জেলে আমাকে দেখিতে আসেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার পরিচয় দিতে যাইয়া বলেন যে, চেহারা দেখিয়া মনে হয় যে, লোকটার শিক্ষা-দীক্ষা কিছুই নাই। কিন্তু কি করিয়া বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে সাহস পাইল?

রাজকর্মচারিটি বলিলেন, এর যে প্রচুর সংগঠন শক্তি আছে।

আমি এই প্রথম শুনিলাম যে, আমার সংগঠন শক্তি আছে। পরে অবশ্য অনেক দেশী ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গের মুখেও ঐ কথা শুনিয়াছি। ক্রমে জানিতে পারিলাম যে, সমিতি পরিচালনা সম্বন্ধে আমি যে নিয়ম প্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলাম তাহা জানিতে পারিয়া সকলে আমার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল।

বাঢ়ড়া ডাকাতী প্রভৃতি বিভিন্ন বৈপ্লবিক কর্মগুলি এইরূপ সুশৃঙ্খলভাবে সম্পাদিত হইত যে, পুলিশ শত চেষ্টা করিয়াও ইহার কোন সূত্র অনুসন্ধান করিয়া পাইত না। এবং মাত্র দেড় বৎসরের মধ্যে সমিতির শাখা-প্রশাখা যেভাবে দেশময় পরিব্যাপ্ত হইয়া নূতন প্রেরণা ও উদ্দীপনা তরুণদের মধ্যে জাগাইয়া তুলিয়াছিল, তাহাতে উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারীগণ বিশেষভাবে বিচলিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

বি, সি, চ্যাটার্জি প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ, আসাম ল-কলেজের প্রিন্সিপাল ও অন্যান্য বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের মুখেও আমি শুনিয়াছি যে, আমার রচিত নিয়ম-প্রণালী ও কর্মপদ্ধতির মধ্যে এমন কতকগুলি বিশেষত্ব ছিল, যাহার ফলে আইনকে ফাঁকী দিয়া আইন-বিরোধী কর্মে লিপ্ত থাকিয়া গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা সম্ভব হইয়াছিল। তাই গভর্ণমেণ্ট ১৪টি নূতন আইন করিতে বাধ্য হইয়াছেন এবং

'গভর্ণমেণ্ট বনাম পুলিন বিহারী দাস' নামক পুস্তকটি বাধ্যতামূলক আইন পাঠ্য-পুস্তকের অঙ্গীভূত হইয়াছিল।

একবার কলিকাতা হইতে একজন ইউরোপীয় আই, বি, কর্মচারী আমাকে দেখিতে মণ্টগোমারী জেলে আসেন। তিনি অন্যান্য প্রশ্নের পর আমার ছোট ভাইকে লেখা আমার এক চিঠি আমাকে দেখাইয়া বলেন যে, এই চিঠির পশ্চাতে কি অভিসন্ধি আছে, তাহা তিনি জানিতে চাহেন। আমি জবাব দিলাম, ইহাতে কোন অভিসন্ধিই নাই। ঐ চিঠিতে লেখা ছিল :—

আমি বাংলায় একখানা জ্যামিতি রচনা করিব, সুতরাং 'ডিগ্রী', alternate angle, reflex angle প্রভৃতি বাক্যগুলির প্রকৃত সংস্কৃত প্রতিশব্দ কি হইতে পারে তাহা যেন ঢাকা কলেজের গণিতের অধ্যক্ষ রাজকুমার সেনের নিকট হইতে জানিয়া অথবা নূতন শব্দ রচনা (coin) করিয়া আমাকে পত্রোত্তরে জানান হয়। এই coin কথাটি টিক কাটিয়া পংক্তিটির উপরে লেখা হইয়াছিল। আমার গুপ্ত অভিসন্ধি ছিল এই যে, আমি কৃত্রিম মুদ্রা প্রস্তুত করিবার (coining) যে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়াছিলাম, তাহা যেন বিশুদ্ধ-ভাবে পরিচালিত হয়।

আই, বি, কর্মচারীর কথায় আমার চমক ভাঙ্গিল, আমি বুঝিতে পারিলাম যে, ঐরূপ চিঠি লিখিয়া আমি ভুল করিয়াছি। আই, বি, অফিসের বিচক্ষণ কর্মচারীগণ তাহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি দ্বারা বুঝিয়া ফেলিয়াছে যে, এখনও আমার মনে গুপ্ত অভিসন্ধি খেলা করিতেছে।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মণ্টগোমারী জেলে এক নূতন হিন্দু ডাক্তারের আবির্ভাব হইল। পূর্বের হিন্দু ডাক্তারটিও ছিলেন বটে,

কিন্তু এই সময় আমাকে দেখিতে নূতন হিন্দু ডাক্তার ভদ্রলোকই আসিতে লাগিলেন।

একদিন সন্ধ্যা হইয়াছে মাত্র, ঘরে তালাবন্ধ হইয়াছে; ঠিক এমন সময় ঐ নূতন হিন্দু ডাক্তারটি একজন নবাগত যুবককে সঙ্গে করিয়া আমাকে দেখিতে আসিলেন। ডাক্তার পরীক্ষার ভাণ করিয়া গরাদের মধ্য দিয়া হাত বাড়াইয়া আমার নাড়ী, জিব দেখিলেন এবং শরীরে কোনও উপসর্গ আছে কিনা জিজ্ঞাসা করিলেন। পরে নবাগত যুবকটি একটি অপরিচিত নামের উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে, সে ঢাকা হইতে আসিয়াছে। আমি বলিলাম যে, আমি তাহাকে চিনি না। কিন্তু নবাগত যুবকটি এমন কতকগুলি সাঙ্কেতিক বাক্য ও ঘটনার উল্লেখ করিলেন, যাহা হইতে আমি নিশ্চিত বুঝিতে পারিলাম যে, ঢাকা হইতে শিশির গুহ নামে একটি যুবক অবশ্যই মণ্টগোমারী আসিয়াছে। নবাগত ব্যক্তিটি বলিলেন যে, আমার যদি কিছু বক্তব্য থাকে এবং আমার সহকর্মিগণ বর্তমান অবস্থায় কোন্ পথ অবলম্বন করিবে তাহা যদি আমি বলিতে চাহি তবে বিনা সঙ্কোচে তাহার নিকট বলিতে পারি। আমার সহকর্মিগণ আমার নির্দেশের প্রতীক্ষায় আছে।

আমি বলিয়া দিলাম যে, ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব পার্বত্য অঞ্চলে যে একটি গুপ্ত কেন্দ্র স্থাপনের ব্যবস্থা করিতেছিলাম বর্তমানে যেন সেইদিকে বিশেষ চেষ্টা করা হয়। ভুটানের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে 'মিস্‌মি', 'আরব' প্রভৃতি অসভ্য পার্বত্য জাতিগণের বাস। উহারা হিন্দুধর্ম মানিয়া চলে, কিন্তু ইংরাজ কিংবা ভুটান-রাজ কাহারই অধীন ছিল না। আমি ধৃত হইবার কিছু পূর্বে মাত্র ঐ সমস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করিতে শিশির গুহকে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছিলাম।

এই ক্ষেত্রেও আমি আর একটি গুরুতর ভুল করিয়া ফেলিয়াছিলাম। আমি একবার কল্পনাও করি নাই যে, সন্ধ্যার সময় তালাবদ্ধ করিবার পরে কর্তৃপক্ষের বিশেষ আদেশ ব্যতীত কোনও বে-সরকারী লোকের জেলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা সম্পূর্ণরূপেই অসম্ভব।

ঐ দিনের পর নূতন হিন্দু ডাক্তারটি আর আমাকে দেখিতে আসিতেন না।

দিন দুই পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আসিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন যে, ঢাকার নাথুবাবু তোমাকে কি বলিয়া গেল?

আমি বলিলাম যে, নাথুবাবু কে, তাহাকে আমি চিনি না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি সমস্তই গোপন করিতেছ; যাহা হউক আমরাও সতর্ক আছি।

এতক্ষণে পরিষ্কার বুঝিতে পারিলাম যে, নূতন ডাক্তারটীর জেলে আবির্ভাব গভর্ণমেণ্টেরই কুট কৌশলমাত্র এবং শিশির মণ্টগোমারীতে বন্ধু খুঁজিতে যাইয়া অজ্ঞাতসারে আই, বি, পুলিশের ফাঁদে পড়িয়া গিয়াছে।

মণ্টগোমারী জেলে বিভিন্ন কয়েদীগণের সহিত যৎসামান্য যাহা কিছু কথাবার্তা হইত, তাহা হইতে আমার এইরূপ ধারণা জন্মিয়াছিল যে, পাঠানগণ কথা-বার্তায়, ব্যবহারে এমন ভাব দেখাইতে পারে যেন বন্ধুত্বের বিনিময়ে তাহারা দেহ-মন-প্রাণ সমস্তই অকাতরে বিলাইয়া দিতে পারে। কিন্তু মুহূর্ত্তকালের মধ্যে তাহাদের প্রগাঢ় বন্ধুত্বও তীব্র নৃশংস শত্রুতায় পরিণত হইতে পারে এবং অবস্থা বিশেষে গুরুতর আক্রোশের ভাবও নিমেষ মধ্যে কোমলতায় দ্রবীভূত হইয়া যায়।

পাঠান কয়েদী ও ওঁয়ার্ডারগণের নিকট গল্পচ্ছলে একদিন শুনিয়া-

ছিলাম যে, এক গ্রামের পাঠানদিগকে অপর গ্রামের কয়েকজন পাঠান আসিয়া অবজ্ঞার সুরে বলিয়াছিল যে, তোমাদের গ্রামটা নিতান্তই জঘন্য, একটা পীরের 'দর্‌গা'-ও তোমাদের এখানে নাই। দর্‌গা অর্থ মুসলমান ধর্মজ্ঞ সাধু পুরুষের কবর। এই কথা শুনিয়া সেই গ্রামের পাঠানগণ কিছুদিন পরে দূরস্থ কোনও এক গ্রামের স্বনামখ্যাত পীরকে সসম্মানে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইয়া নিঃসঙ্কোচে হত্যা করিল এবং তাহার কবরের উপর দর্‌গা নির্মাণ করিয়া অপর গ্রামের লোকদের দেখাইয়া দিল যে, তাহাদের গ্রামেও দর্‌গা আছে।

তাহাদের মুখে আরও শুনিতে পাইলাম যে, পারিবারিক কলহের ফলে গোটা পরিবার পর্যন্ত হত্যা করিয়া নিশ্চিহ্ন করিবার দৃষ্টান্তও পাঠানদের মধ্যে আছে।

ইতিমধ্যে মণ্টগোমারী কারাবাসের মেয়াদ উত্তীর্ণ হইল। মুক্তির দিন উপস্থিত। দারোগা প্রভৃতি অফিসের কর্মচারিগণ আমাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের ঘরে লইয়া গেলেন। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখিয়া মনে হইল বিরক্তি ও আক্রোশের ভাব যেন তাঁহার মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছে। আমি তাঁহার সমীপবর্তী হইলে তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ত মুক্ত হইয়াছ, গাড়ীতে কোন্ ক্লাসে যাইবে বল? আমি ইচ্ছা করিলে তোমাকে ফার্ষ্ট কিম্বা সেকেণ্ড ক্লাসেও পাঠাইতে পারি। কিন্তু ভাবিয়া দেখিও, যদি ঐ সমস্ত উচ্চশ্রেণীর কামরায় কোনও ইউরোপীয় রাজ-কর্মচারী কিম্বা ধনী ব্যবসায়ী থাকে, তবে তাহারা তোমাকে লাথি মারিয়া গাড়ীর কামরা হইতে বাহির করিয়া দিবে।

এইরূপ ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথার কি জবাব দিব ভাবিয়া স্থির করিতে না পারিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

আমার নিকট হইতে কোন জবাব না পাইয়া সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজেই বলিলেন, আচ্ছা থার্ড ক্লাসের পরিবর্তে তোমাকে ইণ্টার ক্লাসেরই ব্যবস্থা করিয়া দিতেছি ; কেমন সন্তুষ্ট হইলে ত ?

তৎপর তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কিছু টাকা চাও ত ?

আমি জবাব দিলাম, না, চাই না।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বলিলেন, তোমাকে কিছু টাকা দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট নির্দেশ দিয়াছেন। তাই তোমাকে ২০৲ টাকা আমি দিতেছি, তোমার ছেলে-মেয়েদের জন্য কিছু কিনিয়া লইয়া যাইও।

ইহার পর সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আরও বলিলেন, এখানে তোমার ব্যবহারের জন্য যে-সমস্ত জিনিষপত্র দেওয়া হইয়াছে, তাহা তোমার সঙ্গে দিয়া দিবার জন্য গভর্ণমেণ্ট বলিয়াছেন। তুমি কি এইগুলি নিতে চাও? এবং এইগুলি নেওয়া কি তুমি সম্মানজনক বলিয়া মনে কর ? কোনরূপ অপমান বোধ করিবে না ত ?

শেষের দিকের কথাগুলি তিনি বারংবার উচ্চারণ করিলেন। আমার কথা বলিতেও বিরক্তি বোধ হইতেছিল। কিন্তু জেল-কর্মচারিগণ বারম্বারই আমাকে উত্তেজিত করিয়া চুপি চুপি বলিতে লাগিল, বল না, আমি সমস্তই লইয়া যাইতে চাই।

জবাব দিতে আমার বিলম্ব হইতেছে দেখিয়া সাহেব পুনর্ব্বার প্রশ্ন করিলেন, এইগুলি লইতে তুমি যদি অপমান বোধ কর, তাহা হইলে তোমার এই জিনিষপত্রের কি ব্যবস্থা করিব ?

অবশেষে আমি বলিলাম, গভর্ণমেণ্ট যেইরূপ নির্দেশ দিয়াছেন, সেইরূপই কর।

অনাবশ্যকভাবে কথার জের টানিয়া সাহেব আরও একবার

বলিলেন, তবে তুমি এইগুলি লইতে কোনরূপ অপমান বোধ কর না?

আমি নীরব রহিলাম। সাহেব নৈরাশ্যের সুরে বলিলেন, আচ্ছা ভাল। এই বলিয়া তিনি নিম্নস্থ কর্মচারিদের কি সব নির্দেশ দিয়া প্রস্থান করিলেন।

কিছুক্ষণ পরে একজন জেল কর্মচারী আমাকে বলিলেন যে, সাহেব নাকি বলিয়াছেন, পুলিন দাসের অবস্থায় আমি হইলে, ঐ সমস্ত দ্রব্যাদি লইতে নিতান্তই অপমান বোধ করিতাম।

অপর একজন মন্তব্য করিলেন, স্প্রিং-এর খাট ও গদীর উপরে সাহেবের বড়ই লোভ হইয়াছিল।

পরে আমার মুক্তির নির্দেশনামা সম্বলিত কাগজখানি সহকারী দারোগা আমাকে পড়িয়া শুনাইলেন। তাহাতে লেখা ছিল :—

"মুক্ত অন্তরীণ যে শ্রেণীতে যাইতে চাহিবে, যত টাকা চাহিবে, বিশেষ আরামের জন্য যাহা যাহা চাহিবে, সেই সকলের সুবন্দোবস্ত করিয়া দিতে হইবে; জেলে তাহার ব্যবহারের জন্য যে সমস্ত জিনিষ-পত্র দেওয়া হইয়াছিল তৎসমুদয়ই তাহার সঙ্গে দিয়া দিতে হইবে এবং সঙ্গে একজন ভৃত্যেরও ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে।"

কারাগারের নিয়মানুসারে সমস্ত আনুষ্ঠানিক পর্ব সমাধা করিয়া আমরা জেল-গেটের সম্মুখ হইতে যাত্রা করিবার উপক্রম করিতেছি এমন সময় সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও ইনস্পেকটার জেনারেল তথায় উপস্থিত হইলেন। ইনস্পেকটার জেনারেল মহাশয়ের নির্দেশক্রমে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার সঙ্গের কর্মচারিটিকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন যেন ইণ্টার ক্লাসের পরিবর্তে আমাকে সেকেণ্ড ক্লাসের টিকেট করিয়া দেওয়া হয়।

দুই দিন, দুই রাত্রি পথে অতিবাহিত করিয়া সকালবেলায় হাওড়া ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছিলাম। পূর্বেই আমার ছোট ভাইয়ের নিকট টেলিগ্রাম করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাই ষ্টেশনে পৌঁছিয়া দেখিতে পাইলাম যে, আমার ভগ্নিপতি এবং সমিতির কয়েকজন তরুণ সদস্য তথায় অপেক্ষা করিতেছেন। একটী ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া করিয়া তাহারা আমাকে তৎকালীন ১১২নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীটের একটী মেসে লইয়া গেলেন। সেই সময় পর্যন্ত কলিকাতায় ট্যাক্সীর প্রচলন হয় নাই।

আমি পি, মিত্রের বাড়ী যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া পদধূলি লইলাম। তিনি আমাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিলেন এবং তাঁহার পত্নী আসিয়া আমাকে আশীর্বাদ করিলেন।

পি, মিত্র জানাইলেন যে, যেদিন আমাকে লঞ্চে করিয়া কলিকাতার সম্মুখবর্তী গঙ্গাবক্ষে রাখা হইয়াছিল, সেদিনই তাঁহারা সেই সংবাদ পাইয়াছিলেন এবং লঞ্চ হইতে তুলিয়া ট্রেণে লইয়া যাইবার সময় আমাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইবার এক পরিকল্পনা নাকি তাঁহারা করিয়াছিলেন। কিন্তু তৎপর কোথায় এবং কিভাবে আমাকে লুকাইয়া রাখা হইবে, তাহার কোন সুনিশ্চিত ব্যবস্থা করা সম্ভব না হওয়ায় এই পরিকল্পনা পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

আমি মুক্ত হইয়া কলিকাতা আসিবার কিছুকাল পূর্বে মাত্র অরবিন্দ ঘোষ আলীপুর বোমার মোকদ্দমা হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছানুসারে আমি তাঁহার বাসায় যাইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করি। তিনি আমাকে বলেন যে, বিভিন্ন বিপ্লবী দলগুলি একত্র হইয়া কাজ করিতে পারিলে দেশের কল্যাণ করা সহজতর হইবে। তিনি আরও জানান যে, অনুশীলন সমিতির

একমাত্র সতীশ বাবু ব্যতীত আর সকলেই এই মত সমর্থন করিয়াছেন। তিনি এই বিষয়ে আমার মতামত জানিতে চাহিলে আমিও ঐ প্রস্তাবের সপক্ষেই মন্তব্য করিয়া বলি যে, যদি সুশৃঙ্খলভাবে কার্য-পরিচালনার ব্যবস্থা হয়, তাহা হইলে ইহাতে অমত হইবার কারণ নাই।

অরবিন্দ ঘোষ আমাকে বলেন যে, আমি যেন শীঘ্র একবার ঢাকা হইতে ঘুরিয়া পুনরায় কলিকাতায় চলিয়া আসি। তখন এই সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইবে।

সমিতি-বিস্তার

যে-দিন কলিকাতায় সুবোধ মল্লিকের বাড়ীতে বসিয়া সমিতির কার্য পরিচালনাহেতু ডাকাতী সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইল, সে-দিনই বিকালে মুন্সেফ অবিনাশ চক্রবর্ত্তীর দলের একটি যুবক (হেমেন্দ্র দাস) আমার সহিত বহুবিধ আলোচনা করিল এবং ঢাকা আসিয়া দেখিতে পাইলাম অল্পদিনের মধ্যেই সে কিছু সংখ্যক উৎসাহী যুবক সংগ্রহ করিয়া আনিল। তাহারা প্রায় প্রত্যেকেই দরিদ্র, বেকার। প্রতিদিনই আমি তাহাদিগকে অর্থাদি যোগাইতাম, তাহারা হোটেলে কিম্বা অন্যত্র আহার ও শয়নের ব্যবস্থা করিয়া লইত। প্রতিদিন রাত্রি দশটা-এগারোটা পর্যন্ত বিবিধ গুপ্ত পরামর্শ চলিত। ঐ সমস্ত যুবকের সাহায্যে সমিতির বিভিন্ন যুবকের মন পরীক্ষা করিয়া স্কুল ও কলেজের কতিপয় ছাত্রকেও এই গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলাম।

ক্রমে বারুদীর সুরেন্দ্র নাগ এবং উপেন্দ্র নাগ এই গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইল। তাহাদের বাসা আমাদের বাসার সংলগ্নই ছিল। ক্রমে পূর্বোক্ত যুবকগণ নিয়মিত পরামর্শ করিতে ও নানাবিষয়ে

আলোচনা করিতে সমবেত হইতে লাগিল। কিন্তু দেখা গেল আলোচনাদি শেষ হইতে প্রায়ই রাত্রি বেশী হইয়া পড়িত এবং তাহাদের পক্ষে যাইয়া রাত্রির আহারের সংস্থান করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হইত। তখন সুরেন্দ্র নাগ ও উপেন্দ্র নাগের মাতার অনুমতি লইয়া তাহাদের একখানা চালাঘর ব্যবহারের জন্য পাইলাম। ঘরের এক অংশে রন্ধনাদি হইত এবং অপর অংশে কয়েকজন যুবক রাত্রিতে শয়ন করিত। ইহাই সমিতি-নিবাসের সূত্রপাত। ক্রমশঃ সমিতি-নিবাসের পরিসর ও কার্যক্রম বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ও তদনুপাতে বর্ধিত হইল। কিন্তু অর্থ সংস্থানের বিশেষ কোনও সূত্র না থাকায় জাতীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা ও তত্ত্বাবধায়কের কার্য করিয়া, ছাত্র পড়াইয়া, কালীপদ বসুর পুস্তক লিখিয়া যে অর্থ পাইতাম তৎসমুদয়ই সমিতি-নিবাসের খরচের ও অস্ত্রাদি সংগ্রহের জন্য ব্যয় করিতাম।

কর্মী সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং তাহাদিগকে নানারূপ জনহিতকর কার্যে নিয়োগ করার ফলে ঢাকাবাসিগণ সকলেই ক্রমশঃ আমার ও সমিতির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া উঠিল। ইহার ফলে নানা-সূত্রে কখনও কখনও অর্থ সাহায্যও পাইতাম। কিন্তু তাহাও প্রয়োজনের তুলনায় নিতান্তই নগণ্য। কাজেই ক্রমশঃ কিছু ঋণ হইল। তাহা ছাড়া সমিতির কার্যক্রম পূর্বাপেক্ষা বাড়িয়া যাওয়ায় আমাকে বাধ্য হইয়া শিক্ষকতা ত্যাগ করিতে হইল। তাই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই একটি ডাকাতী করিয়া কিছু পরিমাণে অর্থ সংগ্রহ করিলাম এবং তাহা দিয়া ঋণ পরিশোধ করিলাম।

এই সময়েই বাঢ়্ড়া ডাকাতীতে যথেষ্ট টাকা পাইলাম। কিন্তু ইহাতে আর্থিক সুরাহা হইলেও, আর একদিকে বিপদ দেখা দিল। আমার বাড়ীর সত্ত্বাধিকারী একদিন আসিয়া বলিলেন যে, তিনি

সমিতির বিরুদ্ধে কোন অপবাদ শুনিয়াছেন, তাই তাঁহার বাড়ীতে সমিতির ছাত্রদিগকে থাকিতে দিবেন না। আমার সহকারী ভূপেশ নাগ ডাকাতীর পক্ষপাতী ছিল না, সে আমাকে ডাকাতীর জন্য তিরস্কারও করিয়াছিল। আমার বাড়ীর সত্বাধিকারী সম্পর্কে ভূপেশের ভগ্নিপতি ছিলেন।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময়ে দক্ষিণ মৈসণ্ডীতে বৃহৎ আঙ্গিনাযুক্ত একটি বড় দ্বিতল বাড়ী ভাড়া পাইলাম। তখন প্রায় সত্তরজন তরুণ কর্মী সেই বাড়ীতে থাকিবার জায়গা পাইল।

সমিতি-নিবাসের প্রধান প্রবেশ দ্বার বিশেষ কাজ বা উৎসবাদি ব্যতীত বন্ধ থাকিত। দরজায় পালা করিয়া ছেলেদের মধ্যে পাহারা দিবার ব্যবস্থা ছিল। বিনা অনুমতিতে সমিতি-নিবাসে কেহ প্রবেশ করিতে পারিত না। এমন কি সমিতির সভ্যগণও নিদর্শণপত্র বা পাস না দেখাইয়া ভিতরে প্রবেশ বা বাহিরে যাইতে পারিত না।

সমিতি-নিবাসের সভ্যগণ লাঠিখেলা ইত্যাদি করিবার সঙ্গে সঙ্গে দৈনন্দিন প্রায় সকল কাজই করিত। সভ্যগণকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকেরই মাসিক, সাপ্তাহিক ও দৈনিক কর্ম নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইত। হাট-বাজার, গৃহ-আঙ্গিনা ও নর্দমা প্রভৃতি পরিষ্কার করা, সমিতি-নিবাসে ধূপ-দীপাদির যথাযোগ্য সুব্যবস্থা ইত্যাদি যাবতীয় কর্মই সভ্যগণ যথানির্দিষ্ট সময়ে সম্পাদন করিত। ভোর পাঁচটায় ঘণ্টা বাজাইয়া সভ্যগণকে ঘুম হইতে জাগাইয়া দেওয়া হইত। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনান্তে পৌণে ছয়টার সময় সমিতি-নিবাসের প্রশস্ত আঙ্গিনায় সকলে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া সমস্বরে স্তোত্র পাঠ করিত। দশাবতার স্তোত্র, গুরুর স্তোত্র, ভগবতী, সরস্বতী, শিব, নারায়ণ, মাতৃভূমি সম্পর্কিত বিভিন্ন স্তোত্র বিভিন্ন

দিনে পাঠ করা হইত। পরে প্রত্যেক সভ্যই নির্দিষ্ট পরিমাণ আদা, লবণ, ছোলা, গুড়, কাঁচা হলুদ প্রভৃতি আহার করিত। এবং তৎপর সভ্যগণ তাহাদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব অনুযায়ী কাজে লাগিয়া যাইত। পরে দ্বিপ্রহরে নিকটস্থ কোন না কোন পুষ্করিণীতে যাইয়া স্নান সারিয়া আহারাদি করিত এবং আহারের পর অর্ধঘণ্টা বিশ্রামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল। সেই অবসর সময়ে সভ্যগণ পরস্পরের সহিত মন-প্রাণ খুলিয়া আলাপ-আলোচনা করিতে পারিত।

আমি সাধারণতঃ সকলের আহার না হইলে আহার করিতাম না। কোন বিশেষ কারণে বা কার্যোপলক্ষে কেহ সমিতি-নিবাসের বাহিরে গেলে সে ফিরিয়া আসিয়া আহার না করা পর্যন্ত আমিও আহার্য গ্রহণ করিতাম না। আহারাদি সম্পর্কে আমি কঠোরভাবে নিয়ম করিয়া দিয়াছিলাম যে, আহারের সময় কাহারও প্রতি যেন কোনওরূপ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করা না হয়। এমন কি কাহারও বাড়ী হইতে কোন বিশেষ খাবার প্রস্তুত করিয়া পাঠাইলে সমান অংশে সকলকে ভাগ করিয়া দিতে হইত। বস্তুতঃ সমিতি-নিবাসের কর্মিগণ কঠোর নিয়ম ও শৃঙ্খলা মানিয়া চলিত।

সমিতি-নিবাসের নাম রাখা হইয়াছিল 'বজ্রপুরী' এবং কর্মিগণও নিজেদের 'বজ্রী' বলিয়া পরিচয় দিতে গর্বানুভব করিত। দধীচি মুনির অস্থি দ্বারা বজ্র নির্মিত হইয়াছিল, তাই বজ্র ত্যাগের চূড়ান্ত নিদর্শন এবং দেবরাজ ইন্দ্র স্বয়ং দৈত্য সংহার কার্যে বজ্র প্রয়োগ করিয়াছিলেন, তাই বজ্র শক্তির জ্বলন্ত নিদর্শন।

সমিতি-নিবাসের সভ্যগণ খেলাধুলায় বা অন্যান্য কাজেই শুধু ব্যাপৃত থাকিত না, পড়াশুনায়ও তাহাদের সমান আগ্রহই ছিল এবং পড়াশুনার যথাযোগ্য পরিবেশ সৃষ্টি করিয়াও দেওয়া হইত।

সমিতি-নিবাসের সভ্যদের ব্যবহারের জন্য বিভিন্ন বিষয়ক প্রায় ১৭ শত পুস্তক সংগ্রহ করা হইয়াছিল। তন্মধ্যে গীতা, রামায়ণ, মহাভারত, অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ, বঙ্কিম সাহিত্য, সামাজিক, রাজনৈতিক গ্রন্থাদি, জীবনী, ইতিহাস, চিকিৎসা সম্পর্কিত বিভিন্ন শ্রেণীর পুস্তক ছিল। রাজনৈতিক পুস্তকাদির মধ্যে যেগুলি আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্যের পরিপন্থী সেই বিষয়গুলি সভ্যদের বুঝাইয়া পরিত্যাগ করিতে নির্দেশ দেওয়া হইত।

দ্বিপ্রহরে কখনও কখনও আমি নিজেই তাহাদের সহিত লাঠি, ছুরি বা যুযুৎসুর ক্রীড়াদি করিতাম। কোন কোন দিন ধর্ম, সংযম, নিয়মানুবর্তিতা, মিতব্যয়িতা ইত্যাদি সম্পর্কে উপদেশ দিতাম।

বিকালে ড্রিলের পর সভ্যগণ নিজেদের মধ্যে হাসি-গল্প ইত্যাদি করিতে পারিত। সন্ধ্যার সময় সঙ্গীত চর্চার বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। যাহারা গান করিতে জানিত তাহাদিগকে স্বদেশী সঙ্গীত গাহিতে হইত।

রাত্রির আহারের পর সভ্যগণকে ১০ ঘটিকার মধ্যে শয্যা গ্রহণ করিতে হইত।

আমাদের সমিতি-নিবাসের কার্যক্রম প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত এমন নিয়ন্ত্রিত ছিল যে, আমার মোকদ্দমা উপলক্ষে বিভিন্ন সাক্ষীদের নিকট হইতে প্রসঙ্গক্রমে সমিতি-নিবাসের বর্ণনাদি শুনিয়া বিচারপতি স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কোর্টের মধ্যেই বলিয়াছিলেন "Then Pulin must be a laudable man"—পুলিন তবে অবশ্যই শ্লাঘনীয় ব্যক্তি।

সভ্যগণের সাহস ও আনুগত্য পরীক্ষা

সমিতি-নিবাসের সভ্যগণের—বিশেষতঃ অল্পবয়স্কগণের কর্ম-প্রবণতা, দুঃসাহসিকতা এবং আনুগত্য ইত্যাদি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে সময় সময় বিভিন্ন কৌশল অবলম্বিত হইত। কাহাকেও দুই চারি দিবসের জন্য এইরূপ কোনও কর্মে নিযুক্ত করা হইত যাহাতে সে কোনরূপ আনন্দ বা তৃপ্তি অনুভব করিত না; কাহাকেও বা একাকী নির্জন স্থানে কোনও কাজের দায়িত্ব দিয়া পাঠান হইত যাহার কোন প্রয়োজন সে মোটেই উপলব্ধি করিতে পারিত না।

সমিতির কার্যের জন্য এবং যুবকগণের শিক্ষার জন্যও সাত-আটখানা সাইকেল সংগ্রহ করিয়াছিলাম। কখন কখন সাইকেল থাকা সত্ত্বেও কোন কোন যুবককে—তাহার মতি-গতি ও আন্তরিকতা পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বহু দূরের রাস্তা পদব্রজে যাইয়া কর্ম সম্পাদনের জন্য বলা হইত। আবার কাহাকেও বা কয়েকদিনের জন্য তাহার প্রিয় কোনও বন্ধুর নিকট হইতে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে বলা হইত।

এই সমস্ত আদেশ আপাত দৃষ্টিতে অকারণ ও হেঁয়ালীপূর্ণ মনে

হইলেও সভ্যদের মধ্যে কেহ কখনও কোনরূপ প্রশ্ন না করিয়া সৈনিক-সুলভ শৃঙ্খলা রক্ষা করিত এবং পরিপূর্ণভাবে এই সব নির্দেশ মানিয়া চলিত। কখনও কখনও আমাদের নির্দেশ পালন করা সাধ্যাতীত জানিয়াও যে সকল সভ্য বিনা দ্বিধায় তাহা সম্পাদন করিবার জন্য স্বীকৃতি জানাইত, তাহাদিগকে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই উহা করিতে দেওয়া হইত না। কারণ সাহস ও দায়িত্ববোধ পরীক্ষা করা-ই ছিল আমাদের আসল অভিপ্রায়, সংশ্লিষ্ট কাজটি উপলক্ষ্য মাত্র।

তরুণ কর্মিদের মধ্যে এইরূপ কর্মচাঞ্চল্য জাগ্রত হইয়াছিল যে, আমাদের এত বিভিন্নপ্রকার নির্দেশের ফলে তাহাদের মধ্যে কোনরূপ বিরক্তির ভাব প্রকাশ পাইত না, বরং কাহাকেও অপেক্ষাকৃত কম কাজ করিতে দিলে তাহারা অভিযোগ জানাইত। সকলের মনেই এমন একটা ধারণা ছিল যে, ন্যস্ত দায়িত্ব যেন সুসম্পাদিত হয় এবং কেহ কোনরূপ ত্রুটি ধরিতে না পারে।

মানুষ মানুষই—ভগবানও নয়, দেবতাও নয়। সুতরাং তাহাদের মধ্যে দোষগুণ অবশ্যই থাকিবে। বিশেষতঃ অপরিণতবুদ্ধি বালক ও যুবকগণের সকল সময় পরিপূর্ণভাবে দোষগুণের বিচার করিয়া সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ থাকা সম্ভব নহে। তথাপি সতর্কতার সহিত তাহাদের অন্তরালে এমন পরিচালনার হস্ত থাকা প্রয়োজন, যাহাতে তাহারা এই কথা উপলব্ধি করিতে না পারে যে, তাহাদিগকে পরিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করা হইতেছে না।

সমিতি-নিবাসে কোনরূপ ধূমপান, মাদক দ্রব্য যথা—তামাকু, দোক্তা, তাম্বুল ইত্যাদি সেবন সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কখনও কখনও কোন কোন যুবকের মধ্যে নিষিদ্ধ মাদক দ্রব্যের প্রতি প্রবণতা ধরা পড়িত, তদ্ভিন্ন বালসুলভ চপলতায় লঘু-গুরু দুর্নীতিও

প্রকাশ হইয়া পড়িত। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে লঘু-গুরু শাস্তিরও ব্যবস্থা ছিল। যথা—

প্রথম শাস্তি: একদিন আলুণী (লবণ ব্যতীত) ভাত খাইতে হইবে। অপরাধ অনুসারে একদিন হইতে সাতদিন পর্যন্ত এই মেয়াদ বাড়ান যাইবে।

দ্বিতীয় শাস্তি: বালিশ ব্যতীত রাত্রিতে শয়ন করিতে হইবে।

তৃতীয় শাস্তি: প্রিয় বন্ধুর সহিত কিছুদিনের জন্য সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিতে হইবে।

চতুর্থ শাস্তি: কিছুদিনের জন্য কাহারও সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করা যাইবে না। আহার ও নির্দিষ্ট কর্মাদি অবশ্য যথারীতি করা চলিবে।

পঞ্চম শাস্তি: একদিন বা দুইদিনের জন্য কোনও নির্জন স্থানে বন্দী অবস্থায় থাকিতে হইবে। আহারাদি করা যাইবে বটে, কিন্তু কোন কাজ-কর্ম করিতে দেওয়া হইবে না। (কোন সভ্যকে কাজ করিতে না দিলে তাহারা ইহাকে চরম শাস্তি বলিয়া মনে করিত।)

ষষ্ঠ শাস্তি: শুধু দুর্নীতি (চরিত্রহীনতা) সম্পর্কে বারম্বার দোষ প্রমাণিত হইলে, অবশেষে করতলে দশটি বারটি চাবুক মারা হইত। (এই শাস্তি দেওয়া কদাচিৎ প্রয়োজন হইত।)

সমিতির পরিব্যাপ্তি

সমিতি-নিবাসের দ্বিতলের যে কক্ষে আমি শয়ন করিতাম, সেই কক্ষেই সাধারণতঃ দ্বিপ্রহরে রাইফেল, রিভলবার, অসি ইত্যাদির প্রয়োজন মত সংস্কারাদি হইত। এই সকল অস্ত্র ব্যবহারের কৌশলও নূতন সভ্যদের সেই স্থানেই দেখান হইত। সীসক গলাইয়া ছাঁচে ঢালিয়া 'বুলেট' তৈয়ারী, শূন্য খোলের মধ্যে বারুদ, ক্যাপ ও বুলেট ভরিয়া মেসিনের চাপে কার্ট্রিজ প্রস্তুতও ঐ ঘরেই হইত। কিন্তু এই সমস্ত কার্যগুলি এইরূপ সুকৌশলে সম্পন্ন হইত যে, সমিতি-নিবাসের সাধারণ সভ্যগণও ঐ সম্পর্কে কিছুই জানিতে কিম্বা বুঝিতে পারিত না। এই সমস্ত অস্ত্রাদি সমিতি-নিবাসের বিভিন্ন গুপ্ত স্থানে থাকিত। কিন্তু প্রধানতঃ শঙ্খনিধি লালমোহন সাহার উয়ারীস্থ বাগান-বাটীর মধ্যে ভূগর্ভস্থ এক গুপ্ত কক্ষেই এইগুলি রাখা হইত, যদিও নির্দিষ্ট দিনে ও নির্দিষ্ট সময়ে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে সমিতি-নিবাসে ঐগুলি রাখা হইত না।

বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলনের প্রভাবে দেশব্যাপী এইরূপ অপ্রত্যাশিত প্রেরণা জাগিয়াছিল এবং বাংলাদেশের তরুণদের উপর উহা এমন

প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল যে, যুবকগণ সত্যসত্যই মনে-প্রাণে অনুভব করিতে আরম্ভ করিল, তাহাদিগকে স্বাধীন হইতেই হইবে। তাহারা ইহাও বিশ্বাস করিত যে, একমাত্র অনুশীলন সমিতির কার্যক্রমই তাহাদিগকে স্বাধীনতার পথে লইয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন ঘটনা-চক্রে দেশবাসিগণের মধ্যেও অনুশীলন সমিতি সম্পর্কে গভীর আস্থা জন্মে এবং বিভিন্ন স্থানের অভিভাবকগণও নানাভাবে সহযোগিতা করিতে অগ্রসর হন। আমাদের কর্মপদ্ধতি শুধু যে শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, ডাকাতী বা এমন ধরণের কার্যকলাপেই সীমাবদ্ধ ছিল তাহা নয়, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য যে-কোন ক্ষুদ্র কর্মেও আমরা কখনও বিন্দুমাত্র অবহেলা বা ঔদাসীন্য প্রদর্শন করি নাই। এইজন্য বিভিন্ন স্থানে স্থানীয় লোকেদের মধ্যে কলহ-বিবাদ বা অন্য কোনওরূপ অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হইলে তাহারা আমাকে মীমাংসার জন্য আহ্বান করিতেন। আমি নিজের সময় অভাবের ভিতরেও আগ্রহসহকারে তাহাদের আহ্বানে সাড়া দিয়াছি। কোথাও কোথাও নিজে যাইতে না পারিলে আমার প্রতিনিধিস্বরূপ কাহাকেও পাঠাইয়া দিতাম।

বিখ্যাত কাপড়ের কারখানা ঢাকেশ্বরী কটন মিল স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা মানিকগঞ্জের মোক্তার রজনী বসাক স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত অনুশীলন সমিতির সমস্ত শাখার তত্ত্বাবধানের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একবার তিনি মানিকগঞ্জ সাব-ডিভিসনের অন্তর্গত সমস্ত শাখা-সমিতিকে আমন্ত্রণ জানাইয়া এক বিরাট উৎসব সম্পন্ন করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত লাঠিখেলা ও বিভিন্ন ক্রীড়াদির পরিচালনা হেতু রজনীবাবু আমাকে এবং ঢাকার সমিতি-নিবাসের সভ্যগণকেও আহ্বান করিয়াছিলেন।

এই উৎসব উপলক্ষে লাঠি, ছুরি ইত্যাদি প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বিজয়ীদিগকে পুরস্কার স্বরূপ পদকও দেওয়া হইয়াছিল। উৎসবটি বেশ মনোরম ও উৎসাহব্যঞ্জক রূপ ধারণ করায় স্থানীয় সকলেই বিশেষ সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। কিন্তু অবিমিশ্র আনন্দ সহিবে কেন? তাই উৎসবের পরে এক সঙ্কট উপস্থিত হইল। প্রতিযোগিতা ও কৃত্রিম যুদ্ধ খেলায় অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে কেহ কেহ আহত হইয়াছিল এবং তাহাদের কাহারও কাহারও রক্তপাতও হইয়াছিল। অবশ্য রজনীবাবু দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই যথাসম্ভব চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষের দিনে আমাকে, রজনীবাবুকে ও আরও কয়েকজন তরুণ কর্মীকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য পরোয়ানা আসিয়া হাজির। উক্ত অনুষ্ঠানে রক্তপাত হইয়াছে, ইহাই আমাদের অপরাধ। যাহা হউক স্থানীয় দারোগা ও অন্যান্য প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ রজনীবাবুর অনুগত ছিলেন।

রজনীবাবু আসল ঘটনা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গেই আহতদের অন্যত্র সরাইয়া ফেলেন এবং পুলিশ তদন্তে আসিয়া যে রিপোর্ট দিল তাহাতে কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারেন নাই।

সুগায়ক ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী ও কেদার চক্রবর্তীর প্রচেষ্টায় ময়মনসিংহে পূর্ব হইতেই সুহৃদ্ সমিতির অস্তিত্ব ছিল। বিশেষ করিয়া ব্রজেন্দ্র গাঙ্গুলী সুহৃদ্ সমিতির প্রচার কার্যের উদ্দেশ্যে যখনই যেখানে যাইতেন তাঁহার গানের প্রভাবে শ্রোতৃবৃন্দ মুগ্ধ হইতেন। এবং ইহাতে সুহৃদ্ সমিতির প্রচার কার্যের পক্ষে উহা পরম সহায়ক হইত। অবশ্য সুহৃদ্ সমিতির সাংগঠনিক শক্তি তেমন জোরদার হইতে পারে নাই। কারণ সংগঠন ও প্রকৃত কল্যাণকর্মের প্রতি তাহাদের নিষ্ঠার চেয়েও কোনও প্রকারে নিজ নিজ ক্ষমতা বিস্তারের তীব্র আকাঙ্খাই তাহাদের

প্রবৃত্তিকে চালিত করিত। এবং তাহারা এই কথাও বলিতেন যে, তাহাদের এলাকায় আর কোন সমিতি তাহারা বরদাস্ত করিবেন না। কিন্তু আমাদের অনুশীলন সমিতির ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তার কথা চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িতে থাকে, এবং ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন স্থান হইতে তথায় অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপনের জন্য আহ্বান জানান। প্রথমে গৌরীপুর জমিদার বাড়ীতেই অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হয়। পরে ক্রমে বিভিন্ন জমিদার বাড়ীতে আরও কয়েকটি শাখা-সমিতি গড়িয়া ওঠে এবং নেত্রকোণা, টাঙ্গাইল, জামালপুর, কিশোরগঞ্জ ইত্যাদি স্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

অনুশীলন সমিতির সুনাম ও কর্মপরিধি ক্রমশঃই বাড়িতে থাকে। এই সময়ে নোয়াখালী হইতে এক টেলিগ্রাম পাইয়া সেখানে গেলাম। সেখানকার যুবক ও অভিভাবকগণ আমাকে অভ্যর্থনা জানাইলেন বটে, কিন্তু শুনিলাম তথাকার তরুণগণ—যাহারা প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া সমিতির সভ্য হইয়াছে, তাহাদের অধিকাংশ ঢাকার কেন্দ্রীয় সমিতির নির্দেশ মানিয়া চলিতে চাহিলেও সুহৃদ্ সমিতির প্রভাবিত কয়েকজন দাবী তুলিয়াছে যে, কেবলমাত্র শিক্ষা সম্পর্কে যুবকগণ ঢাকা কেন্দ্রীয় সমিতির সাহায্য লইতে পারিবে ; অন্যান্য বিষয়ে নোয়াখালী সম্পূর্ণ স্বাধীন থাকিবে এবং তথাকার অভিভাবকগণ ভোট দ্বারা সকল কাজ নিয়ন্ত্রিত করিবেন।

আমি দিনকয়েক নোয়াখালী থাকিয়া ঢাকা ফিরিয়া আসিলাম। কোথাও উক্ত অভিমতের কোন প্রতিবাদ করি নাই। ঢাকা আসিয়া সমিতির কয়েকজন প্রথম শ্রেণীর কর্মীকে নোয়াখালী পাঠাইয়া দিলাম। তাহারা সেখানে লাঠিখেলা ও আদর্শগত অন্যান্য কর্মপ্রভাবে বালক ও যুবকগণকে সহজেই সমিতির প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ

হইল। সুহৃদ্ সমিতি অচিরে লোপ পাইল। কিন্তু অপর একটি মজার ব্যাপার ঘটিল। সুহৃদ্ সমিতি লোপ পাইলেও তাহার অপদেবতা তখনও কয়েকজনের ঘাড়ে সওয়ার হইয়াছিল। তাহারা 'নোয়াখালী সমিতি' নাম দিয়া অপর একটি সমিতি গঠন করিয়া অনুশীলন সমিতিকে কোণঠাসা করিতে অগ্রসর হইল। তন্মধ্যে একজন ছিলেন উকীল এবং পূর্বে অনুশীলন সমিতির সভ্য ছিলেন। তিনি একদিন সোজাসুজি কলিকাতায় পি, মিত্রের নিকট হাজির হইয়া অনুশীলন সমিতির বিরুদ্ধে বহুপ্রকার অভিযোগ উত্থাপন করিলেন। পি, মিত্র অবশ্য সে সকলের যথাযথ উত্তর দিয়াছিলেন। তখন সুযোগ না পাইয়া ভদ্রলোকটি জানাইলেন যে, তাহারা ঢাকার অধীনে থাকিতে প্রস্তুত নহেন। পি, মিত্র বলিলেন, পুলিন আমার নির্দেশ মতই বঙ্গদেশের অনুশীলন সমিতি পরিচালনা করিতেছে, তাই বলিয়া আপনারা ঢাকার অধীন একথা কে বলিল? আপনারা সকলেই মূল অনুশীলন সমিতিরই অধীন।

ভদ্রলোক নিরস্ত হইলেন না। তাই পুনরায় বলিলেন, আমরা পুলিনবাবুর নির্দেশের পরিবর্তে আপনার নির্দেশ মানিয়া চলিতে চাই।

পি, মিত্র বলিলেন, তাই যদি সত্য হয়, তবে আমি এই নির্দেশ দিতেছি যে, আপনারা সকলে পুলিনের নির্দেশানুসারে, তাহার পরিচালনাধীনেই থাকিবেন।

ভদ্রলোক আর কোন কথা না বলিয়া প্রস্থান করিয়াছিলেন। যাহা হউক নোয়াখালীর গ্রাম হইতে গ্রামান্তরে আমাদের সমিতির কর্মধারা পরিব্যাপ্ত হইতে থাকে। আমার কনিষ্ঠ সহোদর প্রমোদ পূর্বেই তথাকার দত্তপাড়া প্রভৃতি গ্রামে সমিতির শাখা স্থাপিত করিয়াছিল।

আমি জেলে যাইবার পূর্বে একবার কুমিল্লা গিয়াছিলাম। সেখানেও নোয়াখালীর মত বসন্ত মজুমদার ও তাহার অনুসরণকারী সহকর্মিগণ দাবী তুলিলেন, তাহারা অনুশীলন সমিতির আদর্শ মানিয়া চলিতে পারেন, কিন্তু কুমিল্লার আধিপত্য সম্পর্কে কুমিল্লার নেতা অর্থাৎ বসন্ত মজুমদারই নির্দেশ দান করিতে পারিবেন, অন্য কেহ নহে। কিন্তু ক্রমশঃ কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির কি পৃষ্ঠপোষক কি অভিভাবক কেহই এই প্রস্তাব স্বীকার করেন নাই।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই আপামর দেশবাসীগণের মধ্যে আপনিই স্বাধীনতার অদম্য স্পৃহা জাগ্রত হয়। তদুপরি জামালপুর, কুমিল্লা প্রভৃতি স্থানে মুসলমান অত্যাচারের প্রতিকারের জন্য যুবকদের মধ্যেও বিরাট চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। ক্রমে সকলেই ঢাকার অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়া পড়ে এবং অল্প সময়ের মধ্যেই সোনার গাঁ, মহেশ্বরদীর নানা স্থানে ছড়াইয়া পড়ে। ঐ সমস্ত কর্মিদের মধ্যে সাটিরপাড়া হাইস্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্র ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, বারুদী হাই স্কুলের হেড পণ্ডিত মহাশয় বরদাকুমার ভট্টাচার্য এবং ঢাকা কলেজের ছাত্র প্রকাশ পাকড়াশীও ছিলেন।

শাখা সমিতিগুলি পরিদর্শনহেতু ও বিভিন্ন কার্য ব্যাপদেশে আমি একাধিকবার সোনার গাঁ, মহেশ্বরদী পরগণায় গিয়াছিলাম।

একবার সাটিরপাড়া হইতে শোভাযাত্রা করিয়া ঐ অঞ্চলের বালক ও যুবকগণ আমাকে বিভিন্ন গ্রামে লইয়া গিয়াছিল। সেই উপলক্ষে প্রায় এক সপ্তাহকাল তথায় ছিলাম। কোনও গ্রামে উপস্থিত হইলেই রমণীগণ উলুধ্বনি দিত, মাতৃস্থানীয়াগণ ধান-দুর্বা দিয়া আশীর্বাদ করিতেন।

আর একবার বারুদীর পণ্ডিত বরদাকুমার ভট্টাচার্য মহাশয়ের

উদ্যোগে স্থানীয় সমিতির বালকগণের আত্মরক্ষা সম্পর্কিত প্রতি-যোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। সেই উপলক্ষে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে আমাকে উপস্থিত থাকিবার জন্য বারুদীর কর্তৃপক্ষগণ বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানান। মধ্য রাত্রিতে ষ্টীমার বারুদীতে পৌঁছিলে কর্তৃপক্ষ ষ্টেশনেই আমার আহার ও শয্যার বন্দোবস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। অতি প্রত্যুষে বারুদীর বহু বালক ও যুবক ষ্টেশনে আসিয়া সমবেত হয় এবং কিছু সংখ্যক যুবক আমাকে পাল্কীতে আরোহন করাইয়া নিজেরাই বহন করিতে থাকে। আমি খুবই আপত্তি জানাই কিন্তু স্থানীয় অভিভাবকদের—বিশেষ করিয়া পণ্ডিত মহাশয়ের সনির্বন্ধ অনুরোধ ও আগ্রহাতিশয্যে আমি আর কিছুতেই বারণ করিতে পারিলাম না।

পরের দিন প্রভাতে গ্রাম পরিদর্শন উপলক্ষে পণ্ডিত মহাশয় আমাকে লইয়া বিভিন্ন ধনী ব্যবসায়ী, নমঃশূদ্র, ভুঁইমালী—যাহারা সমিতির অন্তর্ভুক্ত এমন সব লোকের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। পরে স্বনামখ্যাত মহাপুরুষ বারুদীর ব্রহ্মচারীর পীঠস্থান দেখিলাম। এই বারুদীর লোকনাথ ব্রহ্মচারীই কুঞ্জলাল নাগ প্রভৃতি বহু বহু উচ্চশিক্ষিত কিম্বা বিলাত ফেরৎ বিপথগামী ব্যক্তিগণকে নিষ্ঠাবান 'হিন্দু'তে ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

ডাকাতী

পূর্বে বলিয়াছি যে, ডাকাতী সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবার পর এই উদ্দেশ্যে কিছু সংখ্যক উৎসাহী যুবক সংগ্রহ করিলাম। ক্রমে সমিতি-নিবাস স্থাপিত হওয়ার পর কতিপয় যুবককে স্বামীবাগের পশ্চাদ্দিকে অবস্থিত বিরল বৃক্ষ সমন্বিত একখণ্ড নির্জন স্থানে (বর্তমান টীকাটুলীতে) বিভিন্ন রাত্রিতে কাগজের উপরে টর্চলাইট ফেলিয়া উহাকেই লক্ষ্য করিয়া রিভলবারের গুলী ছোড়া শিক্ষা দিতাম। তৎপরে ভাওয়াল ষ্টেটের জঙ্গলের সীমান্তে শশী সরকার নামে এক যুবকের সন্ধান পাইয়া তাহাকেও গুপ্ত সমিতির অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলাম। শশী সরকার সুদক্ষ লক্ষ্যভেদী ছিল। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন যুবক দলকে শশী সরকারের বাড়ী পাঠাইয়া দিতাম এবং শশীর সাহায্যে তাহারা শিকার উপলক্ষ করিয়া জঙ্গলের মধ্যে যাইয়া রাইফেল ছোড়া অভ্যাস করিত। ক্রমে একটি বড় ও একটি ছোট নৌকা ক্রয় করিয়া তিনজন নমঃশূদ্র মাঝি নিযুক্ত করিলাম। নৌ-বিহার উপলক্ষ করিয়া বিভিন্ন যুবক দল বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নদীর মধ্যে যাইয়া মাঝিদের সাহায্যে নৌ-চালনা সম্পর্কিত কৌশল শিখিতে লাগিল।

আমি নিজেও সময়ে সময়ে যুবকদের সঙ্গে নদীতে নৌ-বিহারে বহির্গত হইতাম। সেই সময়ে পালা করিয়া তাহারা দিন-রাত্রি নৌকা চালাইত ; নিজেদের রন্ধনাদি তাহারা নিজেরাই করিত এবং এমন কি, পালা করিয়া তাহারা নিদ্রাও যাইত।

ক্রমে দল-বলসহ ডাকাতীর শিক্ষানবিশী আরম্ভ করিলাম—কৃত্রিম ডাকাতীর মহড়া চলিতে লাগিল। এমন কি সমস্ত দিন-রাত্রি নিদ্রা না যাইয়া কৃত্রিম ডাকাতীর লক্ষ্যস্থলে উপস্থিত হইতাম, সেখানে ডাকাতীর অভিনয় করিয়া পুনরায় অপর কোনও কল্পিত নিরাপদ স্থানে সরিয়া পড়িতাম। এইভাবে নিয়মিত অভ্যাসের ফলে প্রায় ছ' সাত মাস পরে উপলব্ধি করিলাম যে, যুবকগণ দেহে এবং মনে সম্পূর্ণরূপেই ডাকাতী সাধনের যোগ্য হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বড় কোন ডাকাতীতে প্রেরণ করার মত ভরসা তখনও পাইতেছিলাম না। তাই ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন রাস্তার সন্ধিস্থলে ডাকাতীর জন্য স্থান নিযুক্ত করিতে লাগিলাম। ব্যবসায়ীগণ সন্ধ্যাবেলায় এক স্থান হইতে অন্যত্র অর্থ বহন করিবার সময়ে তাহাদিগকে আক্রমণ করা হইত। নরহত্যা বিশেষভাবেই নিষিদ্ধ ছিল।

রাস্তার উপরে ঐ সব ডাকাতীতে যুবকগণ সাধারণতঃ যুযুৎসুর কৌশলই অধিক প্রয়োগ করিত, সঙ্গে ছুরি, লাঠি প্রভৃতিও থাকিত বটে। প্রথমবারের ডাকাতীটি নারায়ণগঞ্জেই অনুষ্ঠিত হয়। ডাকাতীর ফলে টাকাপূর্ণ যে থলিটি পাওয়া গিয়াছিল তাহাতে নাকি প্রায় এক হাজার টাকা ছিল। কিন্তু পলায়ন করিবার সময় বৃহৎ থলিটি ছিঁড়িয়া যায় এবং রাস্তায় ছড়াইয়া পড়ে। টাকা কুড়াইবার চেষ্টা করিতে লাগিলে লোকজন আসিয়া পড়ে এবং মাত্র ৮০ টাকা লইয়া আমাদের যুবকগণ পলায়ন করিতে সমর্থ হয়।

কিছুকাল পরে ঢাকাতেই একটি ডাকাতীর প্রচেষ্টা হয়, কিন্তু ইহার পরিণামটি বড়ই শোচনীয় হইয়া পড়ে। সেকালে তাঁতিবাজার ও শাঁখারীবাজারের সন্ধিস্থলের সন্নিকটে পুলিশ কর্মচারীগণের একটি বোর্ডিং ছিল। সন্ধ্যার পরে তিন-চারিটি ব্যবসায়ী ঐ পুলিশ বোর্ডিং-এর নিকট দিয়া অর্থ লইয়া যাইতেছিল। সংবাদ পাইয়া সমিতির যুবকগণ ঐ স্থানেই তাহাদিগকে আক্রমণ করে। আক্রমণ প্রতিহত করিবার জন্য ব্যবসায়ীগণ প্রাণপণ চেষ্টা করিতে থাকে এবং ক্রমে দুই-চারিজন পথিকও তথায় উপস্থিত হয়। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার প্রয়োজনে একটি যুবক একজন ব্যবসায়ীকে ছুরি মারে তাহার আর্ত্ত চীৎকারে পুলিশ বোর্ডিং-এর লোকজন আসিয়া পড়িলে যুবকগণ পলায়ন করে। আহত লোকটি দুই-তিন দিন পরে হাসপাতালে দেহত্যাগ করে।

এই ঘটনায় আমার মনে খুবই আঘাত লাগিল, তাই কিছুদিনের জন্য ডাকাতীর সংকল্প একেবারেই পরিত্যাগ করিলাম। কিন্তু যুবকগণ 'যুগান্তর' পত্রিকার বিভিন্ন প্রবন্ধ পড়িয়া এবং নিজেদের অর্জিত বৈপ্লবিক যোগ্যতার প্রয়োগাকাঙ্খায় ডাকাতী করিবার জন্য নিতান্তই অস্থির ও অধৈর্য হইয়া উঠিল। তাই বাধ্য হইয়া তাহাদের লইয়া ডাকাতীর অভিযানে বহির্গত হইতাম বটে, কিন্তু বিভিন্ন ছলে কৃত্রিম ডাকাতীর অভিনয় করিয়া ফিরিয়া আসিতাম। ইহাতে তাহারা আরও অধৈর্য হইয়া উঠিত। অবশেষে বাধ্য হইয়া শেখরনগর গ্রামে এক গৃহস্থ বাড়ীতে ডাকাতী করিতে গেলাম।

তখন পূর্ণ বর্ষাকাল। বিক্রমপুরের গ্রামসমূহ এবং গৃহস্থ বাড়ীর প্রাঙ্গণসমূহ সম্পূর্ণরূপেই জলমগ্ন ; প্রত্যেক বাড়ীর চতুর্দিকই বৃক্ষাদিপূর্ণ, সুতরাং গ্রামের অভ্যন্তরে বড় নৌকা চালাইয়া যাওয়া অসম্ভব। তাই

বড় নৌকাটি কিঞ্চিৎ দূরে ধানের ক্ষেতে রাখিয়া অস্ত্র-শস্ত্রসহ ছোট নৌকাটি লইয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইলাম। আমাদের আগমন শব্দে গৃহস্থ জাগিয়া উঠিয়া আলো জ্বালিল এবং 'কে-কে' বলিয়া চীৎকার করিতে লাগিল। আমাদের দলের সঙ্গে অবিনাশ চক্রবর্তীর দলের কয়েকটি ছেলে ছিল। তন্মধ্যে একটি ছেলে কাঁপিতে কাঁপিতে আসিয়া আমাকে জানাইল যে, বাড়ীর লোকজন জাগিয়া গিয়াছে, এখন ফিরিয়া না গেলে সর্বনাশ হইবে। আমি তাহাকে রুক্ষকণ্ঠে বলিলাম, 'চুপ থাক'। সে ভীতি-বিহ্বলভাবে যাইয়া নৌকায় পড়িয়া রহিল।

অন্যান্য যুবকগণ নির্দিষ্ট সঙ্কেত ধ্বনি 'আলি, আলি, আলি' উচ্চারণ করিয়া নৌকা হইতে অবতরণ করিল। সম্মুখের এক দালান হইতে কয়েকজন মহিলা বহুরূপীর দল আসিয়াছে মনে করিয়া তামাসা দেখিবার নিমিত্ত নির্গত হইল বটে, কিন্তু আগন্তুকদের ভাব-ভঙ্গী দেখিয়া ভীতভাবে অতি দ্রুত গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিল। আমাদের লক্ষ্য ছিল অন্যগৃহ, তথায় এক সিন্দুকে চৌদ্দ হাজার টাকা ছিল। সঙ্কেত মত বিভিন্ন যুবক বিভিন্ন কূট সন্ধিস্থলে পাহারায় নিযুক্ত রহিল। বাড়ীর প্রাঙ্গণে প্রায় এক হাঁটু জল। যাহা হউক, নির্দিষ্ট গৃহ আক্রমণ করা মাত্রই গৃহের অভ্যন্তরস্থিত রমণীগণ পশ্চাতের দ্বার খুলিয়া পলায়ন করিল। সেই দরজা দিয়াই ঘরে প্রবেশ করিয়া সম্মুখস্থিত দরজা খুলিয়া ফেলা হইল। গৃহস্বামী গৃহ পরিত্যাগ না করিয়া নানাবিধ অনুনয়-বিনয় করিতে লাগিল। সিন্দুকের চাবির জন্য তাহারা সমস্ত ঘরের সম্ভাব্য স্থানগুলি খুঁজিয়া দেখিল। কিন্তু কোথাও চাবি না পাইয়া তাহারা আমার নির্দেশমতে উহা টানিয়া ঘর হইতে বাহির করিয়া নৌকায় তুলিবার চেষ্টায় নিয়োজিত হইল।

লোহার সিন্দুক ছোট নৌকায় তুলিয়া বড় নৌকার দিকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেই ছোট নৌকাটি সিন্দুকের ভারে জলে ডুবিয়া গেল। আমি তৎক্ষণাৎ নিমজ্জিত সিন্দুকটির উপর দাঁড়াইয়া অনুভব করিলাম যে, আমার মাথার উপরে কমপক্ষে একহাত জল হইবে। এত গভীর জল হইতে সিন্দুক উদ্ধার করিবার চেষ্টা বৃথা, তাই সে চেষ্টা হইতে বিরত রহিলাম।

এদিকে কল-কোলাহলে গ্রামবাসীগণ জাগরিত হইল এবং দূর হইতে তাহারা অবিরত নানারূপ ধ্বনি করিতে লাগিল। কেহ কেহ বা অদূরবর্তী দালানের ছাদ হইতে ঢিল ছুড়িতে লাগিল। তখন দলের মধ্য হইতে শশী সরকার ঐ ঢিলের গতি লক্ষ্য করিয়া কয়েকবার বন্দুক ছুড়িল। তাহাতে ঢিল নিক্ষেপ বন্ধ হইল।

লোহার সিন্দুক জল হইতে উঠাইবার জন্য পণ্ডশ্রম না করিয়া স্থান পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া আমাদের মনে হইল। তাই হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম। বড় নৌকাতে আরোহন করিয়া শেষ রাত্রিতে ধলেশ্বরী নদীতে উপস্থিত হইলাম। এই সময়ে ঝড় সুরু হইল, কিন্তু প্রভাতে যে-ভাবেই হউক ঢাকা উপস্থিত হইতেই হইবে। তাই ঝড় উপেক্ষা করিয়াই নদী পাড়ি দিলাম এবং নির্বিঘ্নেই ঢাকায় পৌঁছিলাম।

সকালেই জানিতে পারিলাম যে, ডাকাতীর সংবাদ ঢাকার প্রায় সর্বত্র প্রচারিত হইয়া গিয়াছে। কে বা কাহারা করিয়াছে সেই সম্বন্ধে কোনই সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

আমাদের ব্যবহৃত পূর্বেকার নৌকাটি একদিকে যেমন পুরাতন হইয়াছিল, তেমনি অপরদিকে বহু লোকের নিকটই উহা পরিচিত হইয়া গিয়াছিল। তাই উহাকে বিক্রয় করিয়া ফেলিলাম। কিন্তু

দেখিতে পাইলাম যুবকগণের মধ্যে ডাকাতীর স্পৃহা ক্রমেই তীব্রতর হইতে লাগিল। ডাকাতীর ব্যাপারটিকে আমি কখনও নিছক একটা তামাসার ব্যাপার হিসাবে নিজে ভাবিতাম না এবং সমিতির সভ্যগণকেও ভাবিতে নিষেধ করিতাম। কারণ এই বিষয়ে সকলকেই একটি বিশেষ প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। দেশোদ্ধারের উদ্দেশ্যে গুপ্তভাবে সংগ্রাম চালাইতে যে রসদ, যে অস্ত্রশস্ত্র ও যে সব প্রস্তুতি দরকার তাহা মিটাইবার জন্য এবং আত্মস্বার্থের পরিবর্তে দেশের স্বার্থের প্রয়োজনেই শুধু ডাকাতীর প্রচেষ্টা চালান হইবে। আরও প্রতিজ্ঞা ছিল যে, কোনও ধর্মপরায়ণ, পরোপকারী সৎলোকের গৃহে কদাচ ডাকাতী করা হইবে না। যে স্থানে দশ হাজার টাকার কম প্রাপ্তির সম্ভাবনা সে সকল স্থানেও ডাকাতী করা হইবে না। যাহারা দেশদ্রোহী, স্বদেশী আন্দোলনের বিরোধী, গভর্ণমেণ্টের গুপ্তচর, অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জনকারী, দরিদ্র ও দুর্বলের উপর অত্যাচার-কারী, তাহাদিগের গৃহে ডাকাতী করা হইবে।

একদিন সমিতির কয়েকজন যুবকসদস্য সংবাদ আনিল যে, ঢাকা জেলার অন্তর্গত বাড়ঢ়া নামক গ্রামে এক ধনী পরিবার আছে—তাহারা ডাকাতের 'খৌলৎদার' ও আশ্রয়দাতা; পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলমান যে সমস্ত চুরি কিম্বা ডাকাতী করিত, তাহাদের লব্ধ অর্থ এই পরিবারের নিকটই রক্ষিত হইত; পরিবারের কর্তাগণ নিজেদের জন্য অর্ধাংশ রাখিয়া দিত এবং অপরার্দ্ধ হইতে মোকদ্দমা প্রভৃতি হেতু যে ব্যয় হইত, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্বাহ করিয়া অবশিষ্টাংশ চোর ও ডাকাতগণকে বিতরণ করিয়া দিত; চোর ও ডাকাতগণ শুধু ডাকাতী ও চুরিই করিত, উক্ত পরিবারটি অপহৃত সম্পত্তি লাভ করিয়া অধিকতর ধনশালী হইত।

কয়েকজন যাইয়া বিশেষভাবে গ্রামটি পরিদর্শন করিয়া সমগ্র পরিস্থিতি সম্বন্ধে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিয়া আনিল। সঙ্গে একটি মানচিত্র আনিয়াও আমাকে অর্পণ করিল। কিন্তু মানচিত্রে একটি গুরুতর ভ্রম ছিল—মানচিত্রে দেখান হইয়াছিল বাড়ীটি নদীরই অতি সন্নিকটে। অথচ প্রকৃতপক্ষে নদী হইতে খাল বাহিয়া নির্দিষ্ট বাড়ীটিতে যাইতে প্রায় এক ঘণ্টারও অধিক সময় লাগিত। সুতরাং কর্মসূচী ও সময় বিভাগ সম্পর্কে যেরূপ নির্দেশ করিয়া দিয়াছিলাম, তাহাতে শেষ পর্যন্ত বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হইল।

যুবকগণ যাত্রা করিলে ডাকাতীর নির্দিষ্ট রাত্রিতে আমি কয়েকজন বিশিষ্ট রাজকর্মচারীর সহিত কোনও এক নিমন্ত্রণ সভায় যোগদান করিয়া একত্র বসিয়া আহার করিলাম। উদ্দেশ্য ছিল যে, ডাকাতীর রাত্রিতে আমি ঢাকাতেই ছিলাম এই কথা প্রমাণ করা সহজ হইবে। সেই রাত্রিতে আমার নিদ্রা হইল না। সমস্ত রাত্রি বারংবার ঘর-বাহির করিয়াছিলাম। অবশেষে সেই দুশ্চিন্তার রাত্রি প্রভাত হইল এবং দ্বিপ্রহরের পূর্বেই ঢাকা সহরের বিভিন্ন স্থানে ডাকাতী সম্পর্কে বহুপ্রকার অদ্ভুত সংবাদাদি প্রচারিত হইতে লাগিল। সফলতাসহ ডাকাতী সম্পন্ন হইয়াছে, কিন্তু সমিতির একটি ছেলের মৃত্যু হইয়াছে সংবাদ পাইলাম।

পরের দিন সন্ধ্যাবেলায় একটি যুবক আসিয়া পকেট হইতে আমাকে কিছু অর্থ এবং অলঙ্কার দিয়া সাধারণভাবে ডাকাতীর বিবরণ বলিল। বিবরণ শুনিয়া অন্যান্য বিষয় উপেক্ষা করিয়াও আমি সর্বপ্রথমে তিনটি আহত যুবকের চিকিৎসার জন্যই ব্যস্ত হইয়া পড়িলাম।

একটী যুবকের বাম বাহু ভেদ করিয়া একটী বর্শার ফলক

আটকাইয়া রহিয়াছে, তাহা সাধারণভাবে খুলিবার কোনই উপায় নাই ; অপর একটী যুবকের দক্ষিণ মণিবন্ধে একটী বৃহৎ গুলী বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে এবং তৃতীয়জনের নাসিকা ও ওষ্ঠের সন্ধিস্থলে গুলীর আঘাতে গুরুতর ক্ষতের সৃষ্টি হইয়াছে।

ডাক্তার পি, সি সেন গুপ্তভাবে একজন ডাক্তারকে সমস্ত বিবরণ জানাইয়া অস্ত্রোপচারের জন্য নিযুক্ত করিয়া রাখিলেন। আমার বাসার নিকটস্থ একজন ডাক্তার বন্ধুর নিকট হইতে গোপনে এক শিশি ক্লোরোফর্ম সংগ্রহ করিয়া রাখিলাম। আমার বাসার পার্শ্বেই জাতীয় বিদ্যালয়ের এক কক্ষে দুইটী বালক জল-বসন্ত রোগী আবদ্ধ ছিল, অপর পার্শ্বের একটী কক্ষে আহতদের জন্য তিনটী শয্যা প্রস্তুত করিয়া রাখিলাম।

পরের দিন আরও দুই একটী যুবক আসিয়া প্রত্যেকেই আমাকে কিছু অর্থ ও অলঙ্কার অর্পণ করিল। আহত যুবকগণকে তাহারাই কোনও নিরাপদ স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া আসিয়াছিল, আমার নির্দেশ মত ঐ যুবকগণ সন্ধ্যার অল্প পরে আহতগণকে আমার নিকট উপস্থিত করিল। দেখিলাম তিনটী যুবকই নির্ভীক ও নিরাতঙ্ক এবং আমার উপর তাহাদের অটল ভরসা ও বিশ্বাসও লক্ষ্য করিলাম। ঠিক সেই সময়েই ডাক্তার পি, সি, সেন আমাদের পূর্ব নির্ধারিত ডাক্তার লইয়া আসিলেন। আমরা প্রচার করিয়া দিলাম বসন্ত রোগীর চিকিৎসার জন্য ডাক্তার আসিয়াছেন।

ক্রমে আরও কয়েকজন যুবক ভিন্ন ভিন্নভাবে আসিয়া আমাকে ডাকাতীলব্ধ অর্থ ও অলঙ্কার দিয়া গেল।

যুবকগণের মধ্যে কেহ কেহ পারিবারিক অভাব-অনটনের কথা জানাইয়া কিছু কিছু টাকা লইয়া গেল। আমি তখন সেই সকল

যুবককে এক একটী কাজের দায়িত্বভার দিয়া বিভিন্ন স্থানে পাঠাইয়া দিলাম।

ক্রমশঃ ডাকাতীর পূর্ণ বিবরণ পাইলাম।

সন্ধ্যার পর আহারাদি শেষ করিয়া ছত্রিশটী যুবক ও বালক আত্মরক্ষার প্রয়োজনীয় উপাদানসহ ঢাকা হইতে নৌকাযোগে যাত্রা করিল। একটী বড় নৌকা ও একটী ছোট নৌকা। মধ্য রাত্রিতে বাড়ড়া গ্রামের নিকটে বড় নৌকাটীকে নদীতে রাখিয়া, ছোট নৌকা-যোগে তাহারা খালের মধ্য দিয়া নির্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইল। আদা-নুন চিবাইয়া ও কিছু গুড় সেবন করিয়া বিভিন্ন পরিচালকের অধীনে বিভক্ত হইয়া তাহারা 'আলি আলি' রব তুলিয়া বাড়ী আক্রমণ করিল। বাড়ীটীর চতুর্দিক পাকা দেওয়ালে পরিবেষ্টিত ছিল; একদল প্রধান প্রবেশ দ্বারে পাহারায় নিযুক্ত রহিল, অপর একদল অভ্যন্তরেই দেওয়ালের পার্শ্ব দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেখিতে লাগিল যেন কেহ দেওয়াল টপ্‌কাইয়া ভিতরে আসিতে না পারে। অপর সকলে গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

ইতিমধ্যে কোলাহলে আকৃষ্ট হইয়া গ্রামের বহু হিন্দু-মুসলমান প্রতিবেশী বর্শা, টেটা, কোঁচ, হেসা প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আক্রমণের চেষ্টা করিতে লাগিল।

আক্রান্ত যুবকগণ প্রবেশ দ্বার হইতে বন্দুক ছুড়িল, প্রবেশ দ্বার সুরক্ষিত রহিল, কেহই আর প্রবেশ করিতে পারিল না। গ্রাম্যলোক কেহ কেহ দেওয়াল টপ্‌কাইয়া ভিতরে প্রবেশের চেষ্টা করিলে তাহারা রিভলভার ও তরবারী দেখাইয়াই তাহাদের নিরস্ত করিতে সক্ষম হইল। দৈবক্রমে সহসা একটী যুবকের বাম বাহুতে একটী গালাযুক্ত লৌহময় কোঁচের শলাকা এ-পিঠ ও-পিঠ বিদ্ধ হইয়া গেল।

আক্রান্ত গৃহ সুরক্ষিত হইবার পর নির্দিষ্ট যুবকগণ অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় রত হইল। লোহার সিন্দুক খুলিবার জন্য তাহারা তাহাদের সঙ্গে সংগ্রহ করা চাবির সাহায্যে পরীক্ষা করিতে লাগিল। তখন পর্যন্ত তাহারা লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার কৌশল আয়ত্ত করিতে পারে নাই। অনেক চেষ্টা করিয়াও যখন কোন চাবি লাগাইয়া সিন্দুক খোলা গেল না, তখন সহসা প্রকৃত চাবিটি ঘরের মধ্যেই পাওয়া গেল। সিন্দুক খুলিয়া দেখা গেল উহা টাকায় ভর্তি—টাকাগুলি সমস্ত ঢালা রহিয়াছে, থলি কিংবা কোন বস্তাতে বাঁধা ছিল না। যুবকগণ বাড়ীর বিভিন্ন স্থান হাতড়াইয়া কয়েকটি পিতলের গামলা, বেতের টুকরী সংগ্রহ করিয়া উহাতে টাকা ভর্তি করিতে লাগিল এবং ক্রমে নৌকাতে চালান করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া গ্রামের লোকজন বাড়ী ছাড়িয়া নৌকা আক্রমণ করিল। কিন্তু সেই স্থানেও এইরূপ শক্তভাবে তাহাদের প্রতিরোধ করা হইল যে তাহারা সফল হইতে পারিল না।

যুবকগণ প্রার্থনা জানাইলে রমণীগণ আপনা হইতেই তাহাদের দেহের অলঙ্কারসমূহ খুলিয়া দিল। ডাকাতীর সময় রমণীর দেহ স্পর্শ করা নিষিদ্ধ ছিল।

গামলা ও টুকরী করিয়া টাকা নৌকায় চালান দেওয়া হইলে যখন সকলে নৌকায় আরোহন করিল, তখন গ্রামবাসীগণ পুনরায় আক্রমণ সুরু করিল। কিন্তু কয়েকটি বন্দুকের গুলি ছুড়িলেই তাহারা সরিয়া পড়ে।

বিক্রমপুরের শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রধান সর্দার নিযুক্ত করিয়াছিলাম, শশী সরকার তাহার সহকারী ছিল।

ছোট নৌকাযোগে নদীতে আসিয়া বড় নৌকাতে টাকাগুলি

তুলিতে তুলিতে নির্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল এবং সূর্যোদয় হইয়া পড়িল। নৌকা কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের লোকজন মিলিয়া তথায় উপস্থিত হইল এবং যুবক-দিগকে গালাগালি করিয়া নৌকা থামাইতে নির্দেশ দিতে লাগিল। যুবকগণও রসিকতা করিয়া প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। এমন সময় অপর গ্রামের জনকয়েক লোক আসিয়া বন্দুক ছুড়িয়া তাহাদিগকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। বিপদ বৃদ্ধি পাওয়ায় যুবকগণ ছোট নৌকাটিকে জলে ডুবাইয়া দিয়া বড় নৌকাতেই সকলে আশ্রয় লইল এবং নদীর মধ্যস্থল দিয়া নৌকা চালাইতে লাগিল। শশী সরকার এবং অপর চারিজন নৌকার ছৈ-এর (ছাদ) উপর রাইফেলসহ শুইয়া পড়িল—দুইজনের মুখ একদিকে, অপর তিনজনের মুখ বিপরীত দিকে ছিল। তাহাতে তাহারা উভয় দিকেই লক্ষ্য রাখিতে পারিতেছিল। অবশ্য মাঝে মাঝে বন্দুকও ছুড়িতে লাগিল। এদিকে ক্রমে নদীর উভয় পার্শ্ব হইতেই বন্দুকসহ জনতা মুহুর্মুহু তীব্রভাবে আক্রমণ করিতে লাগিল। কিন্তু তাহাদের বন্দুকে বড় গুলি বিশেষ ছিল না, তাই ছড়্‌রাগুলি যুবকগণের শরীরে বিদ্ধ না হইলেও প্রায় প্রত্যেকেরই শরীরে বসন্তরোগের মত গুটী গুটী চিহ্ন দেখা যাইতে লাগিল। যুবকগণ তথাপি নির্ভীকভাবে পালাক্রমে নৌকার দাঁড় টানিতে লাগিল। গ্রাম্যলোকেরা অনবরত গুলি ছুড়িবার পর একটু যেন নিরস্ত হইল। যুবকগণও কিছুক্ষণ নিরাপদে চলিল। কিন্তু সামান্য কিছু অগ্রসর হইবার পর নদীর মোড় ঘুরিবার সময় পুনরায় একদল লোক আক্রমণ করিল এবং যুবকগণও রাইফেল ছুড়িয়া সমুচিত প্রত্যুত্তর দিতে লাগিল। এদিকে অবিরাম গুলি ছুড়িতে ছুড়িতে গুলি ফুরাইয়া আসিয়াছে। তখন কয়েকজন সুদক্ষ যুবক নৌকার

অভ্যন্তরে ষ্টোভ জ্বালাইয়া লৌহ-কটাহে ছড়রা গালাইয়া দ্রবীভূত সীসক ছাঁচে ঢালিয়া বুলেট তৈয়ারী করিয়া ব্যবহৃত কার্ট্রিজের শূন্যগর্ভ খোলগুলির মধ্যে বারুদ ও বুলেট ভরিয়া এবং ক্যাপ লাগাইয়া মেসিনের চাপে কার্ট্রিজ প্রস্তুত করিতে রত হইল। যতগুলি কার্ট্রিজ যুবকগণ সঙ্গে নিয়াছিল, তাহা যথেষ্ট নহে, এবং এমন বিপুলভাবে ঘন ঘন আক্রমণ চলিবে তাহা তাহাদের ধারণার বাহিরে ছিল।

দ্বিপ্রহরের সময় সাভার গ্রামের পার্শ্ব দিয়া নৌকা চলিতে থাকিলে পুনরায় একদল লোক বন্দুক লইয়া আক্রমণ করিল। অধিকন্তু সাভার থানার দারোগা তিন চারিটি বন্দুক ও লোকজনসহ একটি নৌকায় আরোহন করিয়া আক্রমণ শুরু করিল। তাহার সাহায্যার্থে আরও দুই তিনটি নৌকা অগ্রসর হইল।

দারোগার উভয় পার্শ্বে দুইজন কর্মচারী দুইটি বন্দুকে গুলি ভরিয়া দিতেছিল এবং দারোগা সেই গুলি যুবকদিগকে লক্ষ্য করিয়া ছুড়িতেছিল। অপর দুই-একজন পুলিশ কর্মচারীও দারোগার নৌকা হইতে ইহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া ঢিল ছুড়িতেছিল। একটি যুবকের দক্ষিণ মণিবন্ধে একটি গুলি বিদ্ধ হইয়া রহিল—সে দাঁড় টানিতেছিল, অপর একজন দাঁড় টানা রত যুবকের নাসিকা ও ওষ্ঠের সন্ধিস্থলে গুলিতে নিদারুণ আঘাত লাগিল। তাহারা ভীত না হইয়া তীব্রবেগে দাঁড় টানিতে লাগিল এবং আহতদের স্থানে অপর দুইজন নিযুক্ত হইল।

দারোগা মহাশয় অবিরাম গুলি বর্ষণ করিতেছিলেন। সহসা একটী গুলি নৌকার ছৈ-এর পাশের জল ছেঁচিবার ক্ষুদ্রপথ দিয়া ভিতরে আসিয়া একটী যুবকের মস্তক ভেদ করিয়া চলিয়া গেল। যুবকটী গোঁ-গোঁ শব্দ করিয়া তৎক্ষণাৎ ঢলিয়া পড়িল—আর উঠিল না।

এদিকে শশী সরকার প্রমুখ যুবকগণও নৌকার ছৈ-এর উপর হইতে দারোগার নৌকা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িতে থাকে। মুহূর্তের মধ্যেই দারোগার এক পার্শ্বস্থ কর্মচারী নিহত হইল, এবং আরও দুইজন কর্মচারী আহত হইল। দারোগার কানের পার্শ্ব ঘেঁষিয়া শোঁ শোঁ শব্দে একটী গুলি চলিয়া গেল—দারোগা অল্পের জন্য বাঁচিয়া গেল। এইবার দারোগা সাহেব কিঞ্চিৎ প্রাণের আশঙ্কা করিল এবং সরিয়া পড়িল।

ক্রমে নদীতীরস্থ জনতাও চলিয়া গেল। কিছুক্ষণ নৌকা নিরাপদে চলিল, হঠাৎ দূরে ষ্টীমারের ধূম দেখিয়া যুবকগণ চকিত হইয়া উঠিল। যুবকগণ দূরবীণের সাহায্যে অতি সতর্কতার সহিত নিরীক্ষণ করিতে করিতে বুঝিতে পারিল যে, ঢাকার পুলিশ লঞ্চ-ই বটে। সৌভাগ্যক্রমে নিকটেই খাল দেখিতে পাইয়া যুবকগণ নৌকাসহ খালের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আত্মগোপন করিল। দুই একজন তীরে থাকিয়া ষ্টীমারটীর গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। দৈবক্রমে তথায় কোন লোকজনই ছিল না। ষ্টীমার ঐ স্থান অতিক্রম করিয়া আরও অনেক দূর চলিয়া গেল। প্রায় এক ঘণ্টা পরে ষ্টীমার ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গেলে যুবকগণ খাল হইতে বাহির হইতে লাগিল। দাঁড় টানিতে টানিতে তাহাদের হাত প্রায় অবশ হইয়া পড়িয়াছিল; তাই এখন তাহারা পালাক্রমে গুণ টানিয়া চলিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাদের সহিত একটী ক্ষুদ্র রক্ষীদলও পদব্রজে চলিতে লাগিল। হঠাৎ নদীর একটী মোড় ফিরিবার সময় প্রায় শতাধিক লোক আসিয়া গুণ টানা রত যুবকগণকে তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। যুবকগণের দেহের শক্তি ক্রমে প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে, তদুপরি কার্টিজও প্রায় নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। কিছুক্ষণ ধস্তাধস্তির

পর গ্রাম্য লোকগণ গুণ টানায় রত একটী যুবককে বন্দী করিয়া লইয়া যাইতে সক্ষম হইল। তখন নৌকা একস্থলে বাঁধিয়া রাখিয়া যে সামান্য কার্টিজ প্রভৃতি ছিল, তাহাই সম্বল করিয়া রাইফেল, রিভলবার ইত্যাদিসহ কতিপয় যুবক নৌকা রক্ষায় নিযুক্ত রহিল এবং অপর সকলে দুই একটি রাইফেল ও রিভলভার এবং তরবারি, ছোরা, বর্শা, লাঠি প্রভৃতি লইয়া অপহৃত যুবকটির সন্ধানে নির্গত হইল। প্রায় অর্দ্ধমাইল মাঠ অতিক্রম করিয়া যুবকগণ এক গ্রামের নিকট উপস্থিত হইল এবং ক্ষীণ কোলাহলের শব্দ লক্ষ্য করিতে করিতে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। সেখানে যাইয়া দেখিতে পাইল যে, যুবকটিকে ঘিরিয়া গ্রামের বহু লোকজন নানারূপ জল্পনা-কল্পনা করিতেছে। আমাদের যুবকেরা তরবারি, বন্দুক প্রভৃতি লইয়া গ্রামবাসীদের আক্রমণ করিলে তাহারা সহসা দিশাহারা হইয়া পলায়ন করিল এবং যুবকটিকে উদ্ধার করিয়া লইয়া আসা সম্ভব হইল।

সমস্ত দিন সামান্য চিড়া ও গুড় খাইয়া ও বিশ্রামের অভাবে সকলে খুবই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই একটি খালের মুখ দেখিয়া তাহারা নৌকা বাঁধিল এবং কোনওরূপে খিচুড়ী রাঁধিয়া ক্ষুন্নিবৃত্তি সাধনের জন্য ব্যবস্থা করিতে লাগিল। হঠাৎ সম্পূর্ণ অতর্কিতে পার্শ্ববর্তী কোনও গ্রাম হইতে ৫০।৬০ জন বলিষ্ঠ মুসলমান আসিয়া তীব্রভাবে আক্রমণ করিল। আহার-নিদ্রার অভাবে এত ক্লান্তি সত্ত্বেও যুবকগণ অস্থির হইয়া পড়ে নাই। অবশ্য অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক কয়েকজন খুবই ভয়-বিহ্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

ঐ সকল বলিষ্ঠ মুসলমানদের সহিত ক্লান্ত যুবকগণ সম্মুখ সমরে আঁটিয়া উঠিতে পারিবে না মনে করিয়া শচীন ও শশী সরকার এক কৌশল অবলম্বন করিল। তাহারা আগন্তুক মুসলমানদের সহিত

আপোস আলোচনা চালাইল এবং ইহার ফলে আগন্তুক দল বন্দুক ও অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্রাদির চালনা শিক্ষা করিতে আগ্রহ প্রকাশ করিল। এইভাবে তাহারা যখন ক্রমশঃ অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, তখন শচীন নৌকার উপর দাঁড়াইয়া একজন মুসলমানকে বন্দুকের বাটের আঘাত করিয়া ফেলিয়া দিল। অপরাপরগণ এই দৃশ্য দেখিয়া পলায়ন করিল।

ক্রমে সন্ধ্যা সমুপস্থিত দেখিয়া ও বারংবার আক্রান্ত হওয়ার ফলে প্রায় দিগ্‌বিদিকশূন্য ভাবে চলিতে চলিতে নৌকা গন্তব্যস্থল হইতে বহুদূরে উপনীত হওয়ায় প্রায় সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। তদুপরি দৈবক্রমে ঝড় সুরু হইল, প্রবলবেগে বাতাস বহিতে লাগিল; চতুর্দিক ঘোরতর অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন। শচীন ও শশী দুঃসাহসে ভর করিয়া নৌকা ঘুরাইয়া দিল। সমস্ত দিন নদীর স্রোত ও বাতাস উভয়ই নৌকার গতির প্রতিকূল ছিল, এখন উভয়ই গতির অনুকূলে আসায় সমস্ত দিনে নৌকা যতদূর চলিয়াছিল প্রায় দুই ঘণ্টার মধ্যেই ততটা পথ অতিক্রান্ত হইল। ক্রমে ঝড় থামিল, অন্ধকারও ঘুচিল এবং যুবকগণ তাহাদের গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। গুলিবিদ্ধ হইয়া মৃত যুবকটির শব একটি নোঙরের সহিত বাঁধিয়া নদীর মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তাহারা পুনরায় চলিতে লাগিল।

ক্রমে নৌকা যতই গন্তব্যস্থলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল যুবকগণও বিভিন্ন দলে বিভক্ত হইয়া কিছু কিছু টাকা ও অলঙ্কারসহ নৌকা হইতে নামিয়া যাইতেছিল। শশী, শচীন এবং আরও দুই একজন রাত্রিতে নৌকাসহ শশীর বাড়ী উপস্থিত হইল এবং টাকা ও অস্ত্রাদি নিকটবর্তী জঙ্গলের মধ্যে মাটি খুঁড়িয়া লুকাইয়া রাখিল। নৌকাটিকেও নিকটবর্ত্তী বিলের জলে ডুবাইয়া রাখিল।

গ্রাম্যলোকজন কেহই কোন বিষয়ে কোনরূপ সন্ধান পাইল না। শশী এবং শচীন বিক্রমপুরে শচীনের বাড়ী চলিয়া গেল।

সেই সময়ে আমার উপরে এবং সমিতি-নিবাসের উপরে দিবা-রাত্রি পুলিশের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকা সত্ত্বেও বড়ই আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই ব্যাপারে পুলিশ আমাদের একেবারেই সন্দেহের চক্ষে দেখে নাই। যুগান্তর দলের কতিপয় প্রচারক সেই সময়ে ঢাকা সহর ও বিক্রমপুরের বিভিন্ন স্থানে প্রচার কার্যে লিপ্ত ছিল, পুলিশ সন্দেহ বশে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া মোকদ্দমা সুরু করিয়া দিল।

আমাদের উপর এই ব্যাপারে পুলিশের সন্দেহ নাই, অতএব ইহাই উপযুক্ত সময় মনে করিয়া লুক্কায়িত টাকা, অস্ত্র-শস্ত্রাদি লইয়া আসিবার জন্য আমি শশী ও শচীনকে বার বার নির্দেশ দিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহারা বার বারই জানাইতে লাগিল যে, এখন টাকা ও অস্ত্রাদি আনিতে গেলে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা দেখা দিবে।

কিন্তু অবশেষে উহাদের অভিসন্ধি সম্পর্কে আমার নিতান্তই সন্দেহ হইল। জাতিগত অনুভূতি, জাতিগত সততা না থাকিলে কোন জাতিই স্বাধীন কিম্বা মহৎ হইতে পারে না। সেই সম্পর্কে অভিশম্পাত আমাদের দেশে চিরকালই বর্তমান রহিয়াছে।

শচীন ভাবিল যে, ডাকাতী সম্পর্কে যে সকল যোগ্যতার প্রয়োজন, তাহা তাহাদের যথেষ্টই জন্মিয়াছে। প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদিও তাহাদের করায়ত্ব, সুতরাং শশীকে স্বমতাবলম্বী করিয়া এই সিদ্ধান্ত করিল যে, টাকা ও অস্ত্র-শস্ত্র কিছুই তাহারা আমাকে দিবে না। তাহা ছাড়া প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যে লোক বশীভূত করিয়া বিশিষ্ট একটি ডাকাতী দল সৃষ্টি করিবে এবং ডাকাতী-লব্ধ অর্থে পরম সুখে কালাতিপাত করিবে।

যাহা হউক, শচীন ও শশীকে তাহাদের দুষ্ট অভিসন্ধি পরিত্যাগ করাইবার চেষ্টায় শচীনের গ্রামের নিকটবর্ত্তী এক জমিদার বাড়ীতে আমি অতিথি হইলাম। সেই জমিদার বাড়ীর সমস্ত ছেলেরা আমার সমিতির সভ্য ছিল। কয়েকজন ভৃত্য ও জমিদারপুত্রকে সঙ্গে করিয়া নৌকাযোগে মধ্যরাত্রিতে শচীনের বাড়ী যাইয়া শচীন ও শশীকে বুঝাইয়া এবং আমাদের বিরোধিতা করিলে আমাদের শত্রুগণ যে তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ লইয়া তাহাদের সর্বনাশ করিবে সেই সম্বন্ধেও বলিলাম। অবশেষে তাহারা তাহাদের ভুল বুঝিতে পারিল এবং ডাকাতী করিবার পশ্চাতে আত্মস্বার্থের পরিবর্তে যে মহৎ আদর্শ ছিল তাহা পুনরায় স্বীকার করিল।

তৎকালীন হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি জাষ্টিস জেঙ্কিন্স বাড়ুা ডাকাতী মোকদ্দমার বিচার করিয়াছিলেন। ব্যারিষ্টার ৺আই, বি, সেন বলিয়াছিলেন যে, জেঙ্কিন্স সাধারণতঃ বিশেষ ন্যায়পরায়ণ ছিলেন না, অবস্থা-বিশেষে বিভিন্নরূপ ছল-চাতুরীও অবলম্বন করিতেন। কিন্তু কতিপয় বিপ্লবী যুবক (সাভারকর, কানাই প্রমুখ) প্রকাশ্য বিচারালয়ে নির্ভীক মুক্তকণ্ঠে ব্যক্ত করিয়াছিল, ইংরাজ রাজত্বে ন্যায়-বিচার নাই, তাই তাহারা আত্মপক্ষ সমর্থন করিবে না। ঐ সমস্ত উক্তির উল্লেখ করিয়া জার্মেণী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানের বিভিন্ন পত্রিকায় ইংরাজের ভারত শাসন সম্পর্কে নানারূপ বিরুদ্ধ সমালোচনা ও বিদ্রূপাত্মক রচনাদি প্রকাশিত হইয়াছিল। তাই জাষ্টিস জেঙ্কিন্স ইংরাজের বিশুদ্ধ ন্যায়পরায়ণতার সুনাম রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশেষভাবেই দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন বলিয়া শোনা গিয়াছিল। বাড়ুা ডাকাতীর মোকদ্দমা উপলক্ষে বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার সময়েই দুইজন পুলিশ কর্মচারীকে জাষ্টিস জেঙ্কিন্স মিথ্যা বলার অপরাধে ছয়মাস কারাবাসের আদেশ

দিয়াছিলেন। পুঙ্খানুপুঙ্খরূপ বিচারের ফলে জাষ্টিস জেঙ্কিস সিদ্ধান্ত করিলেন যে, পুলিশ যে নৌকা দুইটি উপস্থিত করিয়াছে তাহাই যে প্রকৃত ডাকাতীর নৌকা তাহার কোনই উপযুক্ত প্রমাণ নাই এবং পুলিশের বিভিন্নরূপ মিথ্যা আচরণ সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং মোকদ্দমাটি মিথ্যা এবং পুলিশের কল্পিতমাত্র। কতিপয় নির্দোষ ব্যক্তি ধৃত হইয়াছিল, তাহারা মুক্তি পাইল।



নড়িয়া ডাকাতী

আমার পৈতৃক ভূমি লোনসিংহ গ্রামের পার্শ্ববর্তী গ্রাম নড়িয়া। জানিতে পারিলাম নড়িয়া বাজারের এক মহাজনের দোকানেই প্রায় আশী হাজারের উপর নগদ টাকা সঞ্চিত আছে। তাহা ছাড়া বাজারের অন্যান্য দোকানেও বেশ কিছু পরিমাণ টাকা পাওয়া যাইবে বলিয়া জানিতে পারিলাম। আমি মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, নড়িয়ার বাজার হইতে যদি এক লক্ষ টাকা সংগ্রহ করিতে সক্ষম হই, তাহা হইলে ঐ টাকায় প্রয়োজনমত অস্ত্রশস্ত্র ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করিতে পারিব এবং উহার পরেই এইরূপ বিপদসঙ্কুল ডাকাতী পদ্ধতি পরিত্যাগ করিব।

নড়িয়া বাজারের সঠিক মানচিত্র ও যাতায়াতের সর্ববিধ সুবিধা অসুবিধা ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক সংবাদাদি সংগ্রহের জন্য এক এক সময়ে এক এক রূপে যুবকদের নিয়োজিত করিয়াছিলাম এবং তাহারা প্রত্যেকেই নিজ নিজ দায়িত্বভার পালনে খুবই তৎপরতার পরিচয় দিয়াছিল।

একদিন উক্ত নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা

ও আয়োজনে আমি ব্যস্ত আছি, এমন সময় সোনারং-এর মাখন সেন কয়েকজন বিশ্বস্ত সহচর লইয়া আমার কাছে আসেন। অনেক আলোচনার পর মাখন সেন আমার তৎকালীন কর্মপদ্ধতি পূর্ণভাবেই সমর্থন করিলেন এবং সর্বরূপে আমাকে সহযোগিতার আশ্বাসও দিলেন। মাখনবাবু যুগান্তর দলের সহিতই সংশ্লিষ্ট ছিলেন, তথাপি তাঁহার ন্যায় একজন শিক্ষিত, জ্ঞানী ও গুণী ব্যক্তির সহযোগিতা লাভে আমি নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করিয়া নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কে অংশগ্রহণেও তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি আগ্রহভরেই স্বীকৃত হইলেন।

স্থির হইল মাখনবাবু আমাদের কতিপয় যুবক সদস্যসহ সোনারং চলিয়া যাইবেন এবং ঘটনার দিন একটি ক্ষুদ্র নৌকাসহ পদ্মানদীর কোনও চড়াতে নির্দিষ্ট সঙ্কেতস্থলে অপেক্ষা করিবেন। ডাকাতী শেষ হইলে অস্ত্রশস্ত্রগুলি মাখনবাবুর বাড়ীতে লইয়া যাইবে এবং কলমা হইতে অপর একটি ক্ষুদ্র নৌকাও ঐ সঙ্কেতস্থলেই অপেক্ষা করিবে এবং সংগৃহীত অর্থাদি লইয়া কলমার গুপ্ত কেন্দ্রে চলিয়া যাইবে।

ইতিমধ্যে লোহার সিন্দুক ভাঙ্গিবার কৌশল কয়েকজন যুবক শিখিয়া লইয়াছিল। যাহা হউক, নড়িয়া ডাকাতীর প্রস্তাবিত নির্দিষ্ট দিনে একটি যুবক সিন্দুক ভাঙ্গিবার নিমিত্ত যন্ত্রাদিসহ নড়িয়া ষ্টেশনে নামিয়া একটি নৌকা ভাড়া করিয়া ষ্টেশন ঘাটেই অপেক্ষা করিতে লাগিল এবং নিকটবর্ত্তী এক হোটেলে আহারাদিও সম্পন্ন করিয়া লইল।

বাচড়া ডাকাতীর পর পি, মিত্রের নির্দেশ অনুসারে আমি তিন হাজার টাকা কলিকাতার অনুশীলন সমিতির সম্পাদক সতীশ বসুর

নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলাম। এইরূপ সিদ্ধান্ত হইয়াছিল যে, সতীশ বসু বিভিন্ন সময়ে কলিকাতা হইতে অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ করিয়া ঢাকায় আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। নড়িয়া ডাকাতীর দুই তিন দিন পূর্বে সতীশ বসু ব্যবস্থা করিয়া কলিকাতা হইতে নরেন্দ্র ভট্টাচার্যকে দিয়া দুইটি ট্রাঙ্কে ভরিয়া কয়েকটি রাইফেল ও কার্টিজ আমার নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। উক্ত নরেন্দ্র ভট্টাচার্যই পরে বিপ্লবী জীবনের প্রয়োজনে মানবেন্দ্র নাথ রায় বা এম, এন, রায় নামে পরিচিত হইয়াছেন।

ডাকাতীর দিন পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে যুবকগণ ভিন্ন ভিন্ন রাস্তা ধরিয়া নড়িয়া ঘাটে জড় হইল এবং 'আলি আলি' ধ্বনি করিয়া যথা নির্দিষ্ট শ্রেণীবদ্ধভাবে নৌকা হইতে অবতরণ করিল এবং বাজার অভিমুখে ধাবিত হইল। বাজারে এক মিঠাইওয়ালা ব্যতীত আর কেহ ছিল না; 'আলি আলি' ধ্বনি শুনিয়াই সকলে ভয়ে পলায়ন করিয়াছিল এবং বাজার হইতে প্রায় অর্ধমাইল দূরে রাস্তায় একত্র হইয়া ডাকাতগণকে ভয় দেখাইবার উদ্দেশ্যে 'হারে—রে-রে-রে' প্রভৃতি ধ্বনি করিতেছিল।

ঢাকার স্বনামখ্যাত উকীল রজনী গুপ্ত আমাদের সমিতির বিশেষ পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কিন্তু তিনি ডাকাতী সমর্থন করিতেন না এবং যখন জানিলেন যে, পি, মিত্র, বিপিন পাল, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ নেতাগণ রাজনৈতিক ডাকাতী সম্পর্কে সবিশেষ পক্ষপাতী তখন তিনি আর উহার প্রতিবাদ করেন নাই এবং নিরপেক্ষ রহিলেন। রজনী-বাবুর পুত্র ও ভ্রাতষ্পুত্রগণ সকলেই সমিতির সভ্য ছিল বটে কিন্তু ডাকাতী সম্পর্কে সর্বদাই বিরক্তির ভাব প্রকাশ করিত। রজনীবাবুর বাড়ী নড়িয়া হইতে অধিক দূরে নহে। যে সময়ে নড়িয়া ডাকাতী

সম্পর্কে নানাবিধ জল্পনা-কল্পনা চলিতেছিল তখন সমিতির যুবকগণের গতিবিধি দেখিয়া তাহারা বুঝিতে পারিয়াছিল যে, তাহাদের গ্রামের নিকটবর্তী কোনও বাজারে ডাকাতী হইবে এবং তাহারা নড়িয়া, ভোজেশ্বর, পালং, মুলফৎগঞ্জ, আঙ্গারিয়া প্রভৃতি স্থানের ধনী ব্যবসায়ীদের পূর্বেই পত্রযোগে ডাকাতীর আশঙ্কা প্রকাশ করিয়া পত্র দিয়াছিল। তাই ঘটনার দিন সন্ধ্যার সময় নড়িয়া বাজারের ব্যবসায়ী-গণ সকলে একত্র হইয়া কিংকর্তব্য বিষয়ে আলোচনা করিতেছিল। এমন সময় যুবকগণ বাজার আক্রমণ করিল এবং যুবকগণের সমবেত কণ্ঠের ধ্বনিতে পূর্বোক্ত একজন মিঠাইওয়ালা ব্যতীত সকলেই পলায়ন করিল।

ইতিমধ্যে একটি দুর্ঘটনা ঘটিল। যে যুবকটি পূর্বেই ষ্টীমার ঘাটে নৌকায় অপেক্ষা করিতেছিল সে ঐ নৌকা হইতে সিন্দুক ভাঙ্গিবার যন্ত্রপাতিগুলি নামাইবার জন্য বড় সর্দারের নিকট কিছু লোক সাহায্য চাহিতেছিল। নৌকার মাঝি যুবকটিকে ডাকাতগণের সহিত কথা বলিতে দেখিয়া সন্দেহ ভরে নৌকা ভাসাইয়া দিল। যুবকগণ নৌকাটি ধরিবার উপক্রম করিতেই মাঝি লগি দিয়া তাহাদিগকে আঘাত করিতে উদ্যত হইল। এই অবস্থায় নিরুপায় হইয়া একজন যুবক রিভলবার ছুড়িল। গুলি মাঝির মস্তক ভেদ না করিয়া অস্থিতেই আবদ্ধ হইয়া রহিল। মাঝি অবশ্য প্রাণ হারাইল না, কিন্তু নৌকা গভীর জলে ভাসিয়া গেল।

যুবকগণ নির্দিষ্ট গৃহে প্রবেশ করিয়া সিন্দুক দেখিতে পাইল বটে কিন্তু সিন্দুক ভাঙ্গিবার যন্ত্রপাতিগুলি অপহৃত হওয়ায় তাহারা অসুবিধায় পড়িল। দুই একজন যুবক বাজারের অন্যান্য দোকান খুঁজিয়া কয়েকটি কুঠার, ছেনী ও হাতুড়ী সংগ্রহ করিল এবং ঐ সকল

যন্ত্রের সাহায্যে পাঁচটী গৃহের পাঁচটী সিন্দুক ভাঙ্গিয়া ফেলিল। কিন্তু ঐ সিন্দুকগুলি হইতে মোট মাত্র পাঁচশত টাকা ও কিছু সোনা-রূপা পাওয়া গেল। পাশে আরও তিনটী ঘর ছিল। সেই তিন ঘরেও তিনটী সিন্দুক দেখিয়া যুবকগণ উহা ভাঙ্গিল এবং একটী সিন্দুকে প্রায় এক লক্ষ চারি হাজার, একটীতে প্রায় আট হাজার ও অপর আর একটীতে প্রায় ছয় হাজার টাকা পাইল। সিন্দুক ভাঙ্গিবার প্রয়োজনীয় যন্ত্রগুলি না থাকায় সিন্দুক ভাঙ্গিতে অত্যধিক বিলম্ব হইল। ডাকাতী সব সময়েই ক্ষিপ্রভাবে হওয়া বিধেয়, বিলম্ব হইলেই বিপদের সম্ভাবনা থাকে।

নড়িয়া গ্রামেই স্বনামখ্যাত শ্যামাকান্ত ও তাঁহার শ্যালক মধুসূদন মুখোপাধ্যায়ের নিবাস ছিল। মধুবাবুর বন্দুক ছিল, তিনি নির্ভীকও ছিলেন। কাজেই ডাকাতগণকে তিনি বাধা প্রদান করিবেন, ইহা আমি সহজেই অনুমান করিয়া লইয়াছিলাম ও ইহার প্রতীকার হেতু তিনটী যুবককে নির্দেশ দিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু যুবকগণ যথাযথ-ভাবে ঐ নির্দেশ পালন করিতে না পারায় মধুবাবু ঘটনাস্থলে আসিয়া বন্দুক ছুড়িলেন। মধুবাবুর গাতান বন্দুক ছিল, একসঙ্গে দুইবারের বেশী গুলি ছোড়া যাইত না। কাজেই মধুবাবুর গুলির বিনিময়ে যুবকগণও যখন বন্দুক ছুড়িল তখন আর মধুবাবুর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। সম্ভবতঃ অন্ধকারে তিনি আত্মগোপন করিয়া ফেলিলেন।

যুবকগণ একটী মিষ্টির দোকানের নিকট যাওয়া মাত্রই দোকানের মালিক বিনীতভাবে দুই তিন গামলা রসগোল্লা যুবকগণের দিকে আগাইয়া দিয়া বলিল, আপনারা মিঠাই যত পারেন খাইয়া যান, টাকা-কড়ি আমার নিকট কিছুই নাই।

এদিকে আবার এক বিপদ ঘটিয়া গেল। ডাকাতী করিতে

যাওয়ার সময় যুবকগণ বড় বড় বোতলে কেরোসিন তৈল ও লম্বা নেকড়ার পলিতার সাহায্যে মশাল তৈরী করিয়া সঙ্গে লইয়া যাইত। এইখানেও যথারীতি ঐরূপ মশাল তাহাদের সঙ্গে ছিল। সহসা একটী জলন্ত মশাল একজনের হাত হইতে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই আগুন জলিয়া উঠিল। কারণ ঐ ঘরটীর একপাশে কেরোসিন তৈলের ডিপো ছিল। কয়েকটী তৈলের টীনের মুখ কাটা অবস্থায় ছিল, আগুন তাই সহজেই তাহার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করিয়া দিল।

আশ-পাশের গ্রামের লোকজন উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল। আগুন লাগায় এবং একটা হতবুদ্ধিকর অবস্থার সৃষ্টি হওয়ায় যুবকগণ হাতের কাছে যে সামান্ত অর্থ পাইল তাহা লইয়াই নৌকায় আরোহন করিল।

যুবকগণ যদিও নিরাপদে প্রত্যাবর্তন করিতে সমর্থ হইল, তথাপি নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কে পুলিশের প্রখর অনুসন্ধান চলিতে লাগিল।

যেদিন উক্ত ডাকাতী হয়, সেদিন সন্ধ্যা হইতে রাত্রি পর্যন্ত এক বৃহৎ সভা উপলক্ষে আমি ঢাকা নর্থ ব্রুক হলে উপস্থিত ছিলাম। সুতরাং নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কে আমাকে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ ঢাকার পুলিশ কল্পনাও করিতে পারে নাই।

বিক্রমপুর নিবাসী সমিতির কয়েকজন যুবককে পুলিশ সন্দেহক্রমে গ্রেপ্তার করে কিন্তু প্রমাণাভাবে তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হয়। কিছুদিন পরে কাল্পনিক সন্দেহবশে পুলিশ কর্তৃক আরও কয়েকজন যুবক ধৃত হইল। তাহারা বাস্তবিকপক্ষে নির্দোষ এবং নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কে কিছুই জানিত না। ধৃত ব্যক্তিদের মধ্যে ঢাকার রজনী উকীলের গ্রাম ফতেজঙ্গপুরের গবেশ চট্টোপাধ্যায় ছিল।

গবেশ কারাবাসের আতঙ্ক হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যে ও কিছু পরিমাণে পুলিশের প্ররোচনায় কতকগুলি কাল্পনিক স্বীকারোক্তি করিয়া বসিল। প্রথমতঃ পুলিশ উৎফুল্ল হইয়া গবেশের আহার-বিহার পরিচ্ছদ প্রভৃতির সবিশেষ সুব্যবস্থা করিয়া দিল। কিন্তু বিভিন্নভাবে অনুসন্ধানের পরে পুলিশ বুঝিতে পারিল যে, গবেশ নড়িয়া ডাকাতী বা সমিতির গুপ্ত সংবাদাদি কিছুই জানে না এবং তখন হইতে পুলিশ গবেশকে তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করিতে লাগিল।

এদিকে সমিতির যুবকগণ গবেশকে গুপ্তচরগণের প্রতি প্রযোজ্য আদর্শ শাস্তি দিতে সংকল্প করিল এবং এক রাত্রিতে গবেশের শয্যায় শায়িত তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে গবেশ ভ্রমে হত্যা করিয়া আসিল। ঘটনার দিন সন্ধ্যা পর্যন্ত গবেশ বাড়ীতেই ছিল। কিন্তু তাহার পর সাংসারিক কার্যোপলক্ষে গবেশ মাদারীপুর চলিয়া গিয়াছিল। গবেশের সেই ভ্রাতাটি আমাদের সমিতির প্রতি খুবই অনুরক্ত ছিল এবং গবেশের বিশ্বাসঘাতকতায় রুষ্টও হইয়াছিল। কিন্তু সমিতির দুর্ভাগ্য বশতঃ ভুলক্রমে একজন হিতাকাঙ্খী মিত্র সমিতির সদস্যদের হস্তেই নিহত হইল।

পাঞ্জাব হইতে মুক্তির পর

পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেল হইতে মুক্ত হইবার পর আমি অল্প কিছুদিন ঢাকাতেই ছিলাম। শুনিলাম ঢাকার অনুশীলন সমিতি বে-আইনীরূপে ঘোষিত হওয়ার পর সমিতি-নিবাসের যুবকগণ প্রথমতঃ কলিকাতা আসিয়া পি, মিত্রের শরণাপন্ন হইল। পি, মিত্র তাহাদিগকে কলিকাতা সমিতির পরিচালক সতীশ বসুর তত্ত্বাবধানে রাখিয়া দিলেন। কিন্তু সতীশ বাবুর সহিত যুবকদের বনিবনাও না হওয়ায় ইহারা তাহার সংস্পর্শ ত্যাগ করিল এবং কলিকাতায়ই বাসা করিয়া গুপ্তভাবে সমিতির কার্য্যাদি পরিচালনা করিতে লাগিল। এই সময় পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, যুক্তপ্রদেশ, পাঞ্জাব, বোম্বাই, মাদ্রাজ ইত্যাদি স্থানেও ঢাকার অনুশীলন সমিতির শাখা স্থাপিত হইল। ক্রমে বিক্রমপুর সোনারং গ্রামে মাখনবাবুর বাড়ীতেই সমিতির প্রধান কেন্দ্র স্থাপিত হইল। তথায় মাখনবাবু একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করিলেন। এই সময় দুই চারিটি ডাকাতীও হইয়াছিল, কাজেই অর্থাভাবও দেখা দেয় নাই।

কতিপয় যুবক বিদ্রোহী হইয়া ভিন্নভাবে কাজ করিতে চেষ্টা

করিয়াছিল। কিন্তু তাহারা সফলকাম হইতে পারে নাই। ঐ বিদ্রোহী দলের একটি যুবক—দূর সম্পর্কে আমারই একজন আত্মীয়, গুপ্তচর হিসাবে সোনারং কেন্দ্রে প্রবেশ করিলে গুপ্তভাবেই নিহত হইয়াছিল।

আমার ঢাকা বাসার সম্মুখে দিবা-রাত্রি পুলিশের গুপ্তচর নিযুক্ত থাকিত এবং পুলিশের লোকেরা আসিয়া মধ্য রাত্রিতে প্রায়ই ডাকাডাকি করিত। আমি বাড়ীর বাহিরে কোথাও গেলে গুপ্তচরগণ আমাকে অনুসরণ করিত।

পুলিশ নানারূপ ছল-ছুতায় আমার বিরুদ্ধে একটি মামলা সাজাইবার চেষ্টায় ছিল। আমার বাসায় সময়-অসময়ে লোকজন আসিত বলিয়া গুপ্তচরের আনাগোনাও বাড়িতে থাকে। আমার এক মামাতো ভাই ঢাকা উয়াড়ী পোষ্ট-অফিসে পোষ্ট মাষ্টার ছিলেন। আমার সহিত প্রকাশ্যস্থানে কথা বলার অপরাধে তিনি ঢাকা হইতে স্থানান্তরিত হইলেন। এই সকল কারণে তিক্ত-বিরক্ত হইয়া আমি সাময়িকভাবে কলিকাতায় থাকিবার জন্য চলিয়া আসি ও আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের সংযোগস্থলের সন্নিকটে একটি ছাত্রাবাসে উঠি এবং আমার ভগ্নিপতি প্রমথনাথ ঘোষের আতিথ্য গ্রহণ করি। আমি পুনর্বার ধৃত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত আমার সমস্ত ব্যয়ভার সোনারং কেন্দ্র হইতে মাখনবাবু বহন করিতেন। আমি যে ছাত্রাবাসে থাকিতাম সেইখানে ঢাকা, সিলেট ও কলিকাতার বিভিন্ন স্থানের ব্যক্তি যুবক-প্রৌঢ় নির্বিশেষে অনেকেই আসিতেন। এই কারণে পুলিশের দৃষ্টি এইখানেও ধাবিত হইল। হঠাৎ একদিন রাত্রি প্রায় এগারটার সময় বহু পুলিশ আসিয়া ছাত্রাবাসটি ঘিরিয়া ফেলিল। আমি যে ঘরে শুইয়া ছিলাম তথায় একজন গুপ্তচরকে সঙ্গে লইয়া

কয়েকজন বাঙ্গালী এবং ইউরোপীয় পুলিশ কর্মচারী ও অফিসার আসিয়া হাজির হইলেন। মিঃ টেগার্ট কিছুক্ষণ আমার সহিত বিদ্রূপপূর্ণ রসিকতা করিলেন। আমার ঘরে একজন মাতৃ-পিতৃহীন বালক থাকিত। মিঃ টেগার্ট তাহার দিকে অঙ্গুলী সঙ্কেত করিয়া বলিলেন, এই বুঝি তোমার একজন নতুন আমদানী। তিনি আরও বলিলেন, শুনিয়াছি যে, তুমি নাকি লোককে 'হিপ্নোটাইজ' করিতে পার, এখন আমাকে 'হিপ্নোটাইজ' কর।

আমি জবাব দিলাম, তোমার নিকট এই প্রথম শুনিলাম যে, আমি 'হিপ্নোটাইজ' করিতে পারি, কিন্তু আমি এই বিষয়ে কিছুই জানি না।

আমার ঘরে রাধাকৃষ্ণের একটি ছবি ছিল। ঐ ছবিটিকে লক্ষ্য করিয়া মিঃ টেগার্ট বলিলেন, আচ্ছা তোমরা কৃষ্ণকে কাল করিয়া চিত্র কর কেন? আমি বলিলাম যে, সম্ভবতঃ তাঁহার স্বাভাবিক বর্ণই কাল ছিল; ইহা ছাড়া আমি আর কিছুই জানি না।

টেগার্ট তখন অন্য কথা পাড়িলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, আমাকে যদি কোন উপযুক্ত চাকুরী দেওয়া হয়, তাহা হইলে উহা আমি গ্রহণ করিব কিনা?

আমি বলিলাম, কিরূপ চাকুরী জানিলে মতামত বলিতে পারি।

টেগার্ট বলিলেন, ধর পুলিশ ইনস্পেকটরের পদ।

আমি বলিলাম, আমার পারিবারিক মর্য্যাদা বিচার করিয়া আমার পক্ষে ঐরূপ পদ গ্রহণ করা অসম্ভব। ইহা ছাড়া, তোমরা আমাকে ডিপোর্টেশনে পাঠাইয়া দেশের লোকের কাছে আমার যেরূপ প্রতিষ্ঠা স্থাপিত করিয়াছ, তাহাতেও আমি পুলিশ ইনস্পেক্টরের পদ গ্রহণ করিতে পারি না।

এইরূপ কথোপকথনের পর একজন পুলিশ কর্মচারী রাস্তা হইতে

তিনজন অর্ধ উলঙ্গ সাধারণ হিন্দুস্থানী কুলী বা নগ্দা মুটে ধরিয়া আনিয়া তাহাদিগকেই অনুসন্ধান সাক্ষীরূপে হাজির করিল। ক্রমে ঘরের আনাচে-কানাচে তল্লাসী করিয়া পুলিশ কয়েকটি খাতা-পত্র হস্তগত করিল, তন্মধ্যে একটি নোটবুকে গুরুমুখী ভাষায় আমার তিনজন শিখবন্ধুর ঠিকানা লেখা ছিল। মণ্টগোমারী জেল হইতে প্রত্যাবর্তনকালে ঐ ঠিকানা লইয়া আসিয়াছিলাম। নোট বুকটি পুলিশ লইয়া গেল।

একজন পুলিশ কর্মচারী ঘরের এক কোণে রক্ষিত চট দ্বারা বেষ্টিত সেলাই করা একটি বস্তা খুলিতে ব্যস্ত হইয়া পড়িল। অন্যান্য দ্রব্যের সহিত এই বস্তাটিও মণ্টগোমারী জেল হইতে আমার জন্যই প্রেরিত হইয়াছিল। ছুরি দিয়া কাটিয়া বস্তাটি খোলা হইলে দেখা গেল যে, ইহার ভিতরে একটি গদী রহিয়াছে। পুলিশ কর্মচারিটি ইহা দেখিয়া সকৌতুকে অন্য কর্মচারীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিয়া উঠিলেন, ওহো, অসংখ্য গোলা-বারুদ-বন্দুক ইহার মধ্যে পাওয়া গেল।

পরে শুনিলাম, গুপ্তচরগণ নাকি সংবাদ দিয়াছিল যে, ঐ বস্তার মধ্যে রাইফেল-রিভলবার, গোলা-গুলি ভরিয়া আমি ঢাকা পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতেছি। যাহা হউক, পুলিশের আশা মিটিল না।

একদিন এক গুপ্তচর আসিয়া আমাকে জানাইল যে, আমি কাহাদের সহিত চলাফেরা করি বা কথাবার্তা বলি, তাহা জানিবার জন্য গভর্ণমেণ্টের তেমন উৎসাহ নাই। তাঁহারা চাহেন যে, অরবিন্দ ঘোষের মত আমি যেন পলাইয়া যাইতে না পারি।

এই সময় একদিন সোনারং কেন্দ্রের কয়েকজন কর্মী-প্রতিনিধিকে লইয়া আলোচনার উদ্দেশ্যে মাখনবাবু কলিকাতা আসিলেন। আলোচনার পর মাখনবাবুর সহিত মোটামুটি মতৈক্য স্থাপিত হইল।

আলোচনা প্রসঙ্গে মাখনবাবু এইরূপ প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, অনুশীলন সমিতি রামকৃষ্ণ মিশনের আদর্শ গ্রহণ করিয়া সেইরূপে পরিচালিত হউক। মিশনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করিয়াও আমি এই বলিয়া আপত্তি জানাইয়াছিলাম যে, রামকৃষ্ণ মিশন ধর্মমূলক প্রতিষ্ঠান ও অনুশীলন সমিতি একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। সুতরাং উভয়ের আদর্শ একরূপ হইতে পারে না।

ইতিমধ্যে গবেশের ভ্রাতার হত্যা সম্পর্কে সুরেন্দ্র ঘোষ ধৃত হইল। মোকদ্দমা ফরিদপুরে আরম্ভ হইল কিন্তু মাখনবাবুর পরিচালনায় সুরেন্দ্র মুক্তি পাইল।

এই সময়ের একটি ঘটনা বলা প্রয়োজন। সার্কুলার রোডের বর্তমান লেডিস পার্কের তখন নাম ছিল ফেডারেশন পার্ক। ঐ স্থানে ক্রমান্বয়ে তিনদিন আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের সহিত আমার সাক্ষাৎ হয়। কথায় কথায় তিনি আমাকে জানাইয়াছিলেন যে, আমি যদি উপযুক্ত লোক সংগ্রহ করিতে পারি, তাহা হইলে যুদ্ধের উপাদান নির্মাণে রসায়ন শাস্ত্রের সর্বাধুনিক প্রণালী তিনি শিখাইয়া দিতে পারিবেন।

কলিকাতায় আদর্শ আর্য নিবাসে অবস্থানকালে একদিন সি, আই, ডি, পুলিশ ইনস্পেক্টার নৃপেন্দ্র ঘোষ (যিনি পরে চীৎপুর ট্রাম লাইনের কোনও সংযোগস্থলে নিহত হইয়াছিলেন) আসিয়া আমাকে মিঃ টেগার্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। প্রথমে আমি স্বীকৃত হইয়াছিলাম। কিন্তু পরে কথাপ্রসঙ্গে তিনি আরও জানাইলেন যে, আমি যাহা কিছু করিয়াছি এবং যাহা জানি সমস্তই যদি ব্যক্ত করিয়া দেই, তাহা হইলে গভর্ণমেণ্ট এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দিবেন এবং পাঁচশত টাকার একটী চাকুরী দিবেন। বলা বাহুল্য, আমি মিঃ টেগার্টের সহিত দেখা করিতে অস্বীকৃতি জানাইলাম।

এই সময় আমি প্রায় প্রত্যহই পি, মিত্রের বাড়ী যাইয়া তাঁহার সহিত নানা বিষয়ে আলোচনা করিতাম। একদিন পি, মিত্র জানাইলেন যে, আমি যেন দিনকয়েক আর তাঁহার বাড়ীতে না যাই, কারণ আমাকে একটী ষড়যন্ত্র মামলায় জড়াইবার চক্রান্ত পুলিশ করিতেছে। আমি পি, মিত্রের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি গ্রহণ করিয়া ঢাকা চলিয়া আসিলাম।

এইবার ঢাকা আসিয়া অনুভব করিলাম যে, পুলিশের তৎপরতা পূর্বের অপেক্ষা অনেক বাড়িয়াছে এবং যে সমস্ত যুবকগণ আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিত তাহাদিগকে থানায় লইয়া গিয়া নানারূপ জিজ্ঞাসাবাদ করা হইত ও কাহাকেও কাহাকেও আটক করিয়া রাখা হইত। কলিকাতা হইতে ঢাকা আসিবার দিনকয়েক পরেই পুলিশ আমার বাসা খানাতল্লাসী করে এবং কিছু চিঠি ও কাগজপত্র সন্দেহ-ক্রমে লইয়া যায়। আমার পুত্রের খেলিবার একটী হাওয়া-বন্দুক ও ইহার কিছু ছড়্রাও পুলিশ হস্তগত করে। পুলিশ অস্ত্র আইনে আমাকে গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ প্রথমে আমাকে কোতোয়ালীতে লইয়া গেল। তথায় গিয়া দেখিতে পাইলাম ইতিমধ্যেই আরও দুই তিনজন সমিতির যুবক ধৃত হইয়াছে। থানার প্রধান কর্মকর্তা বঙ্কিম চৌধুরী (পরে ময়মনসিংহে নিহত) অস্ত্র আইন সম্পর্কিত মোকদ্দমাসমূহ পরিচালনা করিতেছিলেন। তিনি আমাকে সনাক্তকরণের উদ্দেশ্যে কয়েকজনকে বলিলেন, কিন্তু কেহই আমাকে সনাক্ত (identify) করিল না। সেইদিন হাজতে প্রেরিত হইলাম। পরের দিন পুলিশ ইন্‌স্‌পেক্‌টার বঙ্কিমবাবু আসিয়া আমাকে জানাইলেন, "আপনি অস্ত্র আইন মোকদ্দমা হইতে মুক্ত হইয়াছেন, কিন্তু—" বলিয়াই তিনি কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি বলিলাম যে, সম্ভবতঃ অন্য কোনও মোকদ্দমায় জড়িত হইয়াছি। তিনি কোন কথা না বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সমর্থন জানাইলেন।

এই ঘটনার কিছুক্ষণ পরেই দেখিতে পাইলাম যে, ঢাকার উকীল ললিত রায় ও আরও দশ বার জন সমিতির যুবক ধৃত হইয়া আসিল।

জেল হইতে বাহির হইয়া বঙ্কিমবাবু একটী পরোয়ানা লইয়া আবার আমার কাছে আসিলেন এবং আইনগত প্রথা অনুসারে আমাকে স্পর্শ করিয়া পুনরায় গ্রেপ্তার করিলেন। বঙ্কিমবাবু আমাকে সঙ্গে করিয়া ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়ী চলিয়া গেলেন, তথায় দেখিলাম আরও তিন চার জন যুবক ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপেক্ষা করিতেছে। ম্যাজিষ্ট্রেট বিশেষ কিছু বলিলেন না, শুধু জানাইয়া দিলেন যে ১১ই আগষ্ট মোকদ্দমার দিন ধার্য হইয়াছে।

বঙ্কিমবাবু ও আরও দুই তিন জন পুলিশ কর্মচারী আমাকে এবং ধৃত অপর যুবকদিগকে গাড়ী করিয়া জেলে লইয়া আসিলেন। জেলার আমাদিগকে ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কক্ষে বন্ধ করিয়া রাখিল।

দেখিলাম ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন যুবক ধৃত হইয়াছে। আমার সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা—যে নোয়াখালী জেলায় অনেকগুলি শাখা-সমিতি স্থাপন করিয়াছিল, বাঢ়্ড়া ডাকাতীর শচীন ও শশী, টাঙ্গাইলের মোক্তার অমর ঘোষ, সিরাজগঞ্জ মিউনিসিপালিটীর ভাইস-চেয়ারম্যান বঙ্কিম রায় এবং আরও দুইজন বৃদ্ধও ধৃত ও কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। বৃদ্ধদ্বয়ের অপরাধ তাহাদের পলাতক পুত্রদের সন্ধান পুলিশ পাইতেছে না। সর্বসাকুল্যে ৫৫ জনের নামে পরোয়ানা বাহির হইয়াছিল, তন্মধ্যে দুইজন পরলোকে, ৪৪ জনকে গ্রেপ্তার করিয়াছিল এবং বাকী সকলেই পলাতক। ত্রৈলোক্য চক্রবর্ত্তী ও অমৃত হাজরার নামেও পরোয়ানা ছিল কিন্তু তাঁহারা পলাতক ছিলেন।

নিম্ন আদালতে বিচার

অতিরিক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট বেন্টিঙ্ক সাহেব প্রাথমিক বিচার আরম্ভ করিলেন। রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন, যুদ্ধহেতু অস্ত্র সংগ্রহ এবং রাজদ্রোহিতা—এই তিন ধারায় আমাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা হইতেছিল। রমনা মাঠের সন্নিকটে বেন্টিঙ্ক সাহেবের আবাস গৃহের নিম্নতলেই বিচারালয় নির্দিষ্ট হইল।

প্রথম দিন বিচারালয়ে উপস্থিত হইয়াই দেখিলাম শ্রীশ চট্টোপাধ্যায়, শশাঙ্ক বসু, বিভু ঠাকুরতা, নিবারণ গুহ মৌস্তফী এবং আরও কয়েকজন উকীল পূর্ব হইতেই অপেক্ষা করিতেছেন। সেই সঙ্গে কয়েকজন সংবাদ-সংগ্রাহকও ছিলেন। তাঁহারা দূর হইতেই সকলে আমাদিগকে অভিনন্দন জানাইলেন। নিযুক্ত উকীলগণ ব্যতীত অপর কাহারও সহিত আমাদের কথা বলা নিষিদ্ধ ছিল। উকীলগণ মোকদ্দমা সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করিলেন এবং পি, মিত্রের লেখা একটী চিঠিও দেখাইলেন।

পি, মিত্র এই মোকদ্দমার দায়িত্বভার গ্রহণ হেতু নিতান্তই ঔৎসুক্য জানাইয়া দুই তিনখানা চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু সহসা গুরুতর-

ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং অল্পকাল মধ্যেই আমাদের মায়া পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তিনি যে শেষ পর্যন্ত আমাদের ভাবনাই ভাবিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সর্বশেষ পত্রে তাহারও উল্লেখ ছিল। আমাদের দুর্ভাগ্য, অন্তিমকালে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সুযোগ-টুকুও পাইলাম না এবং সেবা শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার ঋণের কিয়দংশও পরিশোধ করিতে পারিলাম না।

আমাদের মোকদ্দমায় গভর্ণমেন্টের পক্ষ হইতে নলিনী গুপ্ত, পি, এল, রায় ও অপর একজন বাঙ্গালী ব্যারিষ্টার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শুনিয়াছি, মোকদ্দমার কাগজ-পত্র পড়িবার জন্য পি, এল, রায় এক লক্ষ টাকা পারিশ্রমিক লইয়াছিলেন এবং তাঁহার দৈনিক পারিশ্রমিক ছিল এক হাজার টাকা। এই মোকদ্দমা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রায় সাতমাস কাল চলিয়াছিল।

সশস্ত্র সিপাহীগণ আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া প্রত্যহ বিচারালয়ে লইয়া আসিত এবং সন্ধ্যায় জেলখানায় পৌঁছাইয়া দিত। দুইজন একত্র করিয়া হাতকড়ি লাগান হইত, বিচারালয়ে সিপাহীগণ এবং জেলখানায় গুর্খাগণ হাতকড়ি খুলিয়া দিত। জেলখানাতে হাতকড়ি খোলার পর জেলার, সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট ও গুর্খা ক্যাপ্টেন আমাদিগকে একে একে উলঙ্গ করিয়া তল্লাসী করিত এবং পরে এক একজনকে বিভিন্ন নির্দিষ্ট কক্ষে লইয়া গিয়া তালাবদ্ধ করিয়া দিত।

সশস্ত্র গুর্খাগণ পালা করিয়া দিবা-রাত্রি পাহারা দিত। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ গুপ্তচরভাবে আমাদের নিকট হইতে সংবাদাদি সংগ্রহ করিবারও চেষ্টা করিত। কেহ কেহ বা প্রাণ খুলিয়া সহৃদয়-ভাবে আলাপ-আলোচনা করিত, আবার কেহ কেহ বা রূঢ় ব্যবহারও করিত। দুই একটী গুর্খা কখনও কখনও 'এখানে দাঁড়াইও না, ওখানে

বসিও না' ইত্যাদি বলিয়া কয়েদীদের নানাভাবে উত্যক্ত করিত। একবার ইহা লইয়া এক গুর্খার সহিত একটী যুবকের সামান্য কলহ হয়। জেলার আসিয়া যুবকটীকে কঠোরভাবে ধমকাইয়া গেলেন এবং গুর্খা ক্যাপ্টেনের নির্দেশ মতে সমস্ত গুর্খাগণই বেশ উগ্রমূর্তি ধারণ করিয়া অন্যান্য যুবকগণের সঙ্গেও রূঢ় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল। তাই যুবকগণ নিরাপদে থাকিবার নিমিত্ত প্রত্যেকেই আপন আপন নির্জন কক্ষে প্রবেশ করিল। সংবাদ পাইয়া জেলার দৌড়াইয়া আসিয়া তিরস্কার বর্ষণ করিতে সুরু করিলেন এবং তাহারই আদেশে আমরা পুনরায় কুঠুরী হইতে বাহির হইয়া নিকটস্থ ময়দানে বিচ্ছিন্ন-ভাবে অবস্থান করিতে লাগিলাম। কিছুক্ষণ পরে জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া পুনরায় আমাদিগকে কুঠুরীতে বন্ধ করিলেন। তারপর স্নানের সময় পুনরায় একবার কুঠুরী হইতে মুক্ত করা হইল। এই সময় ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ কারের নির্দেশমতে আমরা সকলে বেত্রাঘাত-মঞ্চের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়াইলাম। ম্যাজিষ্ট্রেট জেল-কোড্ খুলিয়া তাহা হইতে একটী আইনের ধারা রুক্ষকণ্ঠে পড়িয়া শুনাইলেন এবং রুক্ষকণ্ঠেই বুঝাইয়া দিলেন অবস্থা বিশেষে বিচারাধীন বন্দীদিগকেও বেত্রাঘাত করা আইন-সঙ্গত হইয়া থাকে। পরে বেত্রাঘাত-মঞ্চে একটী খড়ের বস্তা যোজিত হইল এবং ম্যাজিষ্ট্রেটের নির্দেশ অনুসারে বেত্রাঘাত কার্যে নিযুক্ত কয়েদী আসিয়া যথারীতি ত্রিশটি বেত্রাঘাত করিল। তৎপর ম্যাজিষ্ট্রেট ক্রোধ বিস্ফারিত নেত্রে তীব্র গর্জন করিয়া আমাদিগকে বলিলেন, "এখন বুঝিলে ত ?"

যেদিন বিচারালয়ে যাইতে হইত, সেদিন বৈকালিক আহারের জন্য আমাদের সঙ্গেই গুড় ও রুটি প্রেরিত হইত। যাহারা সামান্য অসুস্থ থাকিত তাহাদের জন্য বোতলে ভরিয়া ঘোল দেওয়া হইত।

বিচারালয়ে কাহারও মলমূত্র ত্যাগের প্রয়োজন হইলে তাহার কটিদেশে দড়ি বাঁধিয়া একজন সিপাহী তাহাকে বাহিরে লইয়া যাইত, সঙ্গে আরও দুইজন সশস্ত্র সিপাহী থাকিত।

যে বাড়ীটিতে আমাদের সমিতি-নিবাস ছিল পুলিশ পূর্বেই তাহা ভাড়া লইয়াছিল। মোকদ্দমার সময় সেই বাড়ীতেই গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে বিভিন্ন সাক্ষীকে শিক্ষা দেওয়া হইত—গভর্ণমেণ্ট উকীল শরৎ ঘোষ (ছোট) প্রত্যহ এক ঘণ্টা কাজ করিয়া যাইতেন এবং শুধু এই জন্যই দৈনিক একশত টাকা পারিতোষিক পাইতেন।

মোকদ্দমা ক্রমাগত চলিতে লাগিল। বিভিন্ন স্থানের, বিভিন্ন শ্রেণীর চারিশতেরও অধিক লোকের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইল, তন্মধ্যে তিন চতুর্থাংশই পুলিশের লোক। পুলিশ সাক্ষী ব্যতীত আর প্রায় কেহই আমাদের অনিষ্টকর কোন কিছু বলে নাই। আমার এক খুড়তুত ভাইও সাক্ষ্য দিয়াছিল। পুলিশের নির্দেশমতে কতকগুলি লেখাকে সে আমার হাতের লেখা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। আমার সেই ভাই পরে সাব্-ডেপুটী পদে নিযুক্ত হইয়াছিল।

বিচারালয়ে সাক্ষ্য দেওয়া কালে কোন কোন সাক্ষী প্রথমতঃ কর্তৃপক্ষের প্রদত্ত শিক্ষানুসারেই বলিতে আরম্ভ করিত। কিন্তু আমার সহিত দৃষ্টি বিনিময় হইলেই আর শিখান কথা বলিতে পারিত না এবং কেমন যেন বিহ্বল হইয়া পড়িত। এই বিষয়টি গভর্ণমেণ্ট ব্যারিষ্টার নলিনী গুপ্তই প্রথম আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং এই সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি রাউলাট রিপোর্টেও উল্লেখ করা হইয়াছে। তাই সেসন কোর্টের বিচারকালে সাক্ষিগণের দাঁড়াইবার স্থান এরূপভাবে নির্মিত হইয়াছিল যে, আমার দিকে পশ্চাৎ করিয়া তাহাদিগকে দাঁড়াইতে হইত। সুতরাং আর দৃষ্টি বিনিময়ের সম্ভাবনা ছিল না।

নিম্ন আদালতে আমাদের উকীলগণ কোন সাক্ষীকেই কোনরূপ জেরা করেন নাই। কিন্তু টাঙ্গাইলের মোক্তার অমরেন্দ্র ঘোষ ময়মনসিংহ হইতে তাহার কোনও বন্ধু উকীল আনাইয়া ভিন্নভাবে নিজ পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন এবং নিম্ন আদালত হইতেই তিনি মুক্তিলাভ করেন। পরে জানিতে পারিয়াছিলাম যে, তিনি তাহার বন্ধু-বান্ধবগণের সাহায্যে জেলার, জেল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ম্যাজিষ্ট্রেট, পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রমুখ ব্যক্তিদের উপঢৌকন প্রেরণ করিয়া এবং নিজেও কোন বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ হইয়া আপন মুক্তির ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রবাবু পরে সি, আর, দাসের অধীনে একজন প্রধান কংগ্রেস কর্মী হইয়াছিলেন।

প্রত্যেক সাক্ষীরই সাক্ষ্য শেষ হওয়া মাত্র ম্যাজিষ্ট্রেট লিখিত ঐ সমস্ত ভাষণের টাইপ করা ও ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি আমাদের উকীলগণ আদায় করিতেন। কিন্তু যে সমস্ত ভাষণ ঠিক গভর্ণমেণ্টের মনোমত হইত না সেই সমস্ত ভাষণের প্রতিলিপি টালবাহানা করিয়া সেদিন দিতেন না। ঠিকমত সাজাইয়া গুছাইয়া পরের দিন ঐ ভাষণ মোকদ্দমার ফাইলে নথিভুক্ত করিতেন।

জজকোর্টে

ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে আমাদের বিচার শেষ হওয়ার পূর্বেই রাজেন্দ্রপুর ট্রেণ ডাকাতী সম্পর্কে মধ্যপাড়া গ্রামের সুরেশ সেন ধৃত হইল এবং ডিষ্ট্রিক্ট জজ স্বয়ং সেই বিচার করিলেন এবং জুরিগণ সকলেই সুরেশকে নির্দোষ বিবেচনা করা সত্ত্বেও জজ সাহেব মোকদ্দমা হাইকোর্টে পাঠাইয়া দিলেন। এই সম্পর্কে তিনি সর্বরূপ রাজ-দ্রোহিতাসূচক কর্মের এবং তৎসম্পর্কিত হত্যা ও ডাকাতীর জন্য আমাকে ও অনুশীলন সমিতিকে দায়ী কল্পনা করিয়া কতকগুলি অপ্রিয় কটুক্তি করিয়াছিলেন। নিম্ন আদালতে আমাদের বিচার শেষ হওয়ার দুই তিন মাস পরে যেদিন প্রথম জজকোর্টে আমাদের বিচার আরম্ভ হইল, সেদিনই আমাদের উকীলগণ ঐ সমস্ত অপ্রিয় উক্তিসমূহের উল্লেখ করিয়া এবং আইনের দাবী ধরিয়া আপত্তি জানাইয়া বলিলেন—যেহেতু ডিষ্ট্রিক্ট জজ অনুশীলন সমিতি ও পুলিনবাবুর প্রতি বিরুদ্ধ সংস্কার সম্পন্ন, অন্য কোন জজকে এই বিচারের দায়িত্বভার অর্পণ করা হউক। ফলে শেষ পর্যন্ত অতিরিক্ত ডিষ্ট্রিক্ট জজ কুট সাহেব আমাদের মোকদ্দমা গ্রহণ করিলেন।

শ্রীশবাবু, শশাঙ্কবাবু, বিভু ঠাকুরতা, নিবারণ গুহ মৌস্তফী প্রমুখ উকীলগণ ব্যতীত ঢাকার শ্রেষ্ঠ উকীল প্যারী ঘোষ এবং বীরেন্দ্র মজুমদার, হেমেন্দ্র দাসগুপ্ত ও আরও কয়েকজন নবীন উকীলও আমাদের পক্ষ সমর্থন করিলেন। কলিকাতা হইতে ব্যারিষ্টার সি, আর, দাস আসিয়া আমাদের পক্ষ সমর্থনহেতু প্রধান পরিচালক নিযুক্ত হইলেন।

মোকদ্দমা আরম্ভ হওয়ার পূর্বে সি, আর, দাস জেলে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, "নূতন ভাইসরয় লর্ড হার্ডিঞ্জের সঙ্গে আমার কথা-বার্তা হইয়াছে। তিনি প্রস্তাব করিযাছেন যে, ধৃত ব্যক্তিগণ যদি সাধারণভাবে দোষ স্বীকার করে, তবে মাত্র অল্প দুই চারজনের সামান্য শাস্তি হইবে—অপর সকলকেই মুক্তি দেওযা হইবে। অধিকন্তু আপনার রচিত পরিদর্শক প্রভৃতি ও সমিতির বিভিন্ন নিয়ম প্রণালী-গুলির মধ্যে এইরূপ কতকগুলি রাজদ্রোহসূচক উক্তি আছে, যাহার কোনরূপই সন্তোষজনক ব্যাখ্যা করা যাইবে না। ঢাকার সর্বশ্রেষ্ঠ উকীল আনন্দ রায়ও গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোসের পক্ষপাতী। এখন আপনার মত কি?"

আমি বলিলাম যে, যদি দেশেব প্রকৃত কল্যাণ হয় এবং আপনারা যদি সিদ্ধান্ত করেন, তবে আমি নিজে বিনা বিচারেও যে-কোনরূপ শাস্তি গ্রহণে প্রস্তুত আছি। কিন্তু অপর যাহাদের শাস্তি গ্রহণ করিতে হইবে তাহাদের নাম ও তাহাদের মতামত না জানিয়া কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ করা আমার পক্ষে অসম্ভব।

সি, আর, দাস মহাশয় আমার সঙ্গে পুনরায় সাক্ষাৎ করিবেন বলিলেন। কিন্তু এদিকে শ্রীশবাবু ও ঢাকার অন্যান্য উকীলগণ সি, আর, দাসের প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। ইহার দিন কয়েক পরে

কোর্টে সি, আর, দাস আমাকে জানাইলেন যে, গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে আপোসের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইয়াছে।

সেসন কোর্টে বিচারারম্ভের প্রথম দিনেই সি, আর, দাস যুক্তি-প্রভাবে আমাদের বিরুদ্ধে আরোপিত দুইটি ধারা নাকচ করিয়া দিলেন। শুধু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধায়োজনের প্রচেষ্টা হিসাবে যে অভিযোগ ছিল সেই ধারাটিই রহিল।

সি, আর, দাস আর একটী আইনগত ত্রুটি ধরিলেন। দণ্ডবিধির ধারামতে রাজদ্রোহিতা সম্পর্কিত মোকদ্দমা আনয়নের উদ্দেশ্যে আদেশ প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে যে রাজ-প্রতিনিধিগণের নামোল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পূর্ববঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের নামই ছিল না। সুতরাং ঢাকা ষড়যন্ত্র মোকদ্দমা চলিতে পারে না। কারণ পূর্ববঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণর এই মোকদ্দমা সম্পর্কে আদেশ দিয়াছেন অথচ দণ্ডবিধির এই আইন রচিত হইয়াছিল বঙ্গভঙ্গের বহু পূর্বে, তখন পূর্ববঙ্গের লেফ্‌টেন্যাণ্ট গভর্ণরের কোন পদই ছিল না।

জজ মিঃ কুট এই সম্পর্কে কোন মীমাংসা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন যে, এই সম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্ত হাইকোর্টই করিবেন এবং হাইকোর্টের সিদ্ধান্ত না হওয়া পর্যন্ত মোকদ্দমা যথারীতি চলিতে থাকিবে।

মোকদ্দমার প্রথম অবস্থায় কয়েকজন গ্রাম্য-সাক্ষী পুলিশের শিক্ষামতে, বিনা দ্বিধায় বিভিন্নরূপ অদ্ভুত মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। ঐরূপ এক ব্যক্তি সাক্ষ্যপ্রদানের তিন চারিদিন পরেই বিক্রমপুরে তাহার নিজ বাটীতে রাত্রিতে কুঠারাঘাতে নিহত হয়। এই ঘটনার পর সমস্ত সাক্ষীই নিতান্ত সংযতভাবেই সাক্ষ্য প্রদান করিত। ইতিপূর্বে ম্যাজিষ্ট্রেটের প্রিয় দারোগা শরৎ ঘোষকেও হত্যা করার চেষ্টা

হইয়াছিল। শরৎ ঘোষের ভুঁড়ি ছিল, গুলি ভুঁড়িটাকে ভেদ করিয়াছিল বটে, কিন্তু অভ্যন্তরের পাকস্থলী স্পর্শ করে নাই। তাই গুলি লাগিয়া শরৎ ঘোষ অচৈতন্য অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে আততায়ীগণ মনে করিয়াছিল যে, সে মরিয়া গিয়াছে। এই সব কারণে মিথ্যা সাক্ষ্যপ্রদান সংযত হইল বটে কিন্তু আমার প্রতি গভর্ণমেন্টের আক্রোশ বাড়িয়া গেল।

একদিন বিচারালয় হইতে জেলে প্রত্যাবর্তনের সময় বিজয় রাহা নামে একটী যুবক অসংলগ্ন কথা বলিতে সুরু করে এবং জানায় যে সে রাজসাক্ষী হইবে। পুলিশ তাহার নিকট হইতে গুপ্ত তথ্য ফাঁস করিবার অনেক চেষ্টা করে এবং যদিও পুলিশের পক্ষে কোন কোন লোভনীয় উক্তি সে করে, তথাপি শেষ পর্যন্ত পুলিশের নানাপ্রশ্নে বিব্রত হইয়া সে আর কোন জবাবই দেয় নাই। অবশেষে ডাক্তারী পরীক্ষায় স্থির হয় যে, বিজয় প্রকৃতই উন্মাদ হইয়া গিয়াছে।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার সময়ে সি, আর, দাসের বাড়ীতে আমাদের উকীলগণের আলোচনা সভা বসিত। ক্রমে উকীলগণ অনুভব করিলেন যে, একজন নবীন উকীল এই সভায় আসে এবং সে প্রকৃত-পক্ষে পুলিশের গুপ্তচর। তাই তাহাকে বিতাড়িত করা হয়।

এদিকে আর এক বিভ্রাট ক্রমশঃ দানা বাধিতে লাগিল। প্রায়ই প্রাতে এবং ছুটীর দিন বিকালে অভিভাবক ও আত্মীয়গণ জেলে আসিয়া যুবকদিগকে দেখিয়া যাইতেন। কিন্তু শশীর পিতা কিম্বা অন্য কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে কোন না কোন পুলিশ কর্মচারী আসিয়া শশীকে রাজসাক্ষী হইবার উদ্দেশ্যে পীড়াপীড়ি করিত। শশী সমস্ত বিষয়ই শচীনকে জানাইত এবং শচীনের প্রভাবেই সে এই বিষয়ে নিরস্ত হইয়াছিল বটে, কিন্তু যখন মোকদ্দমা শেষ হইয়া গেল এবং

দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশের জন্য গভর্ণমেণ্ট পক্ষ হইতে দুই মাস সময় গ্রহণ করা হইল, সেই সময় উকীলগণ জানিতে পারিলেন যে, আমাদের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা হইতেছে। তখন শশী ও শচীনের প্রভাবে কয়েকজন যুবক মিলিত হইয়া সমিতি কর্তৃক অনুষ্ঠিত খুন, ডাকাতী ইত্যাদির তীব্র নিন্দাবাদ প্রচার করিতে প্রবৃত্ত হইল। পুলিশের প্ররোচনায় তাহাদের বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, এই প্রচেষ্টার ফলে তাহারা মুক্তিলাভ করিবে।

অপরদিকে উকীল ললিত রায়ও আমাদের সঙ্গে একই কারাগারে ছিলেন। হিন্দু সমাজ সংস্কার সম্পর্কে তাঁহার সহিত আমার ঐক্যমত ছিল না। কাজেই দণ্ডাদেশের ভয়ে ভীত যুবকগণ ললিত রায়ের সমর্থন লাভ করিল এবং জেলের মধ্যেই একটী বিরোধী আবহাওয়া সৃষ্টি করিতে লাগিল। যে যুবকগণ ঐ দলে যোগ দিয়াছিল, তাহাদের প্রত্যেকেই কোন না কোন সময়ে সমিতির নিয়ম-কানুন ভঙ্গজনিত শাস্তিস্বরূপ আমার দ্বারা তিরস্কৃত হইয়াছিল। যাহা হউক, ভিতরের এই গণ্ডগোলের কথা উকীলগণের মাধ্যমে বাহিরে সমিতির কর্মিগণকে জানাইয়া দিয়াছিলাম। কাজেই শেষ পর্যন্ত তাহারা কোনরূপ বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে সমর্থ হয় নাই।

মোকদ্দমা পরিচালনার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হইল। উকীলগণ নিঃস্বার্থভাবে আমাদের সাহায্যের জন্য অগ্রসর হইলেও, তাহাদের বাসার খরচ বাবদ কিছু দিতে হইত। জনসাধারণের নিকট হইতে প্রায় ৮ হাজার টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু সমিতির সমর্থনে কে কে চাঁদা দিতেছে পুলিশ সেদিকেও নজর রাখিতেছে শুনিয়া জনসাধারণ চাঁদা দিতে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন।

প্রায় দুই মাস অতীত হওয়ার পর জজ সাহেব দণ্ডাজ্ঞা শুনাইয়া

সেইদিনই ইংলণ্ড অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দণ্ডাজ্ঞাতে তিনি বলিলেন, ললিত রায়, দুইজন বৃদ্ধ, শশী সরকার, ধীরেন সেন, নলিনী গুহ, যোগেন্দ্র দাস, হেম বসু প্রমুখ ব্যক্তিগণ মুক্তি পাইল। ধীরেন সেনকে মুক্তি দিয়া আবার সঙ্গে সঙ্গে অপর কোনও অভিযোগক্রমে গ্রেপ্তার করা হইল। অপর কয়েকজনের কাহারও দশ বৎসর, কাহারও সাত বৎসর ও তিন বৎসর কারাবাসের আদেশ হইল। আমার, আশুতোষ দাসগুপ্ত ও জ্যোতির্ময় রায়ের যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের আদেশ হইল।

কয়েদী-বেশে কিছুদিন থাকিবার পর আমাদের পক্ষ হইতে হাইকোর্টে আপীলের আবেদন করা হইল, হাইকোর্ট হইতে আদেশ হইল (সম্ভবত বিচারপতি আশুতোষ মুখার্জীর প্রভাবে) যে, হাইকোর্টের বিচার শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদিগকে বিচারাধীন আসামীর পর্যায়েই রাখিতে হইবে। তাই এখন হইতে আমরা ভিন্ন ভিন্ন নির্জন কক্ষে না থাকিয়া হাজতবাসের প্রাচীরে বেষ্টিত চত্বর সমন্বিত এক পরিসরযুক্ত কক্ষে সকলে একত্রে থাকিবার সুযোগ পাইলাম। এইখানে সন্ধ্যার পর যুবকগণ একসঙ্গে কীর্ত্তনাদি করিত।

হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন আমাদের পক্ষ সমর্থন করিলেন, সি, আর, দাস মাত্র একদিন যাইয়া আমার পক্ষ সমর্থন করিয়া বক্তৃতা দিয়াছিলেন। আমাদের বিচারের জন্য জাষ্টিস হ্যারিংটন, জাষ্টিস আশুতোষ মুখার্জী এবং জাষ্টিস কেসপার্স—এই বিচারকত্রয় মিলিত-ভাবে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। প্রায় ছয়মাস পরে হাইকোর্টের বিচার শেষ হইল—কিন্তু দণ্ডাজ্ঞা প্রদানে আরও দুই মাস বিলম্ব হইল।

ইতিমধ্যে দিল্লীর দরবার শেষ করিয়া রাজা কলিকাতায় আসিলেন,

বঙ্গভঙ্গ রদ হইল। আমাদের উকীলগণ জানাইয়া গেলেন যে, সকলেই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতেছেন, অনুশীলন সমিতির কর্মতৎপরতার ফলেই আজ বঙ্গভঙ্গ রদ হইয়াছে। আমাদের উকীলগণ আরও জানাইলেন যে, রাজা নিজে ও তাঁহার পারিষদবর্গ অত্যন্ত মনোযোগ-সহকারে আমাদের মোকদ্দমার কাগজ-পত্র পাঠ করিয়াছেন এবং তাঁহারা অনুমান করিতেছেন যে, রাজা দয়া প্রদর্শনকরতঃ আমাদের মুক্ত করিয়া দিবেন। দিল্লীর দরবারের দিন বহু কয়েদীই মুক্তিলাভ করিয়াছিল। ভাইসরয়ও ঢাকা আসিয়া বিভিন্ন রাজকার্য সম্পন্ন করিয়া চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমাদের মুক্তিলাভ ত হইলই না, বরং দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশেও বিলম্ব হইতে লাগিল।

আমাদের উকীলগণের নিকট শুনিলাম যে, দণ্ডাজ্ঞা প্রকাশে বিলম্ব হওয়ার প্রধান কারণ তৎকালীন নির্দিষ্ট আইন অনুসারে আমাদিগকে শাস্তি দেওয়া যায় না। কারণ গভর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করা সম্ভব হয় নাই যে, ঢাকার অনুশীলন সমিতি কর্তৃক বিভিন্ন ডাকাতী, খুন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, কিম্বা রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার ষড়যন্ত্র করা হইয়াছে। গভর্ণমেণ্টের যুক্তিগুলি সমস্তই অনুমান সাপেক্ষ। যথা, দেশে যে-সমস্ত সাংঘাতিক ডাকাতী, খুন প্রভৃতি হইয়া গিয়াছে, তাহা কোন সঙ্ঘবদ্ধ, সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠান ব্যতীত হওয়া অসম্ভব। এবং সমগ্র ভারতবর্ষের মধ্যে ঢাকার অনুশীলন সমিতি ব্যতীত অনুরূপ কোন সুবৃহৎ ও সুপ্রতিষ্ঠিত প্রতিষ্ঠান নাই। সুতরাং ইহাই সহজে অনুমান করা যায় যে, ঐ সমস্ত অপরাধ ঢাকার অনুশীলন সমিতি কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। অপর একটী যুক্তি এইরূপ—নড়িয়া ডাকাতী সম্পর্কে নৌকায় সমিতি সংক্রান্ত কিছু মুদ্রিত কাগজ-পত্র পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহাই সহজ অনুমান যে, নড়িয়া ডাকাতী

ঢাকার অনুশীলন সমিতি কর্তৃকই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। তাই পুলিন ও পুলিনের অনুশীলন সমিতি নিশ্চয়ই রাজদ্রোহ সংক্রান্ত যাবতীয় অপরাধ করিয়াছে।

কিন্তু তৎকালে অনুমানে নির্ভর করিয়া শাস্তি দেওয়া সম্ভব হইত না। কারণ আইনতঃ সন্দেহের সুযোগ আসামীরই প্রাপ্য ছিল। তাই দার্জিলিং-এ রাজপুরুষগণের এক বৈঠকে নূতন আইনের সৃষ্টি হইল এবং তাহাতে বলা হইল যে, এখন হইতে রাজদ্রোহসূচক মোকদ্দমায় 'সন্দেহের সুযোগ' গভর্ণমেণ্ট পক্ষই পাইবেন।

কিন্তু আমাদের মোকদ্দমা এই নূতন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বেই আরম্ভ হইয়াছিল এইরূপ যুক্তি প্রদর্শনের ফলে হাইকোর্ট হইতে আদেশ হইল যে, নূতন আইন প্রবর্তিত হওয়ার পরে এইটিই প্রথম মোকদ্দমা, সুতরাং সেসন কোর্ট হইতে প্রদত্ত শাস্তি সমস্তই লঘু করিয়া দেওয়া হইল এবং বহু ধৃত ব্যক্তিকেও মুক্তি দেওয়া হইল। অথচ শাস্তির সময়-গণনা হাইকোর্ট হইতে দণ্ডাজ্ঞা প্রদানের তারিখ হইতেই আরম্ভ হইবে, সুতরাং সেসন কোর্টের দণ্ডাজ্ঞার পরে যে সময় পর্যন্ত কয়েদীভাবে জেলভোগ করিয়াছিলাম তাহা আর বিবেচিত হইল না।

হাইকোর্টের বিচারে আমার সাত বৎসরের দ্বীপান্তর, আশুতোষ দাসগুপ্ত এবং জ্যোতির্ময় রায়ের ছয় বৎসরের দ্বীপান্তর এবং অপর কাহারো পাঁচ, তিন ও দুই বৎসরের কারাবাসের আদেশ হইল।

কয়েদীভাবে ঢাকা জেলে দুই মাস ছিলাম। পরে হাতে হাতকড়ি, পায়ে বেড়ি পরিয়া আমি ও জ্যোতির্ময় ট্রেণ, ষ্টীমার ও ঘোড়ার গাড়ীযোগে আলিপুর জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। এই জেলে আমাদের পায়ে সর্বদাই বেড়ি থাকিত। তথায় এক মাস থাকিয়া 'মহারাজা' জাহাজে চড়িয়া আন্দামান যাত্রা করিলাম।

আন্দামান জেলে

আন্দামান জেলের সাধারণ নাম সেলুলার জেল, একটী মৌমাছির চাক। আন্দামান সম্বন্ধে বিভিন্ন ভুক্তভোগী বিভিন্ন বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সুতরাং আমার বক্তব্য সংক্ষেপেই শেষ করিব।

তৎকালীন নিয়ম অনুসারে বিপ্লবী কয়েদীগণকে এবং গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত সাধারণ কয়েদীগণকে প্রথম ছয় মাস স্নানাহার প্রভৃতি ব্যতীত দিবা-রাত্রি নির্জন কক্ষে আবদ্ধ থাকিতে হইত। তাই আন্দামানে যাইয়া প্রথমেই আমি অসুস্থ হইয়া পড়ি।

আহারের ব্যবস্থা ছিল প্রাতে ফেনা ভাত, মধ্যাহ্নে দুই টুকরা রুটি, নির্দিষ্ট পরিমাণ ভাত, ডাল ও তরকারী; বৈকালেও ঐরূপ। আমি আন্দামানে যাওয়ার পর দ্বিতীয় বৎসর হইতে সপ্তাহে দুই দিন দধি দেওয়া হইত এবং কদাচিৎ (বৎসরে দশ বার দিন) মাছ দেওয়া হইত। কোন কোন দিন তরকারীর মধ্যে বন্যকচুর ডগা পাতা, মূল, দূর্বা ঘাস ও অখাদ্য বন্য লতা-পাতাও সিদ্ধ করিয়া দেওয়া হইত।

বৈকালের আহারের পরই প্রত্যেক কয়েদীকে বিভিন্ন নির্জন কক্ষে

তালাবদ্ধ করা হইত এবং প্রাতে তালা খোলা হইত। প্রথম ছয় মাস প্রাতঃকৃত্যাদি ও কাঞ্জিক (ফেনা ভাত) ভক্ষণ শেষ করিয়া পুনরায় নির্জন কক্ষে তালাবদ্ধ থাকিয়া আমাকে নির্দিষ্ট কাজ করিতে হইত।

প্রথম কয়েক বৎসর আমাকে নারিকেলের ছোব্‌রার দড়ি পাকাইতে হইত। পরে কিছুদিনের জন্য নারিকেলের খুলির (হুকার খুলির) উপরে নরুণের সাহায্যে খোদাই করিয়া কারুকার্যযুক্ত লতা-পাতা-ফুল-মূর্তি ইত্যাদি আঁকিতে হইত। কিছুদিন কারুকার্যযুক্ত বিভিন্ন কাষ্ঠের কাঠামো প্রস্তুত করিতে হইত এবং কিছুদিনের জন্য আস্ত নারিকেলের উপরে ছোব্‌রা কাটিয়া খোদাই করিয়া নাক-চোখ-কাণযুক্ত মানুষের মাথার অনুরূপ মূর্তি নির্মাণ করিতে হইত। জেল কর্তৃপক্ষের নির্দেশ অনুসারে এক বৃদ্ধ কর্মী কয়েদী আমাকে ঐ সমস্ত কারুকার্য নির্মাণ প্রণালী শিখাইয়া দিয়াছিল। আন্দামানবাসের শেষ দেড় বৎসর জেল-প্রেসে প্রিণ্টারের কাজ করিতাম। বারীন ঘোষ ঐ জেল-প্রেসের তত্ত্বাবধায়ক ছিল।

আন্দামানে পাঁচ বৎসর অতীত হওয়ার পর তথাকার নিয়মানুসারে নিজের আহার্য্য নিজেই রন্ধন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। এবং প্রতি মাসে অতিরিক্ত বার আনা পাইতাম, তাহা দ্বারা গুড়, চিনি, বিভিন্ন মশলা ক্রয় করিতে পারিতাম। জেল-ওয়ার্ডারগণই বাহির হইতে এই সব জিনিষ ক্রয় করিয়া আনিয়া দিত। যে সময় হইতে আমি জেল-প্রেসে কাজ করিতাম তখন হইতে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, হেম দাস, সুরেশ সেন এবং আমি একসঙ্গে রান্না করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম।

বিভিন্ন কারণে বারীন ঘোষ জেল কর্তৃপক্ষের বিশেষ প্রিয়পাত্র হইয়াছিল এবং জেলারের নিকট হইতে প্রায়ই মাছ-মাংস ইত্যাদি

উপহার পাইত। ভাগ্যক্রমে আমরাও উহার অংশ পাইতাম। মাঝে মাঝে লুচি বা মিষ্টান্ন করিবারও সুযোগ পাওয়া যাইত।

প্রথমে আমাকে যখন ঢাকায় গ্রেপ্তার করা হয় তখন আমার দৈহিক ওজন ছিল ১৫০ পাউণ্ড; আন্দামানে উপনীত হওয়ার পর প্রথমতঃ সেই ওজন হয় ১০৮ পাউণ্ড ও ক্রমে ৯৪ পাউণ্ডে নামিয়া পরে আন্দামান হইতে আসিবার সময় ১২৪ পাউণ্ড হয়।

আন্দামানে উপস্থিত হওয়ার পর নিয়ম অনুসারে প্রত্যেক কয়েদীকেই একদিন তথাকার প্রধান কেন্দ্র পোর্টব্লেয়ারে লইয়া যাওয়া হইত। সেখানে বিভিন্ন কয়েদী সম্পর্কিত বিভিন্ন তথ্যাদি পরীক্ষার পর তাহাদিগকে নানারূপ আদেশ ও নিয়মাদি শুনান হইত। যেদিন আমাকে পোর্টব্লেয়ারে লইয়া যাওয়া হইল সেদিন পোর্টব্লেয়ারের ফেরীঘাটে দুইজন রাজ-কর্মচারী আমার গলায় প্রলম্বিত কাঠের টুকরায় কয়েদী-সংখ্যা দেখিয়া পরম প্রীতির সহিত আমাকে বলিলেন যে, আমি যেন সর্বদা সাবধানে থাকি। কারণ বর্তমানে যে-সমস্ত বিপ্লবী বন্দী আন্দামানে আছে তাহারা জেল-নিয়ম ভঙ্গ করিয়া মাঝে মাঝে সামান্য শাস্তি পাইয়া থাকে। কিন্তু তাহারা নাকি বিশেষভাবেই জানিতে পারিয়াছেন যে, গভর্ণমেণ্ট কোনরূপ সুযোগ পাইলেই আমার শাস্তি বৃদ্ধি করিয়া চিরকাল আমাকে আন্দামানে বন্দী করিয়া রাখিতে চাহেন। জানিতে পারিলাম ভদ্রলোক দুইজনের একজন শ্রীহট্ট জেলার ও অপরজন মাদ্রাজী।

ঐ ভদ্রলোক দুইজন আমার সঙ্গে কথা বলিতে আরম্ভ করা মাত্রই আমাদের প্রহরী ও রক্ষক তীব্রভাবে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল এবং আমাকে ও ভদ্রলোক দুইজনকে তিরস্কার করিতে লাগিল।

পরের দিন প্রাতে আমাকে জেলারের সম্মুখে উপস্থিত করা হইলে

তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, কাল কি হইয়াছিল বল। আমি বলিতে যাইতেছিলাম যে, দুইজন ভদ্রলোক—অমনি জেলার ব্যঙ্গ ভ্রূকুটিসহ সগর্জনে বাধা দিয়া বলিয়া উঠিল—ভদ্রলোক? ভদ্রলোক?

ভাবগ্রহণে অসমর্থ হইয়া আমি নিঃশব্দে তাকাইয়া রহিলাম। পরে জেলার মুখের অদ্ভুত ভঙ্গীসহ জিজ্ঞাসা করিল, তাহারা কি ইউরোপীয় ছিল?

আমি বলিলাম, না।

জেলার—তবে বল কুলি, কুলি, কুলি। সমস্ত ভারতবাসীই কুলি নয়ত কি?

আমি নীরবই রহিলাম। আধিপত্যে প্রতিষ্ঠিত, দাম্ভিক বর্বরকে কিইবা বলিব!

আন্দামানের নিয়ম অনুসারে আমরা বৎসরে একখানা চিঠি লিখিতে এবং একখানা চিঠি ও প্যাকেট পুস্তকাদি পাইতে পারিতাম। প্রথমতঃ নিয়ম ছিল প্রত্যেক কয়েদী একসঙ্গে একখানার অধিক পুস্তক রাখিতে পারিবে না। পরে একখানা পুস্তকের সঙ্গে অভিধান রাখিবার অনুমতিও পাইয়াছিলাম। আমি আন্দামানে যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই আমার নির্দেশে বাড়ী হইতে বাল্মীকির রামায়ণ (অনুবাদসহ), বর্দ্ধমান মহারাজার এবং কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত, ব্রাহ্মসমাজ হইতে প্রকাশিত কোরাণ (বঙ্গানুবাদ), সহস্র পৃষ্ঠার ইংরাজী বাইবেল, সুবলচন্দ্রের বাংলা অভিধান এবং এনানডেলের ইংরাজী অভিধান পাঠান হইয়াছিল। কিন্তু প্রায় ছয় মাস পরে আমি পুস্তকগুলি পাইয়াছিলাম। কারণ পুস্তকগুলির প্রত্যেক পৃষ্ঠাই সন্দেহের বশে বিশেষভাবেই পরীক্ষা করা হইয়াছিল।

কিছুদিন পরে নিয়ম হইল, আমরা পরস্পর একে অন্যের পুস্তক

পড়িতে পারিব, তাই সেলুলার জেলের কেন্দ্রস্থিত উচ্চ মঞ্চগৃহের (টাওয়ার হাউসের) নিম্নতম তলে বিভিন্ন বিপ্লবী কয়েদীগণের পুস্তক একত্র করিয়া এক পুস্তকাগার স্থাপিত হইল। প্রতি রবিবারে আমরা পুস্তক পরিবর্তন করিয়া লইয়া আসিতাম। আলিপুর বোমা মোকদ্দমার বোমা প্রস্তুতকারক হেম দাস ঐ পুস্তকাগারের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হইল। হেম দাস কলিকাতার আর্ট স্কুলের ছাত্র ছিল, তাই অতি সুন্দর ছবি আঁকিতে পারিত এবং ঘড়ি, সেলাই-এর যন্ত্র প্রভৃতির সংস্কারাদি তথা বিভিন্ন শিল্প কর্মাদিতেও সুদক্ষ ছিল। হেম দাস আন্দামানের ইউরোপীয় কর্তৃপক্ষের নির্দেশমতে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন শিল্প কর্ম করিয়া বিশেষতঃ চিত্র আঁকিয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জনও করিত।

যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পরে শিখ, পাঞ্জাবী, বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী প্রভৃতি সমবেত বিপ্লবী কয়েদীগণের সংখ্যা এক সময়ে আশীজনেরও উপরে হইয়াছিল এবং পুস্তকাগারেও পুস্তকের সংখ্যা হইয়াছিল প্রায় আট শত।

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মারে সাহেব 'লণ্ডন উইকলী নোটস্' এবং 'মহাযুদ্ধের ইতিহাস' ইত্যাদির গ্রাহক ছিলেন। তাঁহার পাঠ শেষ হইলে তিনি ঐগুলি পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন বিপ্লবী কয়েদীগণকে পড়িতে দিতেন। পরিশেষে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট-এর কৃপায় বিপ্লবী আন্দোলনের সমালোচনা স্বরূপ রাউলাট রিপোর্টও পড়িতে পারিয়াছিলাম। তদ্ভিন্ন প্রবাসী, মডার্ণ রিভিউ, রিভিউ অব রিভিউজ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাও মাঝে মাঝে পড়িতে পাইতাম।

বারীন ঘোষ এবং উপেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সাধারণতঃ উপনিষদ ইত্যাদি ধর্মসংক্রান্ত পুস্তকই অধিক আনাইত, সাভারকর দর্শন,

মনোবিজ্ঞান, সিভিকস্ ও রাজনৈতিক গ্রন্থাদি এবং হেম দাস নভেল ও রাজনৈতিক মতবাদ সম্পর্কিত পুস্তকই অধিক আনাইত।

আন্দামানে বহির্জগত হইতে সাত বৎসর বিচ্ছিন্ন থাকিয়া রামায়ণ, মহাভারত, কোরাণ, বাইবেল, হার্বার্ট স্পেন্সারের মনঃস্তত্ব, সমাজতত্ব, অজ্ঞেয়বাদ, মিলের অর্থনীতি এবং কার্লমার্কস্, টলষ্টয় প্রমুখ ব্যক্তির মতবাদ সম্বলিত পুস্তকাদি পড়িবার সুযোগ পাইয়াছি।

আন্দামানের সাধারণ নিয়ম অনুসারে সাধারণ কয়েদীদিগকে ছয় মাস জেলবাসের পর বাহিরের কোনও 'টাপুতে' (কয়েদী নিবাসে) পাঠান হইত। কয়েদীগণকে 'টাপুতে' সর্বরূপ জেল-নিয়মসমূহ মানিয়া চলিতে হইত। তবে জেলের তুলনায় তথায় বন্ধন খুবই কম। রাজ-কর্মচারিগণ তথায় সদা-সর্বদা যাতায়াত করিত না।

আন্দামানে আমার কিঞ্চিদধিক এক বৎসর জেলবাস পূর্ণ হওয়ার পরে চীফ কমিশনার সাহেব জানাইয়া গেলেন যে, আমাকে এবং আরও কয়েকজন বিপ্লবী কয়েদীকে শীঘ্রই বাহিরে 'টাপুতে' পাঠান হইবে। দিনও নির্দিষ্ট হইল। কিন্তু সেই দিনের পূর্ব দিন হইতেই বারীন প্রমুখ যে সকল বিপ্লবী কয়েদী বাহিরে ছিল, তাহাদিগকে ক্রমে জেলে আনা হইল। কারণ শুনিলাম যে, বারীন, হেম দাস ও আরও কয়েকজন বিপ্লবী কয়েদী আন্দামান হইতে পলায়ন করিয়া ভারতে আসিবার ষড়যন্ত্র করিতেছিল। কর্তৃপক্ষ সন্দেহবশে তল্লাসী করিয়া প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ ঐ সংক্রান্ত মানচিত্র, চিঠিপত্র ও পলায়ন কৌশলের বিবরণ সম্বলিত কাগজাদি হস্তগত করেন। ক্রমে প্রকাশ পায় যে, বারীনেরই এক কয়েদী বন্ধু নারায়ণগঞ্জের অধিবাসী ভদ্রলোক কর্তৃপক্ষকে নাকি সমস্ত গুপ্ত সংবাদ জানাইয়া দিয়াছিল। যাহা হউক, আমার 'টাপু'তে যাওয়ার সম্ভাবনা তিরোহিত হইল।

আন্দামানের বিপ্লবী কয়েদীগণ সময় সময় ধর্মঘট করিয়া কাজ বন্ধ করিত এবং দাবী করিত যে, রাজনৈতিক বন্দীদের জেলের খাটুনী খাটান চলিবে না এবং পৃথিবীর অন্যান্য দেশের রাজবন্দীদের প্রাপ্য সমস্ত অধিকার তাহাদেরও চাই। কর্তৃপক্ষ সেই দাবী মানিতেন না এবং ধর্মঘটকারী কয়েদীগণও বেশী দিন ধর্মঘট চালাইতে পারিত না। বারীনের বন্ধু খুলনা জেলার অধিবাসী ইন্দুভূষণ রায় নামীয় এক যুবক এই সকল অত্যাচারের প্রতিবাদে ফাঁসী লাগাইয়া আত্মহত্যা করিবার পর ও ভারতেও বিভিন্ন সময়ের আন্দোলনের চাপে আন্দামানের বিপ্লবী কয়েদীগণকে ঘানি টানা প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রমের কাজ আর করিতে হইত না।

যতবারই ধর্মঘট হইত বারীন ও সাভারকার আমাকেও তাহাতে যোগদানের নিমিত্ত প্ররোচিত করিত। কিন্তু আমি পোর্ট-ব্লেয়ারের সেই দুইজন ভদ্রলোকের উপদেশ স্মরণ করিয়া ধর্মঘটে যোগ দিতাম না।

বারীন সাধারণতঃ সকলকে ধর্মঘটে প্ররোচিত করিলেও, সে নিজে একদিন বা দুই দিন পরেই যথারীতি জেল-কাজ করিতে থাকিত এবং তখনও অপর সকলকে ধর্মঘটে দৃঢ় থাকিতে উপদেশ দিত। তাহার এইরূপ কাজের বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিলে জবাব দিত যে, কর্তৃপক্ষের সহিত মীমাংসার জন্যই তাহার পক্ষে ধর্মঘটের বাহিরে থাকা কর্তব্য।

ইতিপূর্বে বলিয়াছি যে, বারীনের বন্ধু, আলিপুর বোমার মামলায় শাস্তি প্রাপ্ত বিপ্লবী ইন্দুভূষণ রায় ফাঁসী লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিল। ইহার কারণ জানিতে পারিলাম যে, এক সময়ে বারীন ঘোষ, উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য বিপ্লবী কয়েদীকে জেল কর্তৃপক্ষ

ঘানি ঘুরাইতে নিযুক্ত করিয়াছিল। বারীনকে কিন্তু ঘানি ঘুরাইতে হইত না। সে বসিয়া থাকিত, অপর কোনও কয়েদী বারীনের প্রতিনিধিস্বরূপ ঘানি ঘুরাইয়া নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈল নির্গত করিয়া দিত। কিন্তু উপেন্দ্রনাথের পক্ষে ঘানি ঘুরান বড়ই পীড়াদায়ক হইত এবং নির্দিষ্ট পরিমাণ তৈল নির্গত করা তাহার পক্ষে সম্ভবও হইত না। সেই জন্য কর্তৃপক্ষের নিকট তাহাকে নিগ্রহও ভোগ করিতে হইত। তাই নিরূপায় হইয়া একদিন গোপনে সে জেলারকে জানাইল যে, সে যত কিছু জানে সব বলিয়া দিবে, তাহাকে যেন আর যন্ত্রণা দেওয়া না হয়। ফলে ঘানি ঘুরাইবার কাজ হইতে উপেন মুক্তি পাইল। কিন্তু কিছু দিন পরে নিজেই আবেগ ভরে স্বীকার করিল, 'আমি একটা দুষ্কার্য করিয়া ফেলিয়াছি, তোমাদের ইচ্ছা হয়ত আমাকে গুলি করিয়া মারিয়া ফেল।'

এই ঘটনায় আন্দামানের বিপ্লবী কয়েদীদের মধ্যে বেশ চাঞ্চল্যের উদ্ভব হয়। কিন্তু বারীন সকলকে ধমকাইয়া নিরস্ত করিয়া রাখিল। তাহাতেই ইন্দুভূষণ নিতান্ত বিক্ষুব্ধ হইয়াছিল এবং প্রায়ই বলিত, যাহারা দোষী তাহারাই সম্মানিত আর আমরা দেহ মন-প্রাণ আহুতি দিয়া লাঞ্ছিত, তিরস্কৃত ও অপমানিত হইলাম। তবে এই দেশের আর কিইবা হইবে এবং এই জীবন রাখিয়াই বা কি হইবে!

তৎপর যে কয়েকদিন সে বাঁচিয়াছিল সর্বদাই বিমর্ষভাবে থাকিত এবং এক রাত্রিতে ফাঁসী লাগাইয়া আত্মহত্যা করিল।

শুনিলাম উল্লাসকর দত্ত প্রায়ই বলিত, স্বদেশকে পরাধীনতার হাত হইতে মুক্ত করিবার পূর্ণ অধিকার আমাদের আছে। আমাদের সেই অধিকারে বাধা সৃষ্টি করিবার অধিকার বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের নাই —তাহারা আমাদিগকে জেলে পুরিয়া নিতান্তই অন্যায় করিতেছে,

সেই অন্যায় মানিয়া লইয়া আমরা জেল খাটিতেছি, ইহাও আমরা অন্যায় করিতেছি। এখন হইতে আর এই পাপ করিব না, জেলের কোন কাজ আর করিব না। উল্লাসকর কাজ বন্ধ করিল। শাস্তি স্বরূপ জেল-কর্তৃপক্ষ হাতকড়ি লাগাইয়া তাহাকে দণ্ডায়মান অবস্থায় দেয়ালের পাশে রাখিয়া দিল। এই অবস্থায়ই একদিন সে চীৎকার করিয়া অজ্ঞান হইয়া পড়িল। জেল-কর্তৃপক্ষ বলিল, ঢং করিতেছে। পরে যখন হাসপাতালে লইয়া যাওয়া হইল তখন দেখা গেল যে, সে পাগল হইয়া গিয়াছে।

আমাদের দেশের দুর্ভাগ্য, যে কোন কর্মেই আমরা লিপ্ত হই না কেন, সর্বত্রই দলাদলি এবং আত্মকলহ লাগিয়া থাকিবেই থাকিবে। আন্দামানে বিপ্লবী কয়েদীগণের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে কলহ তীব্রভাবেই হইত, জেল-কর্তৃপক্ষ তাহাতে নিতান্তই আনন্দ অনুভব করিত। একবার পাঞ্জাবের ভাই পরমানন্দকে কেন্দ্র করিয়া কয়েকজন বাঙ্গালী বিপ্লবী কয়েদী বারীন এবং তাহার সমর্থকগণের বিরুদ্ধে ভীষণরূপ ধারণ করিল। অবশেষে জেলার বেরী সাহেব সেই কলহের নিষ্পত্তি করেন।

সাভারকর আত্মকর্ম ও আপন মতবাদের কথা বলিলে বারীন প্রভৃতিরা উহা হাসিয়া উড়াইয়া দিত এবং বিদ্রূপও করিত। সাভারকরও অবশ্য বারীন ও উপেনদের সমালোচনা করিত। সাভারকরের বড় ভাই গণেশ সাভারকর বলিত, তাহার ছোট ভাই-এর ন্যায় এত বড় শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, বিদ্বান, তেজস্বী কর্মী ভারতে কেন, সমগ্র জগতেও অতি দুর্লভ। বারীন, উপেন তাহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিত। বারীন প্রত্যুত্তরে বলিত, আমি অরবিন্দ ঘোষের ভাই, বিশ্ববিশ্রুত বারীন ঘোষ, আমার সঙ্গে কাহার তুলনা হয়? হেম দাস কিন্তু সকলেরই

নিন্দা করিত। আমার কিন্তু তাহাদের কথায়-বার্তায় আচার-আচরণে মনে হইত যে, বারীন, সাভারকর, উপেন, হেম দাস প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ভাবিত যে, বুদ্ধিটা কেবলমাত্র তাহারই একচেটিয়া এবং তাহা যে ব্যক্তি মানিবে না সে নিতান্তই মূর্খ। অথচ প্রত্যেকেই কিন্তু গণতন্ত্রের দোহাই দিয়াই বিভিন্ন মতবাদের অবতারণা করিত।

হিন্দু ধর্মের প্রতি সাভারকরের বিশেষ কোন মোহ ছিল বলিয়া মনে হইত না। কিন্তু হিন্দুর কৃষ্টি ও হিন্দু জাতির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত করিবার সংকল্পই তাহার মনে প্রবল ছিল। সাভারকর সবিশেষ বাকপটু এবং বাক্যের প্রবাহে প্রতিপক্ষকে নিরস্ত করিবার মত ক্ষমতা তাহার মত আর কাহারও ছিল না। সাভারকর মারাঠী ও ইংরাজী ভাষায় সুদক্ষ ছিল। উভয় ভাষাতেই কবিতাও লিখিতে পারিত। বাঙ্গালীগণকে হেয় ও অপর পক্ষে মারাঠীদের প্রাধান্য প্রচারের চেষ্টাও তাহার মধ্যে দেখিয়াছি। তাহার মতে মারাঠীদের মধ্য হইতে শিবাজী, বাজিরাও প্রমুখ শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও রাজনীতিজ্ঞের উদ্ভব হইয়াছে। সাভারকর বহু বহু গ্রন্থ পাঠ করিয়াছে, অন্যান্য দেশের রাজনৈতিক তথ্য সম্পর্কেও তাহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল কিন্তু গুপ্ত বৈপ্লবিক কর্মের পরিচালনা সম্পর্কে নৈপুণ্য ছিল না। বারীন ও সাভারকর উভয়েই আত্ম-অভিসন্ধি হেতু ছল-বল-কৌশল সমস্তই প্রয়োগ করিত বটে, কিন্তু কেহই সুষ্ঠু প্রয়োগ কৌশল জানিত না। বারীন গভর্ণমেণ্টের অতি প্রিয় পাত্র হইতে বিশেষভাবেই সফল হইয়াছিল কিন্তু বিপ্লবী কয়েদীগণ কেহই তাহাকে সুদৃষ্টিতে দেখিত না।

বারীন বলিত যে, সে পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া দেশবাসীকে স্বাধীনতা লাভের চেষ্টার জন্য অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। পূর্ববঙ্গে আমার সমিতির শাখা প্রায় সর্বত্রই পরিব্যাপ্ত ছিল

কিন্তু বারীন ঘোষের কোথাও কোন প্রভাব ছিল বলিয়া শুনি নাই। আমি যতদূর জানি আলিপুর বোমা মোকদ্দমা সম্পর্কে বারীনের নাম প্রকাশ হওয়ার পূর্বে, পূর্ববঙ্গের জনসাধারণ তাহার নামও জানিত না।

আলিপুর বোমা মোকদ্দমায় নরেন গোঁসাই রাজসাক্ষী হইয়াছিল এবং জেলের মধ্যেই রিভলবারের গুলিতে নিহত হইয়াছিল। এই সম্পর্কেও বিবরণ শুনিলাম যে, পুলিশ প্রথমতঃ বিপ্লবী দলের সঙ্গে নরেন গোঁসাই-এর কোন সম্পর্কই জানিতে পারে নাই। কিন্তু কোন অভিসন্ধিহেতু বারীন ঘোষই নরেন গোঁসাই ও অপর কয়েকজন যুবকের নাম পুলিশকে জানাইয়া দেয় এবং গুপ্ত অস্ত্রাদি সম্পর্কেও যাহা তখন পর্যন্ত পুলিশ জানিতে পারে নাই তাহাও সে প্রকাশ করিয়া দেয়। মোকদ্দমায় সাক্ষ্যদান কালে পুলিশের মুখে এই সমস্ত ঘটনা শুনিয়াই নরেন গোঁসাই বলিয়াছিল যে, যাহারা নেতা তাহারাই যদি আপন স্বার্থের জন্য আমাদিগকে ধরাইয়া দিতে পারেন, তবে আমরাই বা আপন মুক্তির জন্য অনুরূপ চেষ্টা করিব না কেন?

বারীন আন্দামান কর্তৃপক্ষের অতি প্রিয়পাত্র ছিল বলিয়া তাহার প্রভুত্বও যথেষ্টই ছিল এবং সেই প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত রাখিতে বারীন কখনই কোনরূপ দ্বিধা বোধ করিত না। বারীন অসুস্থ হইলে জেলার বেরী সাহেব তাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতেন এবং জেলারের কন্যা স্বয়ং শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিত।

আন্দামান ত্যাগ

'মহারাজা' জাহাজে আন্দামানে গিয়াছিলাম, পুনরায় 'মহারাজা' জাহাজেই আন্দামান ত্যাগ করিলাম। জাহাজে চড়িয়া মাদ্রাজ আসিয়া পৌঁছিলাম। মাদ্রাজ জেলে এগার দিন থাকিয়া পরে কৃষ্ণনগর জেলে স্থানান্তরিত হইলাম। তথা হইতে আই, বি বিভাগের কেন্দ্রীয় অফিস ইলিশিয়াম রো-তে আমাকে লইয়া আসা হয় এবং সেখানে আমাকে চারি দিন থাকিতে হয়।

আমি প্রথম বলিয়াছিলাম যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টকে বিতাড়িত করিয়া সমগ্র ভারতবর্ষকে স্বাধীন করাই আমার এবং আমার অনুশীলন সমিতির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তথাপি অতীতকালে কি কি ঘটিয়াছে, আমার সমিতি গভর্ণমেণ্ট ও দেশের লোকের কি কি ক্ষতি করিয়াছে এবং এই সকল ঘটনায় ভবিষ্যতে কি কি ঘটিতে পারে ইত্যাদি বিষয়সমূহ আমাকে ভালভাবে বুঝাইয়া দিবার জন্যই এখানে আনা হইয়াছিল। তথায় সেই সময়ে চীফ্ সেক্রেটারী, পুলিশ কমিশনার ও আই, বি বিভাগের প্রধান কর্মকর্তা মিঃ হাডড ছিলেন।

আমাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, মুক্তির পর তুমি কি করিবে? আমি

বলিয়াছিলাম যে, আমার পরিবার প্রতিপালনের চেষ্টা করিতেই হইবে। কিন্তু বর্তমানে তাহারা কিভাবে আছে তাহা না জানিয়া এবং শ্রীশবাবু, শশাঙ্কবাবু, সি, আর, দাস প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ—যাঁহারা আমাকে সমর্থন করিয়া মোকদ্দমা পরিচালনা করিয়াছেন তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া দেশের পরিস্থিতি না জানিয়া আমি কিছুই বলিতে পারিব না।

আমার কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই চীফ্ সেক্রেটারী বলিয়া উঠিলেন যে, না, না, শ্রীশ চ্যাটার্জী, সি, আর দাসের সঙ্গে কখনও দেখা করিও না, আমরাই তোমার চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিব। তুমি চাকুরী করিবে ত?

আমি বলিলাম, উপযুক্ত চাকুরী পাইলে নিশ্চয়ই করিব।

চীফ্ সেক্রেটারী বলিলেন, তবে তোমাকে রাজেন মুখার্জীর অধীনে চাকুরীর ব্যবস্থা করিয়া দিব।

পরের দিন কর্তৃপক্ষের নির্দেশে চীফ্ সেক্রেটারীর চিঠিসহ রাজেন মুখার্জীর (R. N. Mukherjee) সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তিনি সাধারণভাবে আমার সহিত কথা-বার্তা বলিলেন। কিন্তু তৎপর দিবস চিঠি লিখিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষকে জানাইয়া দিলেন যে, কোন রাজনৈতিক বিপ্লবী কর্মীকে তিনি চাকুরী দিতে সম্মত হইতে পারেন না।

আমি আর কোন বৈপ্লবিক কর্মে আত্মনিয়োগ করিব না প্রতিশ্রুতি দিলে চীফ্ সেক্রেটারী বলিলেন, তোমাকে তোমার বাড়ীতেই পাঠাইয়া দিতেছি, তথায় কিছুদিন স্ত্রী-পুত্রের সঙ্গে থাকিয়া মন স্থির করিয়া লও, এদিকে আমরা তোমার চাকুরীর ব্যবস্থা দেখিতে থাকি। তবে আমাদের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে তোমার বাড়ীতেই তোমাকে

'অন্তরীণ' অবস্থায় থাকিতে হইবে। সেজন্য অবশ্য মনে কিছু করিও না, উহা একটি বাহ্যিক নিয়ম রক্ষা মাত্র।

পরের দিন সরকারীভাবে জানাইয়া দেওয়া হইল যে, আমাকে প্রথমে ফরিদপুর যাইয়া পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে এবং তিনিই আমার বাড়ী যাওয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। কিন্তু আমি বাড়ী যাইয়া দিনের বেলায় গ্রামের নির্দিষ্ট সীমানার এবং সন্ধ্যার পর বাড়ীর নির্দিষ্ট সীমানার বাহিরে যাইতে পারিব না। অন্য গ্রামের লোকের সঙ্গে অথবা ছাত্র ও শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলিতে পারিব না। গ্রাম হইতে দুই মাইল দূরস্থিত থানায় প্রত্যহ একবার যাইয়া ভারপ্রাপ্ত পুলিশ কর্মচারীর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আসিতে হইবে।

পারিবারিক প্রসঙ্গ

পূর্বেই বলিয়াছি যে, আমি অর্থোপার্জন করি না, পারিবারিক কোনও উন্নতিরই চেষ্টা করি নাই, সর্বদা সমিতির কার্যেই লিপ্ত থাকি। অধিকন্তু সমিতির প্রয়োজনহেতু কখনও কখনও ঘরের টাকাও খরচ করিয়াছি। তাই মাতা এবং ভ্রাতা আমার প্রতি নিতান্তই রুষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। এবং এই কারণে আমাকে ও আমার পত্নীকে প্রায় সর্বদাই নানারূপ লাঞ্ছনা ভুগিতে হইত। ক্রমে লাঞ্ছনার তীব্রতা বাড়িয়া গেল এবং আমিও বাধ্য হইয়া বাসা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া সমিতি-নিবাসে বাস করিতে লাগিলাম। আমি বিচ্ছিন্ন হইলাম বটে কিন্তু পত্নীকে ত সর্বদাই লাঞ্ছনা ভুগিতে হইত। সেই সময়ে আমার পুত্র-কন্যা ছিল—তিন বৎসরের পুত্র তেজেন্দ্রনাথ এবং ছয় মাসের কন্যা বীণাপাণি।

আন্দামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া দেখি পুত্রটি সপ্তম মানে পড়িতেছে। কিন্তু সাহিত্য, গণিত প্রভৃতি ভালরূপ জানে না। যাহা হউক, যথাযোগ্য উপায় অবলম্বন করিয়া পুত্রকে পড়াশুনায় অধিকতর মনোযোগী করিতে সমর্থ হইলাম।

অবশেষে পুত্রকে কলিকাতা আনিয়া হিন্দু স্কুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলাম। তথা হইতে সে ম্যাট্রিক ও পরে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে আই, এস, সি পাশ করিবার পর তাহাকে শিবপুর ইঞ্জিনীয়ারিং কলেজে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলাম। সে কৃতিত্বের সহিতই বি, ই, পাশ করিয়াছিল এবং স্বর্ণপদক লাভ করিয়াছিল। সে বর্তমানে কর্মজীবনে সরকারী চাকুরী একজিকিউটিভ ইঞ্জিনীয়ার হিসাবে কাজ করিতেছে। দ্বিতীয় পুত্র সৌরেন্দ্রনাথ বর্তমানে এক আমেরিকান কারখানার সহিত সংশ্লিষ্ট এবং তৃতীয় সোমেন্দ্রনাথ ব্যবসায়ে নিযুক্ত। আমার দুইটি কন্যা—দুইজনেই বিবাহের পূর্বে ম্যাট্রিক পাশ করিয়াছে।

পুত্র-কন্যাগণ সকলেই লাঠি, ছুরি, অসি প্রভৃতি কিছু কিছু শিখিয়াছিল, তবে মধ্যম পুত্র শ্রীমান সৌরেন্দ্রনাথই লাঠি, ছুরি ইত্যাদিতে সুদক্ষ হইয়াছিল।

কাউন্সিল বর্জন—গান্ধীজীর আবির্ভাব

কাউন্সিল ইলেক্‌শন (ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনয়ন) সারা দেশে বিশেষ উত্তেজনার সৃষ্টি করিয়াছিল। কংগ্রেস কাউন্সিল বর্জন করিল। নীলরতন সরকার মহাশয় বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দাঁড়াইলেন, তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র যোগেন্দ্র ঘোষ। ঢাকা ব্যতীত অন্য কোন স্থান হইতেই নীলরতন সরকার মহাশয় বিশেষ সমর্থন পাইলেন না। শেষ মুহূর্তে তিনি আমাকে ঢাকা পাঠাইলেন। কিন্তু কংগ্রেস নীতির বিরুদ্ধে আমি কোনও নির্বাচন কার্যে লিপ্ত আছি এই বিষয়টি প্রতুল গাঙ্গুলী প্রমুখ অনুশীলন সমিতির কর্মিগণ সম্পূর্ণরূপেই গোপন রাখিল।

ঢাকায় যাইয়া প্রতুল গাঙ্গুলীরই আতিথ্য গ্রহণ করিলাম। সেই-দিনই ঢাকার করোনেশন পার্কে হিন্দু-মুসলমানের মিলিত এক বিরাট সভা হইতেছিল। খিলাফৎ আন্দোলনের ফলে মুসলমানদেরই উত্তেজনা অত্যন্ত অধিক ছিল। বিভিন্ন স্কুল, কলেজ—বিশেষতঃ মাদ্রাসাগুলি মুসলমান ছাত্রগণ বর্জন করিবার নিমিত্ত নিতান্তই উৎসুক —হিন্দু ছাত্রগণ তখন কি করিবে তাহা ভাবিয়া ইতস্ততঃ করিতেছে।

শ্রীশবাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র আমাকে উক্ত সভাস্থলে লইয়া গেল। সেই সভায় সভাপতি হইলেন শ্রীশবাবু। সভায় আমাকেও বক্তৃতা করিতে হইয়াছিল।

ইতিপূর্বে কোন কোন যুবকের সহিত আলোচনার সময় আমি এইরূপ আভাষ দিয়াছিলাম যে, লেখাপড়ার ক্ষতি করিয়া ছাত্রগণের স্কুল-কলেজ বর্জন সঙ্গত নহে। এই বিষয়টি ক্রমে ক্রমে সম্ভবতঃ অনেকেই জানিতে পারিয়াছিল। তাই আমার বক্তৃতা আরম্ভ হইবার পূর্বেই একজন মুসলমান নেতা বিক্ষোভের সুরেই আমাকে জানাইয়া গেলেন যে, যদি আমি স্কুল-কলেজ বর্জনের বিরুদ্ধে কোন কথা বলি তবে আমার বক্তৃতা বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

যাহা হউক, বক্তৃতা প্রসঙ্গে সাধারণভাবে দেশের পরিস্থিতি, দেশসেবা হেতু ত্যাগ স্বীকারের প্রয়োজন, কি-ভাবে কোথা হইতে প্রাণে দেশের সেবার জন্য প্রেরণার উদ্ভব হয়, ছাত্রগণই দেশের আশাস্থল এবং দেশের কল্যাণ কামনা করিয়া আমি যাহা কিছু করিয়াছি তাহাতে ছাত্রগণই আমার প্রধান সহায় ও শক্তি ছিল—তাহাদের ত্যাগ স্বীকার, সত্যনিষ্ঠা, নিয়মানুবর্তিতা এবং ঐকান্তিক আনুগত্য না থাকিলে আমি কোন কর্মেই অগ্রসর হইতে পারিতাম না—ইত্যাদি বিষয়গুলি বলিয়া স্কুল-কলেজ বর্জন প্রসঙ্গে শুধু বলিলাম যে, যাহাই করিবে, ভালভাবে ভাবিয়া করিও, করিয়া ভাবিও না। যদি সত্য সত্যই স্কুল-কলেজ বর্জন করিতে হয়, তবে এমনভাবে বিশেষ ব্যবস্থা করিয়া ও নিশ্চিতরূপে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইয়াই করিতে হইবে—যেন ঐ সমস্ত বর্জিত স্কুল-কলেজে আর ফিরিয়া যাইতে না হয়।

পরে পরিস্থিতি দেখিয়া মনে হইল যে, হিন্দু ছাত্রগণ সহসা কিছু করিতে নিরস্ত হইল এবং মুসলমান ছাত্রগণও তাহাদের সঙ্গে যোগ দিল।

ঢাকা হইতে চট্টগ্রাম গেলাম। কিন্তু তথায় অবস্থা প্রতিকূল দেখিতে পাইলাম। প্রত্যেকেই আমাকে সেখানে প্রকাশ্যভাবে কোন নির্বাচনী কাজ করিতে নিষেধ করিল। কারণ জে, এম, সেনগুপ্তের প্রভাবে তথাকার কংগ্রেস কর্মিগণ দৃঢ়তার সহিত ত্রয়ী বর্জন (কাউন্সিল, বিশ্ববিদ্যালয় ও আইন-আদালত) মন্ত্র গ্রহণ করিয়া তীব্রভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল এবং যে-ব্যক্তি ভোট গ্রহণ সম্পর্কিত কোন কর্মে অংশ গ্রহণ করিয়াছে তাহাকেই নানারূপে লাঞ্ছিত করিয়াছে। চট্টগ্রামের অনুশীলন সমিতির কর্মিগণের সহায়তায় কিছু কিছু ভোট দাতার সহিত আমি সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম। কিন্তু সর্বত্রই ব্যর্থ মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসিলাম।

কুমিল্লার অনুশীলন সমিতির এক যুবক (পুলিন সেন) আসিয়া আমাকে চট্টগ্রাম হইতে কুমিল্লা লইয়া গেল। সেইদিনই স্বনামখ্যাত মহেশ ভট্টাচার্যের বাটীর প্রাঙ্গণে এক বিরাট সভার আয়োজন হইল। কুমিল্লারই একজন উকীল সভাপতি হইলেন। ঢাকার নবাব পরিবার হইতে আগত এবং কুমিল্লার স্থানীয় কয়েকজন মুসলমানও বক্তৃতা করিলেন। আমাকেও কিছু বলিতে হইল।

এখানেও দেখিলাম মুসলমান ছাত্রগণ মাদ্রাসা স্কুলগুলি বর্জন করিয়াছে। খিলাফৎ আন্দোলন অবলম্বন করিয়া হিন্দুগণ অপেক্ষা মুসলমানগণই গভর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে অত্যধিক উত্তেজিত হইয়াছে এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সফলতার জন্যই হিন্দুদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করিতেছে।

ইতিপূর্বেই পাঞ্জাবের সত্যাগ্রহ সম্পর্কিত বিভিন্ন দুর্ঘটনার প্রতি-ক্রিয়ার ফলে গান্ধী বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাচারিতার প্রতিকার মানসে অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাবনা উপস্থিত করিয়াছিলেন।

আফ্রিকাতে বিভিন্ন নিষ্ফল প্রচেষ্টার পর এখন গান্ধী ভারতীয় রাজনৈতিক গগনে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভানুরূপে উদিত হইলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ত্রয়ী বর্জন-এর মধ্যে ছিল ১। স্কুল-কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় বর্জন ২। আইন-আদালত বর্জন এবং ৩। কাউন্সিল বর্জন। সেই সঙ্গে বিলাতী দ্রব্য বর্জন, আবগারী বর্জনও জড়িত ছিল।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের নেতৃবৃন্দ কিন্তু এই ত্রয়ী বর্জন আন্দোলন একবাক্যে মানিয়া লন নাই। বিশেষতঃ নবলব্ধ 'সংস্কারের' (মণ্টেগু রিফর্মের) প্রভাবে পরিষদে আসনলাভের জন্য অনেক নেতাই বিশেষ-ভাবে লালায়িত ছিলেন। তাই সমগ্র ভারতে দুইটি বিশেষ প্রবল মতের সৃষ্টি হইল—একটি গান্ধীর স্বপক্ষে, অপরটি তাঁহার বিরুদ্ধে। সি, আর, দাস প্রথমাবস্থায় ঘোরতরভাবেই গান্ধীর বিপক্ষে ছিলেন। এদিকে ভোট গ্রহণের দিনও অগ্রসর হইয়া পড়িল, বাৎসরিক কংগ্রেস অধিবেশনের পূর্বেই ভোট গণনার দিন ধার্য হইয়াছে। তাই কংগ্রেস হইতে কাউন্সিল বর্জন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যে গান্ধীর প্রভাবে কলিকাতায় ১৯২০ সালে কংগ্রেসের এক বিশেষ অধিবেশন আহুত হয়। লালা লাজপৎ রায় সভাপতি মনোনীত হইলেন। ব্যারিষ্টার ব্যোমকেশ চক্রবর্তী অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি পদে বৃত হইলেন এবং ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর দায়িত্বভার গ্রহণ করিলেন।

সভাপতিসহ শোভাযাত্রা পরিচালনার ভার এবং প্রধান দ্বার রক্ষার দায়িত্ব আমার উপরেই অর্পিত হইয়াছিল।

গান্ধী যখন অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন, তখন বিরুদ্ধবাদিগণ যুক্তি দেখাইয়াছিলেন যে, অসহযোগ আন্দোলন আরম্ভ

হইলে আইন ভঙ্গ অবশ্যই করিতে হইবে এবং পুলিশও নিশ্চিতরূপেই বাধা দিবে। সুতরাং জনসাধারণের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবীরূপেই বাধিয়া যাইবে। ফলে গভর্ণমেণ্ট কঠোর আইনের সাহায্য লইবে এবং বহু কর্মী ইহাতে লাঞ্ছিত ও বিপন্ন হইয়া পড়িবে। পরিণামে অসহযোগ আন্দোলনও গত বিপ্লব আন্দোলনের ন্যায় ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই আপত্তি খণ্ডনের উদ্দেশ্যে গান্ধী নূতনভাবে প্রস্তাব আনিলেন, আমরা অহিংস অসহযোগ করিব। আমরা অহিংস থাকিলে গভর্ণমেণ্ট কঠোর আইন করিয়া জনসাধারণকে বিপন্ন করিবার সুযোগ পাইবে না। আমরা আইন ভঙ্গ করিব, পুলিশ আমাদিগকে মারিলেও বাধা দিব না কিম্বা প্রতিবাদও করিব না, নীরবে সহ্য করিব। তাই কোন অবস্থায়ই জনতার সহিত পুলিশের সংঘর্ষ বাধিতে পারিবে না। যাহা হউক, কংগ্রেসে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনই গৃহীত হইল।

এই সময়ে প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বিশৃঙ্খল অবস্থা, বিভিন্ন বিপ্লবী কর্মসূচী হইতে উদ্ভূত সমস্যা ও গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে নানারূপ লাঞ্ছনার ফলে অবসাদ-জর্জরিত ও নৈরাশ্য-প্রপীড়িত জনসাধারণ গান্ধীর এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে যেন এক নূতন আশার বাণী খুঁজিয়া পাইল এবং অসীম আরামের সন্ধান পাইল। আরামপ্রিয় ভারতবাসীগণের—বিশেষতঃ বাঙ্গালীর প্রকৃতিই এইরূপ। তাই কোনও আরাম-প্রদানকারী নূতনের সন্ধান পাইলে—তাহা প্রকৃত বা অপ্রকৃতই হউক, বিচারহীন মত্ততায় মোহান্ধ হইয়া তাহা অনুসরণ করিয়া চলে। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আপন কর্মফলে ভুক্তভোগী হইয়াও আপন ভ্রান্তি মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়াও সেই ভ্রান্তি দূর করিতে কিম্বা স্বীকার করিতেও যেন আমরা ভরসা পাই না।

তাই গান্ধীর নূতন ঘোষণায় জনসাধারণ উন্মত্ত ও বিভ্রান্ত হইয়া 'গান্ধীজী কি জয়', 'জয় মহাত্মা গান্ধী কী' ইত্যাদি ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস প্রকম্পিত করিতে লাগিল। আর সেই সঙ্গে 'ছ' মাসে স্বরাজ, 'ন' মাসে স্বরাজ, 'এক' বৎসরে স্বরাজ, 'এই ত স্বরাজ পাইয়া গিয়াছি' ইত্যাদি ভাবিয়া, কেহ বা সত্য সত্যই বিশ্বাস করিয়া জ্ঞানহারা হইয়া পড়িল। ছাত্রগণ আপন কর্তব্য লেখা-পড়া ও বিদ্যালয় পরিত্যাগ করিয়া দল বাঁধিয়া পথে পথে স্বাধীন আনন্দোচ্ছ্বাসে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং সঙ্গে সঙ্গে ধরাকে সরা জ্ঞান করিয়া গুরু-লঘু ভেদ-বিচারহীন হইয়া চলিতে লাগিল।

গান্ধী অবতার বলিয়া ঘোষিত হইলেন, সহস্র সহস্র লোক 'গান্ধী দরশনের' আশায় রাজপথ অবরোধ করিয়া প্রধাবিত হইতে লাগিল। কথায় কথায় স্কুল-কলেজ, দোকান-পাট বন্ধ ও হরতাল হইতে লাগিল, জনসাধারণ সগর্বে বলিতে লাগিল, এত বড় সাফল্যমণ্ডিত হরতাল কেহ কখনও দেখে নাই। সংবাদপত্র পরিচালকগণও অন্ধ উত্তেজনায় অনুকূল প্রবন্ধাদি লিখিয়া বিলক্ষণ অর্থ-উপার্জনের সুযোগ গ্রহণ করিয়া লইল। সুতরাং কালের পরিস্থিতি প্রভাবে কংগ্রেসেও গান্ধীর অহিংস অসহযোগ আন্দোলন পরিপূর্ণভাবেই গৃহীত হইল।

কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশন

এদিকে নিয়ম পদ্ধতি অনুসারে নাগপুরে কংগ্রেসের বাৎসরিক অধিবেশনের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল। সি, আর, দাস আমাকে ডাকাইয়া বলিলেন যে, তিনি সদলবলে নাগপুর কংগ্রেসে যাইয়া গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনের ঘোরতর প্রতিবাদ করিবেন, সেইহেতু আমাকে পাঁচশত স্বেচ্ছাসেবক সংগ্রহ করিয়া তাহার সঙ্গে নাগপুরে যাইতে হইবে। আমিও এক কথায়ই সম্মত হইলাম।

অপরের ব্যয়ে নাগপুর কংগ্রেস দেখিবার সুযোগ পাইয়া অনুশীলন সমিতির সভ্য ব্যতীতও বহু যুবক আমাদের সঙ্গে চলিল। ইহা ছাড়া সত্যেন্দ্র মিত্র, ব্যারিষ্টার বি, কে, লাহিড়ী, ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন, ব্যারিষ্টার নিশীথ সেন, ঢাকার উকীল শ্রীশবাবু প্রমুখ জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিদের অনেকেই এই অভিযানে সহযোগিতা করিয়াছিলেন। অপরদিকে পদম্‌রাজ জৈন, ব্যারিষ্টার জে, এন, রায়, অধ্যাপক জে, এল, ব্যানার্জী এবং যুগান্তর দলের কয়েকজন যুবক সি, আর, দাসের বিরোধিতা করিবার উদ্দেশ্যে প্রস্তুত হইয়া নাগপুর গিয়াছিল।

কংগ্রেসের প্রাথমিক অধিবেশন শেষ হওয়ার পরে সন্ধ্যার প্রাকালে

ব্যারিষ্টার আই, বি, সেন হঠাৎ সংবাদ লইয়া আসিলেন যে, জে, এল, ব্যানার্জীকে সভাপতি করিয়া সি, আর, দাসের সমর্থকগণকে কোনই সংবাদ না দিয়া বাংলাদেশের অন্যান্য প্রতিনিধিগণ (ডেলিগেট) এক সভা আহ্বান করিয়া নিজেদের মনোমত সাব্‌জেক্‌ট্‌ কমিটির সভ্য নির্বাচন করিতেছে। তৎক্ষণাৎ আমরাও সদলবলে কংগ্রেস মণ্ডপের দ্বারে উপস্থিত হইলাম। কিন্তু মণ্ডপরক্ষক স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ বাধা দিয়া বলিল যে, এখানে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের এক বিশেষ সভা হইতেছে, অপরের প্রবেশ নিষেধ। আমরা বলিলাম যে, আমরাও বাংলাদেশের প্রতিনিধি। তথাপি যখন স্বেচ্ছাসেবকগণ দ্বার খুলিল না, তখন আমরা বলপূর্বক মণ্ডপে প্রবেশ করিলাম। প্রথমেই আমরা সভাপতি পদে আসীন জে, এল, ব্যানার্জীকে অনুরোধ করিয়া বলিলাম যে, আজ এই সভা বন্ধ রাখিয়া যথানিয়মে নির্দিষ্ট সময় স্থির করুন এবং বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধির মিলিত আলোচনার মাধ্যমে সাব্‌জেক্‌ট্‌ কমিটির সভ্য নির্বাচন করুন। তাহাতে ফলাফল যাহাই হউক না কেন তাহাই আমরা মানিয়া লইব। পূর্ণ দাস প্রমুখ কয়েকজন আমাদের প্রস্তাবের প্রতিবাদ জানাইয়া বলিল যে, আপনারা এতক্ষণ ঘুমাইয়া ছিলেন কেন? আমরা আমাদের নিয়মিত কর্ম পদ্ধতি বন্ধ করিতে পারিব না।

কথায় কথায়, বাদ-প্রতিবাদ শেষ পর্যন্ত হাতাহাতিতে রূপান্তরিত হইল। এই সম্পর্কে রবি সেন, বীরেন চ্যাটার্জী ও অন্যান্য কয়েকজন সমিতির সভ্যই বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়া সেই সভা ভাঙ্গিয়া দিল। কিন্তু হট্টগোলের মধ্যে জে, এল, ব্যানার্জী তাহার মনোমত এক নির্বাচিত সভ্যের তালিকা প্রস্তুত করিয়া কংগ্রেস সভাপতির নিকট পাঠাইয়া দিলেন।

সি, আর, দাসও সমস্ত বিষয় বিবৃত করিয়া মনোনীত কংগ্রেস সভাপতির (মাদ্রাজের বিজয় গোপাল রাঘবাচার্য) নিকট এক আবেদন পাঠাইয়া দিলেন। কংগ্রেস সভাপতি জে, এল, ব্যানার্জীর বিপক্ষে তাঁহার অভিমত জানাইয়া নির্দেশ দিলেন যে, পরের দিন কোনও নির্দিষ্ট সময়ে এবং নির্দিষ্ট স্থানে বাংলাদেশের সমস্ত প্রতিনিধি-গণের মিলিত সভায় যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে তাহাই মাত্র তিনি সমর্থন করিবেন। কিন্তু বলা বাহুল্য, সভাপতির নির্দেশ অনুসারে বাংলাদেশের প্রতিনিধি সভায় জে, এল, ব্যানার্জী, পদম্‌রাজ জৈন ও অন্যান্য সি, আর, দাস বিরোধী ব্যক্তিগণ কেহই উপস্থিত হইলেন না বটে, কিন্তু পদম্‌রাজ জৈনের অনুগত কতিপয় বলিষ্ঠ মাড়োয়ারী দলবদ্ধভাবে আসিয়া প্রত্যেক বিষয়েই প্রতিবাদ করিতে আরম্ভ করিল। ভোটে কিন্তু তাহারা শোচনীয়ভাবেই পরাজিত হইল। এবং ইহাতে ক্ষিপ্ত হইয়া বল প্রয়োগে সভা ভাঙ্গিয়া দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। অনুশীলন সমিতির সভ্যগণও নিকটেই অবস্থান করিতেছিল। সঙ্কেত ধ্বনি অনুসারে তাহারা তথায় উপস্থিত হইল এবং উহাদিগকে মণ্ডপ হইতে বাহির করিয়া দিল।

নাগপুর কংগ্রেসে কয়েকটি বিষয় যাহা আমার নিকট উল্লেখযোগ্য বলিয়া মনে হয় তাহা বলিতেছি।

কংগ্রেসের আলোচনা সভায় ইংলণ্ডের শ্রমিক দলের দুইজন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। তন্মধ্যে একজন পার্লামেণ্টের সদস্য। তাঁহারা এক প্রস্তাব করিয়াছিলেন যে, বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে ইংলণ্ডের শ্রমিক সম্প্রদায় সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত আছে। তাই তাহারা মিলিতভাবে একটি বাস্তব কর্মসূচী প্রণয়নে কংগ্রেসের মতামত জানিয়া নিজেদের মতামত ব্যক্ত

করিতে ইচ্ছুক। কিন্তু মহম্মদ আলী এই বলিয়া প্রস্তাব করিলেন যে, ভারতবাসী ইংলণ্ডের কোন লোককেই বিশ্বাস করে না, শ্রমিক সম্প্রদায়কেও নহে।

এই সম্পর্কে গান্ধী অবশ্য নীরবই ছিলেন। কিন্তু অন্যান্য সকল বিষয়েই তিনি সৌকত আলী, মহম্মদ আলীকে পরিপূর্ণরূপে সমর্থন করিতেন। তাই তাঁহাদিগকে কোন বিষয়েই কেহ বাধা প্রদান করিতে ভরসা পাইত না।

আর একটি ঘটনা—সি, আর, দাস সদলবলে নাগপুর যাওয়ার ফলে গান্ধী সি, আর, দাসের সঙ্গে একটি আপোস মীমাংসা করিয়া তাঁহার অসহযোগ নীতির কতকগুলি কঠোরতা শিথিল করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন। কিন্তু আলোচনা সভায় সৌকত আলী, মহম্মদ আলীর প্রভাব উপলব্ধি করিয়া এবং অধিকাংশ সদস্যেরই অসহযোগ নীতির প্রতি আসক্তি বুঝিতে পারিয়া অবশেষে গান্ধী পরিষ্কারভাবেই বলিলেন যে, বিশেষভাবে চিন্তার পর তিনি স্থির করিয়াছেন অসহযোগ নীতির পূর্ব নির্দিষ্ট কোন কঠোরতাই শিথিল করা যাইবে না।

যাহা হউক, নাগপুর কংগ্রেসেও অসহযোগ নীতিই সমর্থিত হইল। গান্ধীজীর জয় হইল বটে, তথাপি সি, আর, দাস, মতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য এবং মারাঠী নেতাগণের বিরোধিতাও তিনি একেবারে উপেক্ষণীয় মনে করিতে পারিলেন না। তাই কংগ্রেস শেষ হইলে পর কোনও এক সুযোগের অবসরে গান্ধী সি, আর, দাসের পিঠে হাত বুলাইয়া অসহযোগের বিরোধিতা হইতে বিরত থাকিতে প্ররোচিত করিলেন। সি, আর, দাস অবশ্য অসহযোগের বিরোধিতা করিবেন না বলিয়া স্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরিপূর্ণরূপে উহা মানিয়া লইতে পারিলেন না।

নাগপুর কংগ্রেসের আর একটি ঘটনা। মিঃ জিন্না অসহযোগ নীতির সমর্থক ছিলেন না। ভারতে খিলাফৎ আন্দোলনের প্রতিও তাঁহার সহানুভূতি ছিল না। ইংলণ্ডের লেবার পার্টির প্রতিনিধিদের অবমাননাও তিনি হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করেন নাই। এই সমস্ত এবং অন্যান্য বিষয়েও মহম্মদ আলী, সৌকত আলীর ব্যবহারে মিঃ জিন্না রুষ্ট হইয়াছিলেন। আলোচনা সভার দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে মিঃ জিন্না যাহা কিছু বলিতে উঠেন আলী ভ্রাতৃদ্বয় তাঁহাকে কিছু বলিতেই সুযোগ দেন নাই। ঐ সভার পরই তিনি কংগ্রেসের সহিত সম্পর্ক ত্যাগের কথা চিন্তা করেন।

এই সময়ে সি, আর, দাসের বাড়ীতে প্রত্যহই অপরাহ্নে বালক, যুবক, প্রৌঢ় নির্বিশেষে সকলে সমবেত হইত। সি, আর, দাসের নেতৃত্বে তখন বঙ্গদেশ গান্ধীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্র পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

ইতিমধ্যে গান্ধী আমার সম্বন্ধে ও আমার অনুশীলন সমিতি সম্বন্ধে বহু বিষয়েই শুনিয়াছিলেন এবং আমি যে অহিংস অসহযোগ সমর্থন করি না তাহাও জানিতে পারিয়া আমার সহিত কথা বলিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। ব্যারিষ্টার সুবোধ রায় (ডাঃ বিধান রায়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা) এবং স্বর্গীয় আনন্দমোহন বসুর পুত্র ব্যারিষ্টার হিমাংশু বসু আমাকে সঙ্গে করিয়া সি, আর, দাসের বাড়ীতে যাইয়া গান্ধীর সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর গান্ধী জানাইলেন যে, তিনি রুদ্ধদ্বার কক্ষে আমার সহিত আলোচনা করিবেন, এবং হয় তিনি আমাকে তাঁহার মত গ্রহণ করাইবেন, নতুবা তিনিই আমার মতে দীক্ষিত হইবেন। সেই সময় মতিলাল নেহেরুও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি হাসিয়া বলিলেন যে, তুমি

যখন সি, আর, দাসকেই তোমার স্বমতে আনিতে পারিয়াছ, তখন পুলিন দাসকে ত অতি সহজেই স্বমতে আনিয়া ফেলিবে। তখন গান্ধী কিন্তু বলিয়া ফেলিলেন, নাহে না, এই ক্ষেত্রে একটু শক্ত পাল্লায়ই পড়িয়াছি।

আমাদের গুপ্ত আলোচনা তিন দিন চলিয়াছিল, ব্যারিষ্টার সুবোধ রায় এবং ব্যারিষ্টার হিমাংশু বসু আলোচনাকালে সর্বদাই উপস্থিত ছিলেন।

আলোচনা দীর্ঘ হইলেও, এইখানে শুধু সারমর্মটুকুই বলিতেছি।

গান্ধী—বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিভিন্ন সময়ে যে সমস্ত অত্যাচার, দুর্ব্যবহারাদি করে এবং যে-ভাবে দেশের অসংখ্য লোককে নিঃসহায়, নিরক্ষর ও দরিদ্র করিয়া রাখিয়াছে তাহা কি তুমি সমর্থন করিতে পার?

আমি—ঐ সমস্ত সমর্থন করি না বলিয়াই ত ইংরাজ তাড়াইয়া স্বাধীনতা লাভের জন্য চেষ্টা করিতেছি। আমরা স্বাধীন হইতে পারিলে আমাদের দেশের সর্বরূপ দুঃখ-দৈন্য, নিরক্ষরতা আমরা দূর করিতে পারিতাম।

গান্ধী—কিন্তু তোমরা স্বাধীন হইতে পারিলে কই? তোমরা বৈপ্লবিক পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলে, তাহা ত ব্যর্থ হইল, এইবারে অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ কর তোমরা নিশ্চয়ই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমি—অহিংস অসহযোগ নীতি গ্রহণ করিলেই যে স্বাধীনতা পাইব, তাহারই বা কি যুক্তি আছে? অধিকন্তু আমাদের বৈপ্লবিক পন্থা ব্যর্থ হইয়াছে একথাও আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার প্রভাবে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট বিশেষভাবেই

বিচলিত হইয়াছিল—তাহার ফলেই বঙ্গ-ভঙ্গ রদ হইয়াছে, তাহার ফলেই মণ্টেগু সংস্কার আসিয়াছে এবং ভারতীয়গণের হস্তে আরও অধিক অধিকার অর্পণের প্রতিশ্রুতিও বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট দিতেছে।

গান্ধী—কিন্তু স্বাধীনতা ত পাও নাই! সুতরাং তোমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে।

আমি—ব্যর্থই হইয়াছে, একথা আমি স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র, সুকৌশলে পরিচালনা করিতে পারিলে এবং প্রচেষ্টা পূর্ণত্ব প্রাপ্ত হইলে তবে ত স্বাধীনতা আসিবে। স্বাধীনতা লাভ ত অত সহজ ব্যাপার নয় যে, বিপ্লব সুরু মাত্রই পূর্ণ ফল মিলিয়া যাইবে। স্বাধীনতা লাভের জন্য বহু সময়, বহু স্বার্থত্যাগ, বহু শ্রম, অধ্যবসায় ও আত্মাহুতির প্রয়োজন। বহু ব্যর্থতার পরে শিবাজী স্বাধীন রাজ্য স্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। শতাধিক বৎসরেরও অধিককালের প্রচেষ্টার পর দাক্ষিণাত্যে বিজয়গড়ের স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। পাঁচশত বৎসরের প্রচেষ্টার পর চীন, হুণ, শক প্রভৃতির উপদ্রব হইতে ভারত রক্ষা পাইয়াছিল। ইতালী প্রভৃতি পরাধীন দেশও প্রায় শতাধিক বৎসরের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার পর তবে অষ্ট্রিয়ার অধীনতা-পাশ হইতে মুক্ত হইতে পারিয়াছিল। পৃথিবীতে কোন পরাধীন দেশই অতি অল্প সময়ে স্বাধীন হইতে পারে নাই। কিন্তু আমাদের বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার ফলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময়েই আমরা অনেক সুফল ইতিমধ্যেই পাইয়াছি।

গান্ধী—কিন্তু বিপ্লব পরিচালনার জন্য যে পর্যাপ্ত পরিমাণে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রয়োজন হইবে, তাহা সংগ্রহ করা তোমাদের পক্ষে অসম্ভব ও অসাধ্য।

আমি—ঐকান্তিকতা ও তীব্র আকাঙ্খা থাকিলে জগতে কিছুই অসম্ভব কিম্বা অসাধ্য হয় না।

গান্ধী—কিন্তু বিপ্লব করিতে গেলেই যুদ্ধ বাধিবে, তাহাতে অসংখ্য দরিদ্র লোকের প্রাণ যাইবে, কত শত নিষ্ঠুর ঘটনা ঘটিবে, তাহা কি করিয়া সমর্থন করিতে পার?

আমি—পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকিয়াও ত আমরা কত শত নিষ্ঠুর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিতেছি—কত লোক অনাহারে, অর্ধাহারে প্রাণ হারাইতেছে, দরিদ্রের সংখ্যা ক্রমেই বাড়িতেছে—ঐ সমস্ত হেয় নিষ্ঠুর ঘটনা ও প্রাণহানির প্রতিকার কামনা করিয়াই ত আমরা স্বাধীনতা লাভ হেতু বিপ্লব আরম্ভ করিয়াছিলাম। অবশ্য পরিণামে যুদ্ধাদি ব্যতীত স্বাধীনতা লাভ হয় না, ইহাও আমরা বিশ্বাস করি এবং পৃথিবীতে কোন কালে কোনও পরাধীন দেশই বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যতীত স্বাধীন হইতে পারে নাই।

গান্ধী—পূর্বে হয় নাই বলিয়া এখন কেন হইবে না? আমি ত তোমাকে যেরূপ পরিষ্কার দেখিতে পাইতেছি, সেইরূপই স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি যে, দেশের সমস্ত লোক যদি অহিংস অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করে, তবে তাহা দ্বারা ভারতবর্ষ অবশ্যই স্বাধীনতা লাভ করিবে।

আমি জানাইলাম যে, তাঁহার এই আশ্বাস বাণীতে আশ্বস্ত হইতে পারিলাম না।

গান্ধী—আমরা যদি সম্পূর্ণরূপে অহিংস থাকিয়া সর্বরূপ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত থাকি, তবে আমাদের সহ্য-শক্তি এবং ত্যাগের প্রভাবে মুগ্ধ হইয়া অত্যাচারিগণ নিজ হইতেই স্বাধীনতা প্রদান করিতে বাধ্য হইবে, তাহাদের কঠোর প্রাণও দ্রবীভূত হইয়া যাইবে।

আমি—সাধারণতঃ কিন্তু দেখিতে পাই, প্রবল অত্যাচারিগণ নিরীহ, নির্জীবগণকে নির্বিবাদে ও নিঃশঙ্কচিত্তে অতি উল্লাসের সহিতই অত্যাচার করিতে থাকে এবং ধ্বংসও করিয়া ফেলে; কদাচ ক্ষান্ত হয় না। বিশেষ কোন বিপর্যয়ের কারণ না ঘটিলে কখনও অত্যাচারিগণের অত্যাচারপ্রবণ নিষ্ঠুর প্রাণ তিলমাত্রও কোমল হয় না।

ক্রমে স্বাধীনতার স্বরূপ বুঝাইতে গান্ধী বলিয়াছিলেন যে, আত্মার স্বাধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বিভিন্ন বিষয়ে আত্মাকে যদি স্বাধীন রাখিতে পারি, তবেই ত আমরা প্রকৃত স্বাধীন হইব। এই স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মৃত্যুপণ করিয়া ও সর্বরূপ অত্যাচার সহ্য করিয়া সম্পূর্ণরূপে যদি অহিংস থাকিতে পারি এবং আত্মাকে তদনুরূপ সহনশীল ও শক্তিশালী করিয়া তুলিতে পারি যেন আমাদের আত্মা কখনও কাহারও নিকট অবনত না হইয়া দৃঢ় থাকে, তবেই ত আমরা স্বাধীন হইব। আর ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ স্বাধীনতা কি হইতে পারে?

আমি—হইতে পারে উহা আত্মিক, নৈতিক কিম্বা আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা কিন্তু অতি অল্প সংখ্যক সাধু-সন্ন্যাসী, মহাপুরুষ ব্যতীত অপর কাহারও পক্ষে এইরূপ স্বাধীনতা কদাচ সম্ভব হইবে না। এবং সে স্বাধীনতার প্রতি আমরা আকৃষ্টও নহি। বর্তমান পৃথিবীতে অন্যান্য দেশ যেরূপ প্রত্যক্ষ জাগতিক স্বাধীনতা উপভোগ করিতেছে আমরাও তদনুরূপ স্বাধীনতাই আকাঙ্খা করি এবং বিপ্লব ও যুদ্ধ-বিগ্রহাদি ব্যতীত উহা পাওয়া আমরা সম্ভব বলিয়া মনে করি না।

গান্ধী—অহিংস অসহযোগ আন্দোলন অগ্রসর হইতে থাকিলে আপনা হইতেই বুঝিতে পারিবে, উহা দ্বারাই স্বাধীনতা লাভ সম্ভবপর হইবে।

আমি—আমরা কিন্তু সেইরূপ মনে করি না।

গান্ধী—আমরা যদি চরকা কাটিয়া কেবলমাত্র আমাদের প্রয়োজনের অনুরূপ বস্ত্রাদি প্রস্তুত করি এবং চাউল, ডাইল ইত্যাদি খাদ্য দ্রব্যাদিও শুধু আমাদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত উৎপন্ন না করি এবং সর্বরূপ আকাঙ্খা পরিত্যাগ করিয়া কোনরূপ ভোগ বিলাসের উপাদানাদিও উৎপন্ন না করি ও কেবলমাত্র জ্ঞানানুশীলনের দ্বারা আত্মার উদারতা বৃদ্ধি করিতে থাকি তবে আমরা নিজেরাও অন্ন-বস্ত্রের অভাব হইতে মুক্ত হইয়া শান্তিতে থাকিব এবং বিদেশীগণও এদেশে প্রলোভনীয় কিছুই না পাইয়া আপনা হইতেই চলিয়া যাইবে।

আমি—তাহাও আমরা সম্ভবপর মনে করি না। যে সময়ে আমেরিকা প্রথম আবিষ্কৃত হইয়াছিল, তখনও ঐ দেশের আদি নিবাসিগণ প্রলোভনীয় কিছুই উৎপন্ন করিত না। তথাপি ইউরোপীয়-গণ তথায় যাইয়া আদি-নিবাসিগণকে কীট-পতঙ্গ ও পশু-পক্ষীর ন্যায় হত্যা করিয়া সে দেশ অধিকার করিয়া লইয়াছিল। আমরা সেইভাবে নিরীহ পশুর মত বিদেশীদের দ্বারা নিহত কিম্বা নির্মূল হইতে চাই না। অধিকন্তু কেবলমাত্র জীবনধারণোপযোগী অন্ন-বস্ত্র প্রস্তুত করিয়াই আমরা তৃপ্তি লাভ করিতে পারি না, আমরা পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত জাতির অনুরূপ জ্ঞানানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে, সর্বরূপ বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করিয়া নির্দোষ ও গৌরবজনক ভোগ-বিলাস সম্পর্কে আমাদের দেশকেও পরিপূর্ণ উন্নতির পথে লইয়া যাইতে চাই।

গান্ধী যেন একটু উত্তেজিত কণ্ঠেই বলিলেন—একথা তোমাদের মুখে শোভা পায় না। তোমাদেরও যদি ভোগ-বিলাসের আকাঙ্খা থাকিয়া থাকে, তবে এত দুঃখ-কষ্ট, কারাবরণ ও নির্য্যাতন কিরূপে সহ্য করিলে ?

আমি—আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ বংশধরগণ স্বাধীন রাজ্যে, স্বাধীন নাগরিকের পূর্ণ মর্য্যাদা লাভ করিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকিয়া পৃথিবীর অন্যান্য সমুন্নত জাতিসমূহের পাশাপাশি সর্বরূপ উন্নতির পথে চলিতে পারিবে—এইরূপ পরিকল্পনা লইয়াই আমরা স্বাধীনতা লাভের জন্য দুঃখ-কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া লইয়াছিলাম।

গান্ধী এইবারও কুপিত হইলেন এবং তীব্রভাবে বলিলেন—এইখানেই যত গোলযোগ! সন্তান-সন্ততিদের প্রতি মায়া-মমতাই তোমাদিগকে পরিপূর্ণভাবে ত্যাগধর্মে ব্রতী হইতে দিতেছে না। তোমরা বিবাহ করিও না, যাহারা বিবাহ করিয়াছ, তাহারাও সন্তান উৎপাদন করিও না। নিজেদের দেহ-মন-প্রাণ সর্বরূপে দেশের সেবায় নিয়োগ করিয়া দাও।

আমি—তবে কি আপনি বলিতে চাহেন যে, আমরা সকলে সংযমী সাধু হইয়া থাকিব! তাহা হইলে ত এক পুরুষ পরে আমাদের দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে। তবে আর কাহার জন্য স্বাধীনতা লাভের প্রচেষ্টা করিব?

গান্ধী এইবার একটু বিমর্ষভাবেই বলিলেন—নাহে না। তোমরা সন্তান উৎপন্ন না করিলেই দেশ জনশূন্য হইয়া যাইবে না।

আমি—হইতে পারে দেশ জনশূন্য হইবে না। কারণ অপরাপর জাতি ও আমাদের শত্রুর সন্তান-সন্ততিগণই আসিয়া আমাদের দেশ অধিকার করিবে—তাহাতে আমাদের ত্যাগ স্বীকারের স্বার্থকতা কোথায় থাকিবে?

গান্ধী কিছুক্ষণ নীরবে মাটীর দিকে চাহিয়া রহিলেন। পরিশেষে যেন একটু বিরক্তভাবেই ভ্রূকুটিসহ বলিয়া উঠিলেন—প্রথমেই যদি স্থির বিশ্বাস না জন্মে তবে যুক্তি চলিতে পারে না।

এইখানে আমিও নিরস্ত হইলাম। প্রথমেই যদি গান্ধীর প্রতি আমার স্থির বিশ্বাস জন্মিত তবে ত যুক্তির কোন প্রয়োজনই হইত না!

যাহা হউক, গান্ধী পরিষ্কারভাবেই বুঝিলেন যে, তিনি আমাকে তর্কে পরাভূত করিয়া তাঁহার স্বমত গ্রহণ করাইতে পারিলেন না। আমি যে গান্ধীকে আমার স্বমত গ্রহণ করাইতে পারিব না, তাহা আমি ভালভাবেই জানিতাম। সে অভিপ্রায় অবশ্য আমার ছিল না। গান্ধীর নিকট আমি নিজে যাই নাই, তিনিই আমাকে ডাকাইয়া লইয়াছিলেন।

হিংসায় অধিকার

গান্ধীর সহিত আমার সাক্ষাৎকারের কয়েকদিন পরের ঘটনা। একদিন সি, আর, দাসের বাড়ীতে গান্ধী কোনও বিষয়ে আলোচনায় রত ছিলেন। সেখানে অনুশীলন, যুগান্তর সমিতির কয়েকজন সভ্য, শ্রীশ চট্টোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজন উকীল, কয়েকজন কংগ্রেস কর্মী এবং সৌকত আলী প্রমুখ কয়েকজন মুসলমান নেতাও উপস্থিত ছিলেন। রবি সেন ও অনুশীলন সমিতির অপর কয়েকজন সভ্যের সহিত আমিও তথায় উপস্থিত ছিলাম। সেই সময়ে গান্ধী মোফ্‌লা বিদ্রোহ ও মোফ্‌লাগণ কর্তৃক হিন্দুগণকে বলপ্রয়োগ ও ভীতি প্রদর্শন দ্বারা মুসলমান করা সম্পর্কেই আলোচনা করিতেছিলেন। গান্ধী বলিতেছিলেন যে, মোফ্‌লাগণের অত্যাচারের অনেক ভয়াবহ বিবরণ তিনি পাইয়াছেন। কিন্তু গান্ধীর এই উক্তির প্রতি সৌকত আলী ও অপর কয়েকজন মুসলমান নেতা অবজ্ঞার ভাবই প্রকাশ করিলেন।

গান্ধী অহিংসা নীতির গুণকীর্তনে রত হইলে একজন মুসলমান নেতা বলিয়া উঠিলেন, আমি আমার ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে কিন্তু অহিংস থাকিতে পারিব না।

গান্ধী বলিলেন, হাঁ, হাঁ, আমি ত তোমাকে সেই অধিকার পূর্বেই দিয়াছি।

তৎক্ষণাৎ একজন হিন্দু যুবক দাঁড়াইয়া বলিল, তবে আমরাও আমাদের ধর্মের জন্য প্রয়োজন হইলে হিংসা নীতি অবলম্বন করিতে পারিব?

গান্ধী জানাইলেন, না, না, তোমরা পারিবে না। কারণ তোমাদের ধর্মে হিংসা সর্বতোভাবেই নিষিদ্ধ। কিন্তু সৌকত আলী মুসলমান, তাহাদের ধর্মে হিংসার স্থান আছে।

হিন্দু যুবকটি গান্ধীর যুক্তিতে নিরস্ত হইতে না পারিয়া পুনরায় বলিল আমাদের গীতার মধ্যেও ত হিংসার স্থান আছে।

গান্ধী প্রবল আপত্তি জানাইলেন এবং বলিলেন, তোমরা গীতার যে অংশের ঐরূপ ব্যবহার কর, আসলে উহার অর্থ ভিন্ন। আমি তোমাদের চেয়ে বেশী জানি, তোমাদের অপেক্ষা অত্যন্ত ভালভাবেই আমি গীতা পড়িয়াছি।

হিন্দু-মুসলমান এক জাতি

মহম্মদ আলী জিন্নার পাকিস্তানী আন্দোলনের প্রথম সূত্র ছিল যে, ভারতে হিন্দু-মুসলমান দুইটি ভিন্ন জাতি। ইহার প্রতিবাদে ভারতে হিন্দু-মুসলমান প্রকৃতপক্ষে একই জাতি—এইরূপ প্রতিপন্ন করিবার মানসে গান্ধী প্রচার করিতে লাগিলেন—হিন্দু ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম তথা জগতের অন্যান্য ধর্ম সকলই সমান। পরিশেষে রামধুন লীলা দ্বারা হিন্দু-মুসলমানকে এক জাতিতে পরিণত করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া হিন্দু ধর্ম সঙ্গীতের সঙ্গে কোরাণ পাঠও বাধ্যতামূলক করিয়া গান্ধী প্রচার করিতে আরম্ভ করিলেন, হিন্দু ধর্ম ও মুসলমান ধর্ম এবং পৃথিবীর অন্যান্য ধর্মগুলিই শুধু সমান নয়, সমস্ত ধর্মসমূহ একই।

আমরা কিন্তু গান্ধীর ঐ সমস্ত বিভিন্ন বিরুদ্ধ প্রচার এবং বিরুদ্ধ উক্তির মধ্যে কোনরূপ বাস্তব সামঞ্জস্যের সন্ধানই পাইলাম না।

ভারত সেবক সঙ্ঘ

বাংলাদেশের কারাগারমুক্ত বিপ্লবীদের আহ্বানে নিগৃহীত সম্মিলনীর সভাপতিত্ব করেন লালা লাজপৎ রায়, এবং আমি উহার অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি মনোনীত হইলাম। সেই সম্মিলনীতে আমি যে প্রবন্ধটি পাঠ করিয়াছিলাম তাহা পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য চাহিয়া লইয়া গিয়াছিলেন এবং পাঠ শেষ করিয়া আমার প্রশংসাও করিয়াছিলেন। প্রবন্ধটি ইংরাজীতে লিখিয়া দিয়াছিলেন স্থরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর সর্বকনিষ্ঠ জামাতা ব্যারিষ্টার বি, সি, চ্যাটার্জী। কারণ, আমি সেই সময়ে কলিকাতা কো-অপারেটিভ ষ্টোর্সে সকাল ১০টা হইতে রাত্রি ৮টা পর্যন্ত চাকুরী করিতাম ; আমার তখন খুবই সময়ের অভাব ছিল।

সভা শেষ হইলে এস, আর, দাস আমাকে ডাকিয়া তাঁহার নিজের পরিচয় দিলেন এবং পরের দিন সকাল বেলা তাঁহার বাসায় যাইয়া তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিলেন। পূর্বে আমি এস, আর, দাসকে চিনিতাম না, নামও শুনি নাই। তিনি হাইকোর্টের ষ্টাণ্ডিং কাউন্‌সেল ছিলেন, ব্যারিষ্টারী ব্যবসায়েও তিনি

প্রতি মাসে অন্যূন ত্রিশ হাজার টাকা উপার্জন করিতেন। পরে এড্‌ভোকেট জেনারেল, ভাইসরয়ের কাউন্সিলে ল-মেম্বারও হইয়াছিলেন এবং যে সময়ে তাঁহার ব্রহ্মদেশের গভর্ণর হওয়ার প্রস্তাব চলিতেছিল, সেই সময়ে অকস্মাৎ জীবন-লীলা সম্বরণ করিলেন। এস, আর, দাস সি, আর, দাসের জ্যেষ্ঠ খুল্লতাত ভ্রাতা ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁহারা পরস্পর বিরোধী ছিলেন।

পরের দিন সকালে এস, আর, দাসের বাড়ীতে গেলাম। সেখানে তাঁহার সহিত গান্ধী সম্বন্ধে ও তাঁহার অসহযোগ আন্দোলন এবং বৈপ্লবিক আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনার পর তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আমরা উভয়েই গান্ধী ও তাঁহার অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধী, সুতরাং একসঙ্গে কাজ করা সম্ভব হইতে পারে কিনা?

আমি বলিলাম, কি কি কাজ এবং কর্ম পদ্ধতিই বা কি হইবে, তাহা বুঝিতে পারিলে আমি আমার মতামত জানাইতে পারি।

এস, আর, দাস বলিলেন, কাজ শুধু অসহযোগ আন্দোলনের বিভিন্ন ত্রুটিগুলি দেশের জনসাধারণকে পরিষ্কারভাবে বুঝাইয়া দিতে হইবে। ইহার কর্ম পদ্ধতি ও কার্য পরিচালনার ভার আপনাকেই লইতে হইবে, ব্যয়ভার সম্পূর্ণই আমি বহন করিব।

আমার পরিকল্পনা অনুসারে ঠিক হইল যে, প্রচলিত পত্রিকাগুলির সহিত যথাসম্ভব সহযোগিতা করিতে হইবে, নিজেদের একটি পত্রিকা প্রকাশ করিতে হইবে, তদ্ভিন্ন কতকগুলি প্রবন্ধ মুদ্রিত করিয়া জনসাধারণের মধ্যে এবং সমগ্র বঙ্গদেশে যতগুলি বিদ্যালয়, পোষ্ট-অফিস, বিশেষ বিশেষ জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান আছে এবং যে-সমস্ত বিপ্লবী কেন্দ্র তখনও অবশিষ্ট আছে সেই সকল স্থানে ঐ প্রবন্ধগুলি বিনামূল্যে বিতরণ করিতে হইবে। কার্য-নির্বাহের জন্য বেতন দিয়া কর্মী নিয়োগ

করিতে হইবে। অনুশীলন সমিতির যে সমস্ত কর্মী তখনও কারাগারে আবদ্ধ ছিল তাহাদিগকে মুক্ত করিবার চেষ্টা করা হইবে। অধিকন্তু জনসেবা দ্বারা জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের জন্য হোমিওপ্যাথী চিকিৎসা গ্রন্থসহ ঔষধের বাক্সও বিতরণ করিতে হইবে। ঔষধের বাক্স সঙ্গে লইয়াই আমাদের কর্মিগণ প্রচার কার্যে রত হইবে।

এস, আর, দাস আমাকে যথাযোগ্য অর্থ প্রদান করিয়া কার্যারম্ভের নির্দেশ দিলেন। আমি 'ভারত সেবক সঙ্ঘ' নাম দিয়া এক নূতন সমিতি স্থাপন করিলাম। বিভিন্ন নিয়ম প্রণালীসহ এক পুস্তিকা রচনা করিয়া বিনামূল্যে বিতরণের ব্যবস্থা করিলাম। অনুশীলন সমিতির সভ্যগণই কর্মী হইল, নলিনী গুহ প্রবন্ধ লিখিবার দায়িত্বভার গ্রহণ করিল। নলিনী গুহের প্রস্তাবনা মতেই এই প্রবন্ধগুলির নাম 'হক কথা' হইল। ক্রমে এস, আর, দাস 'স্বরাজ' পত্রিকা প্রকাশ করিতে লাগিলেন এবং কিছুকাল পরে নলিনী গুহই উহার সম্পাদক হইল।

'হক কথা' প্রচারের ফলে দেশের মধ্যে বিশেষভাবেই উত্তেজনার সৃষ্টি হইল। গান্ধীভক্ত কংগ্রেসসেবিগণ সকলেই আমাদিগকে গালা-গালি দিতে লাগিল। 'যুগান্তরে'র সভ্যগণ আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের অনুচর বলিতে লাগিল। আনন্দবাজার পত্রিকায় অগ্নিযুগের বিপ্লবী আখ্যা দিয়া কার্টুনে আমাদিগকে গভর্ণমেণ্টের টাকায় বশীভূত ফণাধারী সর্প আঁকিয়া বিদ্রূপ করা হইল। কিন্তু আই, বি, সেন, বি, সি, চ্যাটার্জী, শাশমল প্রমুখ ব্যারিষ্টারগণ আমাদিগের কার্যকলাপ সমর্থন করিয়াই মত প্রকাশ করিলেন। গান্ধীর বিরোধিতা করা সেই যুগে বড় সহজ ব্যাপার ছিল না এবং এই কারণেই আমাদের উপর নানারূপ কুৎসা আরোপ করিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তৎকালে প্রতিষ্ঠিত নাগরিক সংরক্ষণ সমিতির কার্যনির্বাহক সভার

সদস্য ভিলিয়ার্স বা লেঙ্গফোর্ড জেম্‌স্‌-এর সহিত আলোচনা প্রসঙ্গে আমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট গান্ধী আন্দোলনের উপরে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া দেশের মধ্যে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব করিতে চাহেন যাহার ফলে বিপ্লবী সংগঠনের যেন কোন সম্ভাবনাই না থাকিতে পারে।

নানারূপ প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত সেবক সঙ্ঘের কার্য কলাপ চলিতে লাগিল। এই সময়ে নলিনী গুহের প্রস্তাবে অনুশীল সমিতির কর্মিগণ সিদ্ধান্ত করিল যে, এস, আর, দাসের নিকট হইতে যে-অর্থ পাওয়া যাইতেছে, তাহারই এক অংশ দ্বারা তাহারা তাহাদে মুখপত্র স্বরূপ 'শঙ্খ' নামে এক পত্রিকা প্রকাশ করিবে। কর্মিগণে আগ্রহ লক্ষ্য করিয়া আমিও বাধা দিলাম না। এই সম্পর্কে নলিনী গুহই সমস্ত দায়িত্বভার গ্রহণ করিল।

রবীন্দ্রনাথের লিখিত প্রবন্ধ কিম্বা কবিতা দ্বারা 'শঙ্খ' পত্রিকাকে সমৃদ্ধ করিবার মানসে তাঁহার নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি আদায়ের জন্য নলিনী গুহ ও জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শান্তিনিকেতন যাইয়া কবি সহিত সাক্ষাৎ করে। তাহারা আসিয়া আমাকে জানায় যে, কবি আমাকে দেখিতে চাহিয়াছেন। সেই অনুসারে আমি জিতেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কে সঙ্গে লইয়া শান্তিনিকেতন যাইয়া কবির সহিত সাক্ষাত করিলাম। কবি অত্যন্ত আগ্রহের সহিত আমার রচিত 'কৃষি শিল্প-বাণিজ্য' সম্পর্কিত আমার পরিকল্পনা ও ভারত সেবক সঙ্ঘ নামী

পুস্তিকা পড়িয়া দেখিলেন। কবি অতঃপর রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে আমার সহিত কিছুক্ষণ আলোচনা করিয়া আমার ভবিষ্যৎ কর্মপন্থাদি জানিয়া লইলেন এবং সর্বতোভাবে আমাকে সাহায্য করিবেন জানাইলেন।

যে দুইদিন শান্তিনিকেতনে ছিলাম সে সময় তথাকার কয়েকজন শিক্ষকও রাজনীতি সম্পর্কে আমার সহিত আলোচনা করিলেন। একদিন তাঁহারা সমবেতভাবে আমাকে প্রশ্ন করিলেন, আপনি গান্ধী নীতির দোষ-ত্রুটির উল্লেখ করিলেন বটে, কিন্তু গান্ধীর কোন মাহাত্ম্য না থাকিলে আপামর দেশের সকল লোক তাঁহাকে এত শ্রদ্ধা-ভক্তি করে কেন?

উত্তরে আমি বলিলাম, আপামর সকলেই গান্ধীকে সম্মান করে না। দেশে বিরুদ্ধ মতাবলম্বী বহু শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞ ব্যক্তিও আছেন। কিন্তু তাঁহারা সঙ্ঘবদ্ধ নহেন। গান্ধী বিরোধী কোন কথা বলিলে উত্তেজিত জনসাধারণের নিকট তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে। সুতরাং তাঁহাদের মতামত ব্যক্ত করিবার উপায় নাই। পত্রিকাগুলির কর্তৃপক্ষগণও পত্রিকার অর্থপ্রাপ্তি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হুজুকপ্রিয় জনতার মুখরোচক কথাই মুদ্রিত করে। তাই গান্ধীবিরোধী যুক্তিসমূহ প্রকাশিত হওয়ার কোন সুযোগই ঘটিয়া উঠে না। এই কারণে মনে হয় দেশের সকলেই গান্ধী ভক্ত!

আমার 'কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য' পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া কবি আমাকে শান্তিনিকেতনের মিঃ এলমহার্ষ্ট মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলেন। জানিতে পারিলাম যে, মিঃ এলমহার্ষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষি, শিল্প, গোপালন, ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ের উন্নতি সাধনে আপ্রাণ নিমগ্ন আছেন। মিঃ এলমহার্ষ্টের দেশ আমেরিকা এবং তাঁহার পত্নীও

আমেরিকার এক ধনীর কন্যা। শুনিয়াছি তিনি প্রতি মাসেই শান্তিনিকেতনে প্রচুর সাহায্য করিতেন।

আমার কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য পুস্তিকাটি পাঠ করিয়া ও আমার সহিত আলোচনা করিয়া মিঃ এলমহার্ষ্টও আনন্দিত হইয়াছিলেন। শুধু তাহাই নহে, তিনি আমাকে শান্তিনিকেতনে ও শ্রীনিকেতনে সংশ্লিষ্ট রাখিবার প্রস্তাব করেন এবং কবিকে সম্মতও করাইলেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিশেষ কারণে আমার শান্তিনিকেতনের চাকুরী গ্রহণ করা সম্ভব হয় নাই।

কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াই আমাদের 'শঙ্খ' পত্রিকা ও সাধারণ কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে কবির নিকট পত্র লিখিলাম। তিনিও সর্বরূপ সহানুভূতি জানাইয়া জবাব পাঠাইলেন এবং সেই পত্রের সহিত 'শঙ্খ' পত্রিকায় মুদ্রিত করিবার জন্য একটি কবিতাও পাঠাইয়াছিলেন। কবিতাটি 'শঙ্খে'র প্রথম সংখ্যায়ই মুদ্রিত হইয়াছিল এবং উহা নিম্নরূপ—

সাধন কি তোর আসন নেবে হট্টগোলের কাঁধে।
খাঁটি জিনিষ হয়রে মাটি নেশার পরমাদে॥
কথায় তো শোধ হয় না দেনা, গায়ের জোরে জোড় মেলে না—
গোলমালে ফল কি ফলে জোড়াতাড়ার ছাঁদে॥
কে বলতো বিধাতারে তাড়া দিয়ে ভোলায়।
সৃষ্টিকরের ধন কি মেলে যাদুকরের ঝোলায়॥
মস্ত বড়োর লোভে শেষে মস্ত ফাঁকি জোটে এসে,
ব্যস্ত আশা জড়িয়ে পড়ে সর্বনাশের ফাঁদে॥

বিপিন পাল মহাশয়ও আমার অনুরোধে 'শঙ্খ' পত্রিকার নিমিত্ত একটি প্রবন্ধ পাঠাইয়াছিলেন, এবং সেই প্রবন্ধে গান্ধীর নানারূপ বিরুদ্ধ

সমালোচনা ছিল। নলিনী গুহ প্রবন্ধটি 'শঙ্খ' পত্রিকায় মুদ্রিতও করিয়াছিল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীকে সমর্থন করিয়া বিপিন পালের প্রবন্ধের তীব্র বিরুদ্ধ সমালোচনাও করিয়াছিল। আমি আপত্তি জানাইলে পর নলিনী গুহ উত্তর দিয়াছিল যে বর্তমান যুগে গান্ধীকে সমর্থন না করিলে 'শঙ্খ' পত্রিকা কেহই কিনিবে না।* এই সম্পর্কে এবং অন্যান্য বিষয়েও আমার সঙ্গে অনুশীলন সমিতির কয়েকজন প্রধান কর্মির সহিত মত বিরোধ, পরে কলহ আরম্ভ হয়। তাই 'শঙ্খ' পত্রিকার জন্য কবির নিকটে আমি আর কোন কবিতা কিম্বা প্রবন্ধাদি চাহিয়া পত্র লিখি নাই, তিনিও আর কোন কিছু পাঠান নাই। অল্প কিছুকাল পরেই 'শঙ্খ' পত্রিকা বন্ধ হইয়া গেল।

কবির যোগ্যপুত্র শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অনুরোধে শান্তিনিকেতনের জন্য একজন সুদক্ষ লাঠি-শিক্ষক নিয়োগের কথায় আমি আমার ছাত্র শ্রীশক্তিকুমার চক্রবর্তীকে সঙ্গে করিয়া কবির তিরোধানের অল্প কিছুদিন পূর্বে পুনরায় শান্তিনিকেতনে যাই এবং উহাই কবির সহিত আমার শেষ সাক্ষাৎ।

কথা প্রসঙ্গে কবি বাংলার নেতাগণকে—বিশেষভাবে সুভাষ বসুকে তিরস্কার করিলেন। সে সময়ে সুভাষবাবু গান্ধীর প্রভাবে কংগ্রেস হইতে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু তখনও কলিকাতা পরিত্যাগ করেন নাই। কবি বলিয়াছিলেন, কংগ্রেসের আধিপত্য ও তৎসম্পর্কিত হিংসা-বিদ্বেষ ও আত্মপ্রাধান্য হেতু কলহ-বিবাদ ভুলিয়া এবং কংগ্রেসের সহিত সম্পর্কহীন হইয়া বাংলার নেতাগণ বাংলার জনসাধারণের সহযোগিতায় বাংলাদেশের সংহতি ও আভ্যন্তরীণ অভাব-অভিযোগসমূহের প্রতিকারে যদি আত্মনিয়োগ করিত, তবে তিনিও তাহাদের সহিত তাঁহার মন-প্রাণ মিলাইয়া দিতে পারিতেন।

কবি দুঃখ করিয়া বলিলেন যে, বাংলার নেতাগণ তাঁহার উপদেশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি আরও বলিলেন, বাংলার ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণই আঁধারে ঢাকা; এই দেশের অবনতি ও অধোগতির অবধি থাকিবে না। তবে একমাত্র ভরসা যে অবনত হইতে হইতে দুঃখ ও লাঞ্ছনার শেষ সীমায় যাইয়া বাঙ্গালী জাতি যদি ফিরিয়া দাঁড়ায় ও নূতন প্রবুদ্ধ-শক্তির উদ্দীপনায় সচেতন ও তৎপর হইয়া পড়ে তবেই হয়ত বা অবস্থা ফিরিলেও ফিরিতে পারে। কংগ্রেসের ভিতর দিয়া মুসলমান স্বার্থের নিকট হিন্দুগণের আত্মসমর্পণও কবি সমর্থন করিলেন না।

এই কথা কে না জানেন যে, কবি যথার্থই উদার ও বিশ্বপ্রেমিক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমার যতটুকু আলাপ আলোচনা হইয়াছে, তাহাতে আমার মনে এই দৃঢ় ধারণাই জন্মিয়াছে যে, ভারতবর্ষ এবং বাংলাদেশের মর্যাদার বিনিময়ে কবি অপর কিছু কাম্য বলিয়া মনে করিতেন না।



পরিশিষ্ট—'ক'

যে-বৈদিক মন্ত্রটি পাঠ করিয়া পুলিন দাস তাঁহার দীক্ষাগুরু ব্যারিষ্টার পি, মিত্রের নিকট হইতে অনুশীলন সমিতির কর্মী হিসাবে দীক্ষা গ্রহণ করেন, তাহার বয়ান নিম্নে দেওয়া হইল। পি, মিত্র যখন স্বর-লয় সহ বৈদিক পদ্ধতিতে মন্ত্রটি পাঠ করিতেন তখন স্নিগ্ধ গাম্ভীর্য রসে এক নূতন উদ্দীপনায় প্রাণ পূর্ণ হইয়া যাইত।

১। লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং রাজ্যায়ো আ

২। লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং বৈরাজ্যায়ো আ

৩। লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং স্বরাজ্যায়ো আ

৪। লোকদ্বারমপাবার্ণু পশ্যেম ত্বা বয়ং সাম্রাজ্যায়ো আ

ব্যাখ্যা :—হে অগ্নিদেব! তুমি লোক, অর্থাৎ পৃথিবীর দ্বার অপাবৃত অর্থাৎ উদ্ঘাটিত কর। আমরা রাজ্য লাভের নিমিত্ত তোমাকে যেন দর্শন করিতে পারি।

বিশদ ব্যাখ্যা :—হে চরাচর সর্বলোকব্যাপী সর্বরূপ তমঃ (মোহ, অজ্ঞানান্ধকার) বিদূরণকারী সর্বপ্রকাশক সর্বতেজোময় সর্বশক্তিমান অগ্নিরূপী প্রাণশক্তি! তুমি লোকদ্বার উন্মুক্ত কর (অর্থাৎ জগতের জ্ঞান-গুণ-বিজ্ঞানাদি সর্বরূপ ঐশ্বর্যের উপলব্ধি হেতু সর্বরূপ উপায় প্রকটিত করিয়া দাও)। আমাদের তীব্র বিকাশোন্মুখ প্রাণশক্তির প্রয়োগ প্রভাবে আমরা প্রত্যেকেই যেন বহু হইয়া (অর্থাৎ বিবিধ

ও বহু সত্বায়) জগতে বাস করিতে পারি (যেন পৃথিবীর সর্বরূপ উপভোগেই তৃপ্তি লাভ করিয়া উন্নত হইতে উন্নততর হইতে পারি)।

বৈরাজ্য :—বিরাটপুরুষের অধিকার লাভ। পূর্বোক্তরূপে ক্রমোন্নতি সহকারে যেন বিরাটপুরুষের (Superman) সর্বরূপ অধিকার লাভে সমর্থ হই।

স্বরাজ :—বিরাট পুরুষের অধিকার লাভের সঙ্গেই যেন সর্বরূপে স্বাধীন ও নিরাতঙ্ক হইয়া সর্বরূপ সুখ-শান্তি-পূর্ণ সত্বায় ইন্দ্রত্ব বা আধিপত্য লাভে সমর্থ হই।

সাম্রাজ্য :—তৎপরে ক্রমে যেন সর্ববিষয়েই সমগ্ররূপে সম্যক পরিপূর্ণতাসহ অসীম অনন্ত বিশ্বব্যাপক সত্বায় উপনীত হইয়া যাই।

পরিশিষ্ট—'খ'

সম্পাদকগণের কর্তব্য

১। প্রত্যহ নিজে উপস্থিত থাকিয়া সভ্যগণের উপস্থিতি নির্ণয় করিতে হইবে। উপস্থিতি-খাতাতে প্রত্যহ প্রত্যেক সভ্যকে তাহার নিজ নামের ঘর পূরণ করাইতে হইবে।

২। অনুপস্থিত সভ্যগণের অনুসন্ধান করিতে হইবে।

৩। সভ্যগণের রোগাদি হইলে শুশ্রূষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪। সভ্যগণের অভাব অভিযোগ শ্রবণ করিয়া তাহার প্রতি-বিধানের চেষ্টা করিতে হইবে।

৫। সভ্যসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিতে হইবে ও সমিতির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রাদির অনুসন্ধান ও প্রতিবিধান করিতে হইবে।

৬। নূতন কেহ ভর্তি হইতে আসিলে তাহার সম্যক পরিচয় লইয়া এবং পূর্বে কোনও সমিতিতে ভর্তি হইয়াছিল কি না তাহা সম্যক জানিয়া লইয়া, সমিতির সমস্ত নিয়মে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করাইয়া তাহাকে সমিতির সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিয়া লইবে এবং তাহার পরিচয়, বাসস্থান ইত্যাদি সমস্ত স্পষ্টাক্ষরে ভর্তির খাতাতে লিখিয়া লইবে। পরিচয় যথা :—(১) নাম, (২) তারিখ, (৩) বয়স, (৪) ধর্ম ও জাতি, (৫) পিতার নাম ও ব্যবসা, (৬) অভিভাবকের নাম ও ব্যবসা, (৭) আখ্ড়া, (৮) হাল সাকিনের সম্পূর্ণ ঠিকানা, (৯) বাড়ীর সম্পূর্ণ ঠিকানা, (১০) লেখাপড়া, বিদ্যা, বিদ্যালয়, শ্রেণী, ব্যবসা ইত্যাদি। যাহাদের নাম এই সমিতির অন্তর্গত কোনও সমিতিতে একবার উঠিয়াছে, এরূপ কোনও সভ্য

স্থান পরিবর্তন করিয়া নূতন ভর্তি হইতে আসিলে তাহার সম্যক্ নিদর্শন দেখিয়া ও বুঝিয়া লইয়া তাহার নাম উপস্থিত খাতায় তুলিয়া লইবে, নূতন ভর্তির খাতাতে তাহার নাম আর তুলিবে না। কোন অহিন্দু কিম্বা হিন্দুদ্বেষীকে ভর্তি করিবে না।

৭। সমস্ত সভ্যগণের বাসস্থান (হাল সাকিন) বিদ্যালয় ও শ্রেণীর এক তালিকা রাখিতে হইবে।

৮। কোনও সভ্য এক আখ্‌ড়া পরিবর্তন করিয়া অন্য আখ্‌ড়ায় যাইতে চাহিলে একখানা কাগজে তাহার নাম, বয়স, নম্বর, তারিখ, পিতার নাম ও ব্যবসা, অভিভাবকের নাম ও ব্যবসা, ধর্ম্ম ও জাতি, বাড়ীর সম্পূর্ণ ঠিকানা, যে আখ্‌ড়ায় ছিল, যে আখ্‌ড়ায় যাইবে, ব্যবহার, উৎসাহ, উদ্যম, লেখাপড়া ও ব্যায়াম কৌশলাদিতে যোগ্যতা লিখিয়া প্রধান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

৯। প্রত্যেক সভ্য সমিতির সমস্ত নিয়ম প্রতিপালন করিতেছে কি না, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিয়া সভ্যগণকে সমিতির নিয়ম পালনে সাহায্য ও বাধ্য করিতে হইবে। এই কার্য্য সমাধা করিবার নিমিত্ত অতি বিশ্বাসী, কার্যকুশলী, সাহসী ও উৎসাহী কতিপয় সভ্যকে বাছিয়া লইয়া সম্পাদক তাহাদিগকে সর্বদার নিমিত্ত নিজের পার্শ্বসহচর করিয়া লইবে।

১০। কোনও সভ্য কোনরূপ অন্যায় করিলে, তাহাকে গুরুতর শাস্তি দিতে হইলে, প্রধান সম্পাদককে সমস্ত জানাইতে হইবে। প্রথমে মিষ্ট কথা, পরে উপদেশ বাক্য, পরে অভিভাবক কিম্বা অন্য কোনও গুরুব্যক্তির সাহায্য, পরে ভয় প্রদর্শন, পরে শারীরিক শাস্তি কিম্বা অন্যান্য কৌশলাদিতে সংশোধনের চেষ্টা দেখিবে; তাহাতেও সংশোধন না হইলে, প্রধান সম্পাদককে সমস্ত জানাইবে। কিন্তু

কোন অবস্থাতেই সমিতি হইতে নাম কাটিয়া দিবে না এবং সমিতি ছাড়িতেও দিবে না। যতদিন সংশোধন না হইবে ততদিন নূতন ও পুরাতন কিছুই শিখিতে দিবে না। যে সমস্ত সভ্যগণ সমিতির যে কোনও আদেশ পালন করিবে না, কিম্বা অবহেলা করিবে, তাহাদিগকে সম্পাদক নিজে খুজিয়া বাহিব কবিয়া কিম্বা, কোনও যোগ্যলোক নিযুক্ত করিযা দিয়া সর্বদা পিছনে লাগিয়া থাকিয়া নানারূপ কৌশলে স্থবিধামত আদেশ পালন করাইয়া লইবে ও ভবিষ্যতের জন্য সাবধান করিয়া দিবে এবং কতিপয় দিবস পর্যন্ত নানারূপে দৃষ্টি রাখিবে।

১১। প্রত্যেক রবিবার দিবসে সমস্ত সমিতি প্রধান সম্পাদকের নিরূপিত স্থানে একত্র মিলিত হইবে। এবং প্রত্যেক সম্পাদক তাহার আখ্ড়ার সভ্যগণকে উক্ত মিলনে যোগদান কবিতে বাধ্য করিবে। উক্ত মিলনের কোনও সংবাদ না পাইলে যথারীতি কার্য চলিতে থাকিবে।

১২। স্বার্থত্যাগে ও স্বদেশ-প্রেমে সভ্যগণকে উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত করিতে হইবে।

১৩। সমিতির কার্য সম্পন্ন করিবার নিমিত্ত প্রত্যহ প্রত্যেক সভ্যের কর্তব্য কার্য নিরূপিত করিয়া দিতে হইবে।

১৪। লাঠি, নৌকা, গুলাইল, অশ্ব, কুস্তিখানা ও অন্যান্য যন্ত্রাদির সুব্যবস্থা করিতে হইবে। সমিতির লাঠি কিম্বা অন্যান্য জিনিষাদি রাখিবার নিমিত্ত তালাবদ্ধ ঘর কিম্বা বাক্সের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। কোন জিনিষই যেন নিষ্প্রয়োজন ও অসাবধানতা হেতু নষ্ট না হয় ও চুরি না যায় সেজন্য বিশেষ যত্ন লইতে হইবে। প্রত্যেক আখড়ার নিমিত্ত কতকগুলি লাঠি জমা রাখিয়া প্রত্যেক সভ্যকে

প্রত্যহ তাহার নিজ লাঠির যোগাড রাখিতে বাধ্য করিবে ; সভ্যগণ লাঠির যোগাড় করিতে না পারিলে কিনিয়া লইবে। যে সমস্ত সভ্যগণ সমিতির জন্য অধিক পরিশ্রম করিবে কিম্বা নিজ বাটী হইতে মুষ্টি-ভিক্ষার সাধারণ পরিমাণ হইতে অনেক অধিক চাউল আনিয়া দিবে তাহাদিগকে সমিতি হইতেই লাঠি ইত্যাদি দেওয়া যাইতে পারে।

১৫। প্রত্যহ প্রত্যেকের শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে হইবে। প্রয়োজন হইলে বিভিন্ন খেলার নিমিত্ত বিভিন্ন দিন নিযুক্ত করিবে।

১৬। চালপ্রণালী (ড্রিল) দৌড়, বাঁশ ও দড়ি বাহিয়া উঠা নামা, সাঁতার, অশ্ব ও নৌকা চালনা এবং রৌদ্র, বৃষ্টি, শীত, গ্রীষ্ম, রাত্রি ও উপবাস ভোগ প্রভৃতি কষ্টসহিষ্ণুতা শিক্ষা দিতে হইবে।

১৭। প্রত্যেক সভ্যকে ব্যায়াম কৌশলাদিতে, স্বভাবচরিত্রে এবং লেখাপডাতে উন্নতি ও অবনতির বিষয়ে প্রত্যেক সপ্তাহে শিক্ষাপ্রণালীর ধরণ লিখিবার খাতাতে লিখাইয়া রাখিতে হইবে।

১৮। প্রত্যেক আখড়ার সভ্যগণকে দশ দশটী করিয়া এক একটী স্বতন্ত্র দলে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেক দলের শিক্ষাদায়ক ও নেতা নিযুক্ত করিয়া দিতে হইবে, এবং বিভিন্ন দলের চালকগণের নিকট এক এক প্রস্ত "সম্পাদকের কর্তব্য" ও উভয় স্তরের প্রতিজ্ঞা-পত্রের নকল স্পষ্টাক্ষরে লিখিয়া রাখিতে হইবে। এবং সর্বসাধারণের জন্য উভয় স্তরের প্রতিজ্ঞার নকল ও অন্যান্য নিয়মাদি বড বড় অক্ষরে লিখিয়া শক্ত কাগজে কিম্বা কাঠে লাগাইয়া প্রত্যহ খেলার প্রাঙ্গনে ঝুলাইয়া রাখিতে হইবে ও প্রত্যহ তৎপ্রতি প্রত্যেক সভ্যের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে হইবে।

১৯। ক্ষুদ্র দলের নেতাগণ তাহাদের নিজ নিজ দলের শিক্ষা ও উপস্থিতির জন্য দায়ী থাকিবে, এবং সভ্যগণকে সমিতির অধীন

থাকিতে বাধ্য করিবে ও প্রতিজ্ঞাপত্রের এক নকল সহিত শিক্ষা-প্রণালীর ধরণ লিখিবার একখানা খাতা সর্বদা সঙ্গে রাখিতে প্রত্যেককে বাধ্য করিবে। সভ্যগণ যে দিন যে শিক্ষা পাইবে তাহা সেই দিনই ঐ খাতাতে লিখিয়া রাখিবে।

২০। প্রত্যেক প্রধান শিক্ষাদায়কগণ সমস্ত ক্ষুদ্র দলের শিক্ষার তত্ত্বাবধান করিবে এবং ক্ষুদ্র দলের নেতা ও শিক্ষাদায়কগণকে শিক্ষা দিবে।

২১। যাহারা শুধু আদ্য স্তরের প্রতিজ্ঞাগুলি করিয়াছে তাহা-দিগকে বড় লাঠির রঙ্গের বাড়ি পর্যন্ত ছোট লাঠির শ্যামঘাট পর্যন্ত ও ছুরি খেলার প্রথম পাঠ পর্যন্ত শিক্ষা দিবে; ইহার অতিরিক্ত শিখাইতে পারিবে না।

২২। যাহারা উভয় স্তরেব প্রতিজ্ঞাগুলি সম্পূর্ণ করিয়াছে তাহাদিগকে সমস্তরূপ শিক্ষাই দিবে।

২৩। যাহাদেব বয়ঃক্রম দ্বাদশ বৎসরের কম ও প্রতিজ্ঞার মর্ম বুঝিতে অক্ষম তাহাদিগকে সমিতির বহিরাঙ্গ বলিয়া অভিহিত করিবে। তাহাদিগকে কেবল প্রতিজ্ঞাগুলি শুনাইয়া তৎপালনে বাধ্য রাখিবে।

২৪। বহিরাঙ্গের সভ্যগণকে ডাম্বল, বুকডন্, কুস্তি, বৈঠখারী, বেনিঠি শিক্ষা দিবে, এবং দুই হাতে কিম্বা এক হাতে লাঠি লইয়া স্বাধীনভাবে ও নির্ভিকচিত্তে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতে শিক্ষা দিবে।

২৫। প্রত্যেক পাড়াতে মুষ্টিভিক্ষা তুলিবার সুব্যবস্থা করিতে হইবে এবং সমিতির শুভাকাঙ্ক্ষী ধনী ব্যক্তিগণের নিকট হইতে অর্থসাহায্য লাভের চেষ্টা করিবে। যে সমস্ত সভ্যগণ প্রয়োজনীয় চাঁদা দিতে পারিবে না তাহাদিগকে অধিক পরিমাণে চাউল আনিয়া

দিতে কিম্বা কোনরূপ বিশেষ কার্য সমাধা করিয়া দিতে বাধ্য করিবে। সৎস্বভাবসম্পন্ন ও কার্যতৎপর গরীব সভ্যগণকে চাঁদা হইতে মাপ করা যাইতে পারে।

২৬। সমিতির জমা খরচের হিসাব প্রত্যেক সপ্তাহে প্রধান সম্পাদকের আদেশ প্রাপ্তি মতে এবং প্রধান কেন্দ্র সমিতি হইতে প্রেরিত পরিদর্শকগণকে দেখাইতে হইবে এবং যে টাকা আদায় হইবে, তাহা সমিতির সাধারণ কার্য নিষ্পন্ন করা ব্যতীত অন্য কোনও কারণে খরচ করিতে হইলে প্রধান সম্পাদকের অনুমতি লইতে হইবে। এবং প্রত্যেক মাসের শেষ তারিখে তহবিলে যে টাকা জমা থাকিবে তাহার অর্ধেক পরের মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে প্রধান কেন্দ্র সমিতিতে প্রধান সম্পাদকের নিকট পাঠাইয়া দিতে হইবে।

২৭। উপযুক্ত সভ্যকে সম্পাদক তাহার সহকারী নিযুক্ত করিয়া এক এক জনের প্রতি বিভিন্ন কার্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবে। সম্পাদকের যে কোন সময়ের জন্য স্থান পরিবর্তন করিয়া যাইতে হইলে কোনও বিশিষ্ট সভ্যকে তাহার প্রতিনিধি করিয়া যাইতে হইবে, এবং সমিতির এরূপ সুচারু বন্দোবস্ত সম্যকরূপে করিয়া যাইতে হইবে যে তাহার অভাবে সমিতির মধ্যে কোনরূপ গোলযোগ কিম্বা অসুবিধা হইতে না পারে এবং হইলেও সহজে নিষ্পত্তি হইয়া যায়; এবং সমস্ত কাগজ-পত্র ও জিনিষাদি সম্যক প্রতিনিধিকে বুঝাইয়া দিতে হইবে; কোনও আখ্‌ড়া কোনও সময়ের জন্যই সম্পাদকবিহীন হইয়া থাকিতে পারিবে না। সমিতিতে কোনরূপ পরিবর্তন ঘটিলে, তৎক্ষণাৎ সে বিষয় প্রধান সম্পাদককে জানাইতে হইবে।
